উচ্ছিন্ন পরবাস

মহীতোষ বিশ্বাস

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

।। এক ।।

—'ও দিদি—ভালো?—ও মাসি—ভালো?'—

মুখে মুখে চকিত উচ্চারণ। কানে কানে, যেন হাওয়ায় ভর ক'রে, সে উচ্চারণ বিস্তৃতি পায়। উপচানো ভিড়। গাদাগাদি। ঠাসাঠাসি। তবু সেই বদ্ধ ঠাস বুনোটের রশি আলগা ক'রে, এ-জানালার সন্ধানী ফোকর গলিয়ে, ও-দরজার আড়ালটুকু সম্বল ক'রে, চকিত উচ্চারণ যেন এক আর্ত জিজ্ঞাসায় রণিত হয়—'ও দিদি—ভালো? —ও মাসি—ভালো?'

সেই রণন ফিরতি দলের কাছ থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে ফেরে—'ভালো—ভালো।' এবং এই উচ্চারণ নিশ্চিতভাবেই এ-দলের কাছে সঞ্জীবনী টনিকের মতো প্রাণদায়ী হয়ে ওঠে।

দিনভর নিরন্তর এই এক খেলা। এবং এই খেলা, নিহিতার্থে বুঝি জীবন-সংগ্রাম। এ-সংগ্রামের ক্ষেত্র শুধু দিন নয়, রাত্রের অর্ধাংশেও বিস্তৃতি পায়।

দূর মফস্বল উজিয়ে ট্রেন আসে। নিয়তই সে ট্রেন যাত্রীবহন-ক্ষমতার ঊর্ধ্ব সীমারেখা অতিক্রান্ত। কেরাণীবাবু, শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, ফড়ে, ভবঘুরে, ভিখারী—হরেক ধান্দার কর্মকান্ডের এক বিশাল প্রবাহ। কামরায় কামরায় অকুলান ভিড়। ওরাও তার অঙ্গীভূত। পোঁটলা-পুঁটলি, বোঁচকা-বুঁচকি। সম্ভাব্য সব স্থান, সব সুযোগের যথাসাধ্য সদ্ব্যবহারের আপ্রাণ প্রচেষ্টা। মধ্যবয়সী বউ-ঝিদের এক কাঁখে প্রাকৃতিক সংলগ্নতার মতো এক একটি বাচ্চা, অন্য কাঁখে সমধিক যত্নে সংরক্ষিত চালের পুঁটলির সংগোপন আশ্রয়। খালি হাত পায়ের মেয়ে বউদের হাত এবং কাঁখটি বহন-ক্ষমতার চূড়ান্তে প্রসারিত, পুরুষ্টু বস্তাগুলো অবলীলায় অথবা কষ্টে বহনে ব্যাপৃত। মফস্বলের বাজারে তুলনামূলক সস্তা চাল। দশ বিশ কেজি কলকাতার বাজারে পাচার নিশ্চিতই কিছু অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করে।

গভর্ণমেন্টের নানাবিধ পরিকল্পনার মধ্যে এই কলটিও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে একটি মজাদার বস্তু হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। কলকাতার খোলা বাজারে চালের ক্রয়-বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা। অতএব রেশন-সপ ভরসা এবং সরবরাহ বিশেষ নিয়মে অনিয়মিত। ফলে সপ্তাহের তিন চার দিনের পক্ষেও তা পর্যাপ্ত নয়।

মাঝে মাঝেই সেই স্বল্পতম সরবরাহেও এমন সব বস্তুর আবির্ভাব ঘটে, যার দর্শনে রেশন-কার্ডধারীরা বিস্তর গবেষণা চালিয়েও স্থির করতে পারেনা, এমন নিম্ন-মানের খাদ্য-শস্য ভারতবর্ষের কোন্ অঞ্চলে উৎপন্ন হয়।

ফলে বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে এই যে চাল পাচারকারী দলবল, এরা কলকাতার বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার সামগ্রিক জনজীবনের রসদ জোগানোর ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান এবং অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ করে। চালের পুঁটলি নিয়ে হাজির হ'লে, সময়ের বাছ-বিচার অবান্তর, হোটেলের মালিক বাবুদের কাছে আলাদা খাতির। যেন, ঘরে কুটুম এলো। শিয়ালদার সন্নিহিত অঞ্চলে আছে চালের আড়তের মহাজন, বিক্রি-বাটার প্রকাশ্য-গোপন ব্যবসাকেন্দ্র। খেপের হিসেব সারাদিনে দশ বারোতেও বর্তায়। ফলে কাঁচা পয়সায় ট্যাঁক ফলবান হয়।

জীবিকার্জনের তাগিদে, আর সব সহজ অর্থকরী ক্ষেত্রের মতো, এ লাইনেও তাই আমদানি হয় নতুন নতুন মুখ, এবং সেখানে বয়সের সীমারেখাটা নির্দিষ্ট কোনো গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে না। দশ বারো বছরের এক একটা পুঁচকের পাশে ষাট-পঁয়ষট্টির বুড়ো-বুড়ীরও অনায়াস সহাবস্থান। তেমন তেমন ছোঁড়াছুড়ী, যাদের ফুসফুসে বেশী মাত্রায় দম আর দুঃসাহস, এক একবারে পঞ্চাশ ষাট কে.জি.তেও পাচার-কর্মটি বর্ধিত করে। ফলে ১৯৬৫ সালের রেশনিং আইন গুরুত্ব হারায়।

তবে এই লাভজনক পাচার-কর্মটি সর্বদাই নির্বিঘ্ন, এই গ্যারান্টি নিশ্চিতই ভঙ্গুর। কর্মটি যেমন লাভজনক, তেমনই ঝুঁকিবহুল, এবং লাভের গুড় পিঁপড়েতে উদরসাৎ করার ঘটনাও তাই প্রায়শঃই পুনরাবৃত্ত হয়।

স্টেশনে পুলিশ থাকে কখনো কখনো। পুলিশের এই 'স্টাফ্' ওদের উচ্চারণের পারিভাষিকে 'এস্টাফ' বলে রূপান্তরিত হয়। সাধারণ 'স্টাফ্কে' ওদের ভয় কম। দু'চার দিন বাদেই আড়টা ভেঙে যায়, একটু চিন্-পরিচয় গড়ে ওঠে, এবং তেমন তেমন ক্ষেত্রে একটু চালাচালির ব্যবস্থায় রফা হলে গোটা ব্যাপারটার মধ্যে একটা স্বাভাবিকতা আসে, যাতে উভয়তঃই কাজটা সহজসাধ্য রূপ পায়। অবস্থা জটিলতর হয়, যেদিন 'এস্পেশাল' (স্পেশাল) বসে।

এন্ফোর্সমেন্ট বিভাগ থেকে মাঝে মাঝে রেল পুলিশের সহযোগিতায় ট্রেনে অভিযান চালানো হয়। গোটা পরিস্থিতিটাই সেদিন ভোল্ পালটে টানটান হয়ে ওঠে। আগাম সতর্কতার লক্ষণ ছড়ায় চারিদিকে। ক্রসিং স্টেশনে দুই ট্রেন এসে দাঁড়ায় পাশাপাশি। আপ ট্রেনে সবঃ খালি হাত। কলকাতার বাজারে সদ্য সওদা নামিয়ে, নগদ পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে, পারিপার্শ্বিক হাল-চালের আবশ্যকীয় সংবাদাদি সংগ্রহ ক'রে, তখন ফিরতি পথে যাত্রা। মনে ভাবনা-উদ্বেগের কালি নেই। শারদ আকাশের মতো ভারমুক্ত। ফলে সেই শূন্যতার পরিসরটুকু রসের গল্পের টগ্‌বগানিতে উচ্ছল হয়।

আর ডাউন ট্রেনে তখন ভিন্ন চিত্র। অনিশ্চিত সংশয়ের ধুক্পুকানি। ট্যাঁকের কড়ির বহুলাংশের বিনিময়ে পোঁটলা-পুঁটলি ব্যাগ ইত্যাদি পূর্ণতা পেয়েছে।

যারা কিছু ভীতু এবং সাবধানী, তারা কৌশলের আশ্রয় নেয়। সর্পাকৃতি লম্বা চালভর্তি থলি নারীদেহের কোমর, বুক, পিঠ প্রভৃতি সংগুপ্ত স্থানে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ। কোনো নারীর উদরে অকল্পনীয় বিস্ফার। যেন দশ মাস দশ দিনের আসন্ন-প্রসবা ভরা পোয়াতি, খালাস হবার অনিবার্য তাগিদে নিরাপদ শেল্টার নিতে চাইছে।

এইসব জটিল পরিস্থিতিতে প্রতিটি মনের কেন্দ্রবিন্দুতে তাই কালবৈশাখীর বিদ্যুৎ-চমকের মতো ধুক্পুক্ ধুক্পুক্। যদি কোনো স্টেশনে 'এস্পেশাল' থাকে। টেনে টেনে নামাবে সব। পালাতে গেলেই চারদিকে সাঁড়াশি। পঁচিশ ত্রিশ কে.জি.র বস্তাগুলো নিমেষেই হাওয়া হয়ে গায়েব হয়ে যাবে।

অক্ষমের শেষ অবলম্বন কান্নাকাটির আশ্রয় ওরা অবশ্যই গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু তা কোনোই ফলদায়ী হবেনা, বরং উল্টে রুলের বাড়ি পড়বে হাতে পায়ে। আগে 'পাবলিকের' কিছু কিছু প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যেতো—

—'ছেড়ে দিন্ দাদা, গরীব মানুষ দু-পাঁচ কে.জি চাল নিয়ে যাচ্ছে, ওদের ধ'রে কি হবে? রাঘব বোয়ালদের ধরুন না।'

এসব কথা আগে অংশত ফলদায়ক হ'তো। আজকাল পাব্লিকের চরিত্রও বোঁদামারা। কেউ

কিছু বলে না। পুলিশও আর 'পাব্‌লিক'কে জুজু ভাবে না, ফলে পাত্তাও দেয় না। তাই নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে ওদের আর কেউ অংশীদার নেই। সম্পূর্ণতঃ ওটা এখন ওদের নিজেদেরই দায়িত্বে রক্ষিত।

ভিড়ের গাড়ীতে মাঝে মাঝে দু'একজন প্যাসেঞ্জারবাবুর ক্ষ্যাপামি ধরে—'ব্যাটাদের লোভের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে, এক একজন ডেলি কত ক'রে কামায় জানেন?'

—'দেবো একদিন সব কটাকে পুলিশে ধরিয়ে।'—এমনিই সব নানা মন্তব্য।

এসব দুর্নীতি-দলনী বাক্য অবশ্য দীর্ঘতা পায়না। একটু পরেই রেলযাত্রী বাবুরা নিজস্ব সাংস্কৃতিক জগতে লিপ্ত হ'ন। কেউ তাস হাতে ধ্যানী বকের দশা প্রাপ্ত হ'ন। কেউ মনোযোগী হ'ন অফিসের কেচ্ছাদি বিষয়ে। আবার কেউ শরীরের কোনো একটা অংশকে কোথাও একটু সাপোর্ট দিয়েই দিব্যি ঝিমুনি লাগান। ভিড়, ধাক্কাধাক্কি, হুড়োহুড়ি,—'ও মশায়, এটা কি হচ্ছে, ওটা কি হচ্ছে'—ইত্যাদি হ্যানা-ত্যানায় পারস্পরিক কোন্দলের ব্যাক-গ্রাউণ্ড মিউজিকটিও বাজতে থাকে অহরহ। ফলে গাড়ীর বাবুদের তাৎক্ষণিক উত্তেজনা, যা তাদের প্রতি দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠে দপ্‌ ক'রে নিভে যায়, তার প্রতি ওরা বিশেষ পাত্তা-পরোয়া দেখায় না। তাছাড়া, ওরাও এখন নিত্য যাতায়াতের সুবাদে রেলপথের ডেলি-প্যাসিঞ্জারির কৌলিন্যের অধিকারী। ওরাও এখন মাননীয় ডেলি প্যাসেঞ্জার। ওদের নির্বাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভয়ের কেন্দ্রবিন্দু তাই শুধু ঐ মাঝে-মধ্যের 'এস্‌পেশাল'।

যেহেতু ভয়ের ঐ ব্যাধি বড়ো স্পর্শকাতর এবং সংক্রামক, তাই কোনো স্টেশনে দুই গাড়ীতে ক্রসিং হলেই ডাউন ট্রেনের দরজায় জানালায় ভীত ত্রস্ত জিজ্ঞাসা অবিরাম হামলায়—'ও দিদি—ভালো?'—ও মাসি—ভালো?'

এদিকের সব স্টেশন বিপদ-মুক্ত থাকলে আপ-এর গাড়ী জানান দেয়—'ভালো—ভালো—।' —আর 'এস্‌পেশালের' হামলা থাকলে সেই মারাত্মক দুঃসংবাদটি অনিবার্য সতর্কতার তাগিদে নানাকণ্ঠে উচ্চারিত হয়।

এতে ফলতঃ সকলেরই নিজস্ব সাবধানতা অবলম্বনের সুযোগ ঘটে। মাঝপথেই কেউ বাধ্যতামূলক যাত্রাভঙ্গ করে। আবার যারা উপায়ান্তর-হীন, মাঝপথে অবতরণে অক্ষম, নিজস্ব চাল-পূর্ণ মূল্যবান বস্তাগুলোকে কামরার মধ্যে দরজার আড়ালে, বেঞ্চির তলায়, প্যাসেঞ্জারদের পায়ের ফাঁকে, অবিরাম লুকায়। অথবা অধিকতর কোনো নিরাপত্রার সন্ধানে তৎপর হয় অতীব ক্ষিপ্রতায়।

একটা বস্তাকে এ-পাশে বেঞ্চের তলায় ঢুকিয়ে এবং দ্বিতীয়টিকে কাঠের পার্টিশনের গায়ে ঠেস্‌ দিয়ে রেখে পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বিন্তি। বিনতা ঘোষাল—অধুনা চাল পার্টির পয়লা-নম্বরের মেয়ে—এ লাইনের একটি কিংবদন্তীমূলক নাম। অফিস টাইমের থক্‌থকে, গায়ে গা লেপটানো ভিড় এখন। ওরই মধ্যে বস্তাগুলোকে সামলে-সুমলে, অগ্রবর্তী প্রতিটি স্টেশনের প্রতি সতর্ক নজর রেখে, ত্রস্ত অপেক্ষার রোজনামচা। বিন্তিও এখন এসব আনুষঙ্গিক সাবধানতায় ব্যাপৃত।

আজকের এই বিন্তিকে দেখে বছর কয়েক আগেকার বিন্তির শারীরিক অথবা মানসিক রূপ-চিত্রটি আনুমান করা দুরূহ। বিনতা থেকে 'বিন্তি'তে তার এই অমোঘ পরিবর্তন—সম্ভবত বিন্তির নিজস্ব অনুমানের সীমার মধ্যেও আসে না। সমগ্র ব্যাপারটির মধ্যে এমনই একটি বৈপরীত্য, যার নিগূঢ় চিন্তায় বিন্তিও হয়ত বিমূঢ়তা বোধ করবে। চালের চোরাচালানের দলের সঙ্গে মিলেমিশে নিঃশেষে একাকার হয়ে যাওয়া—বিন্তির কয়েক বছর আগেকার মানসিকতা বা পারিবারিক পারিপার্শ্বিকতার আবহাওয়ায় ছিল অকল্পনীয়। সেটাই ঘটেছে, যেহেতু বাস্তবও কখনো কখনো কল্পনাকে অতিক্রম করে।

দেশ-বিভাগের ঝাপটায় প্রায় একবস্ত্রে দেশ ছেড়েছিলেন উমাপতি ঘোষাল। দেশের মাটির ভালবাসার শিকড়-বাকড়ের বড়ো টান। সেই মায়াবী টানে দেশ-বিভাগের পরও আটকে ছিলেন বেশ কয়েক বছর উমাপতি। পৈতৃক ভিটে, জমিজমা, শিষ্যবাড়ীর প্রণামী—এই অভ্যস্ত জীবন-যাত্রা থেকে রিক্ত হয়ে অনিশ্চিত জীবনের হঠকারিতায় পা বাড়াতে স্বাভাবিক দ্বিধা ছিল তার মনে। কয়েক পুরুষের উত্তরাধিকার নিয়ে তিনি ছিলেন যে-অঞ্চলের বাসিন্দা, সেখানকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও মোটামুটি একটা চলনসই অবস্থায় স্থিত ছিল। কিন্তু সেখানেও বহিরাগত পশু-শক্তির অনুপ্রবেশে বিলম্ব ঘটল না। এবং অচিরেই কিছু সুযোগ-সন্ধানীর মদত-পুষ্ট হয়ে আগুন জ্বলল। ঐ অঞ্চলের হিন্দুদের তা দাহ্য-পদার্থে পরিণত করতে বেগবান হ'ল। একটুর জন্যই পৈতৃক প্রাণটিকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন উমাপতি এবং নিতান্ত নিঃসহায়ে, এক বস্ত্রে, স্ত্রী এবং বালক পুত্রকে নিয়ে চলে এসেছিলেন, অথবা আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, এ-পার বাংলার বিভূঁয়ে।

তারপর অনিবার্যভাবেই শুরু হয়েছিল এক অপ্রস্তুত কঠিন লড়াই। দু'মুঠো অন্ন, মাথা-গোঁজার একটু ঠাঁই, যৎ-কিঞ্চিৎ পরিধেয়। কিছুই অনায়াস-লভ্য নয়, বরং এর প্রত্যেকটির জন্যই উমাপতির দেহের রক্তবিন্দু জলকণায় পরিণত হচ্ছিল। কিন্তু এই অসম লড়াইয়েও উমাপতি নিজেকে পরাজিত হতে দেননি। অন্ততঃ সংগ্রামের বিরামহীন প্রচেষ্টাটা অব্যাহত রেখেছিলেন। সাত জায়গায় নানাবিধ নাকানি-চোবানি, প্রতিশ্রুতি, প্রতারণা ইত্যাদিতে বিষম রকম জেরবার হতে হতে শেষ পর্যন্ত উমাপতি একটু আশ্রয়ের হিল্লে করতে পেরেছিলেন।

রেল-স্টেশন থেকে প্রায় মাইল দুয়েক দূরে, হোঁগলা-বাঁশ-জলা জঙ্গল ঠেঙ্গিয়ে সদ্য-নির্মীয়মান একটি রিফিউজী কলোনী। ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার আত্যন্তিক প্রয়াসে উমাপতি বিলক্ষণ কামড়া-কামড়ি ক'রে সেখানে এক চিলতে জমি দখলের সম্ভাবনাকে কার্যকরী করতে পেরেছিলেন। ছোটো একটা ঘরও তুলেছিলেন মাথা গোঁজার। রিফিউজী কলোনীর শিক্ষা-বিস্তারের নড়বড়ে একক ভরসাস্থল প্রাইমারী স্কুলটিতে শিক্ষকতার একটু ব্যবস্থাও হয়েছিল। অভাব-দারিদ্র এবং আনুষঙ্গিক হীনমন্যতা—এগুলির সাহচর্য এড়ানো সম্ভব ছিল না, তবু উমাপতি বিগত কয়েক বছরের দুঃস্বপ্নের ক্লেদ গ্লানিকে ভুলতে চেয়েছিলেন এবং যে কোনো আশাজীবী মানুষের মতোই ক্লিন্ন বর্তমান এবং অনাগত ভবিষ্যতকে ঘিরে একটি সুখ-স্বপ্নের মায়া-নীড় রচনায় বড়ই নিষ্ঠাভরে নিয়োজিত করেছিলেন নিজেকে।

তাঁকে এ বিষয়ে বীজাকারে হলেও মদত জোগাচ্ছিল পারিপার্শ্বিক কিছু উপকরণ। নিতান্ত অনাদৃত পরিবেশে তাঁর বালক-পুত্রটি বড়ো হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। অপুষ্টি-জনিত ক্ষীণ কলেবরেও সহজাত মেধার বিকাশ ঘটেছিল। মেধা এবং রিফিউজী সার্টিফিকেটের কল্যাণে আর্থিক অনটন ছেলেটির উচ্চ শিক্ষার পথে মারাত্মক কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারল না। স্কুল ছাড়িয়ে কলেজ। মেধা, মনোযোগ এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার বাঙাল গোঁয়ারপনায় কলেজী শিক্ষার ক্ষেত্রেও সে নিজেকে যথেষ্ট সম্মানের আসনে বসাতে পারল।

ইতিমধ্যে সংসারে এসেছে আর একটি নতুন মুখ। স্নেহ এবং মমতায় আপ্লুত উমাপতি মেয়ের নাম রেখেছিলেন—বিনতা। ছেলে এবং মেয়েকে তুল্যমূল্যে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ববোধে উমাপতি মেয়েকেও স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। ছাত্রী হিসেবে বিনতার মধ্যেও কৃতিত্বের স্ফুরণ ঘটল। মেধাবী দুটি সন্তানের জনক হিসেবে নম্র অহংকারী আত্মসুখ অনুভব করতে থাকেন উমাপতি। ছেলেমেয়েকে কেন্দ্র ক'রে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং হৃত-মর্যাদা পুনরুদ্ধারের অলৌকিক স্বপ্ন তাঁকে বর্তমানের হতমান দিনযাপনের দুঃসহতাকে তাৎক্ষণিক এবং ক্ষণস্থায়ী ব'লে ভাবতে শেখায়।

ছেলে বি.এস.সি পাশ ক'রে সম্মানজনক শর্তে চাকুরিতে বহাল হয় একটি নামী প্রতিষ্ঠানে। সফলতার এই সূত্রপাতে ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনাময় দিকটি যখন ক্রমশঃ একটি বাস্তব-ভিত্তিক অবয়ব গ্রহণের উপযোগী হয়ে উঠছিল, তখনই বোঝা গেল, ভাগ্য কী নির্মম প্রতারক। নাটক-নভেলীয় ঘটনা ব'লে যে-সব মোটা দাগের ব্যাপারগুলোকে চিহ্নিত করা হয়, বাস্তবেও তার এক-আধটা দুর্লক্ষ্য নয়। অফিস-ফেরত ছেলে একদিন আর বাড়ী ফিরল না। পরদিন পুলিশ মারফত খবর পেয়ে উদ্‌ভ্রান্ত, দিশেহারা, বজ্রাহত এক বৃক্ষের ন্যায় বিপর্যস্ত উমাপতি যখন পৌঁছলেন হাসপাতালে, তখন সব শেষ। ভিড়ের বাস থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে মাথাটা থেঁতলে যায় এমন মারাত্মক ভাবে, চিকিৎসা-শাস্ত্রের আপ্রাণ চেষ্টাতেও যেখানে আর করণীয় কিছু ছিল না।

এই নির্মম শোকের আঘাত উমাপতিকে হত বুদ্ধি জড় এবং স্থবির ক'রে দিয়েছিল। দুর্ভাগ্য যখন আসে, তখন একা আসে না, এই বহুল প্রচারিত প্রবাদ-বাক্যটিও এ-সময় উমাপতির ক্ষেত্রে বলবান হ'ল। ছেলেকে হারানোর বছর খানেকের মধ্যেই হারালেন স্ত্রীকে। সংসারকে তখন একটি অথৈ জলাশয় ব'লে মনে হ'ল, এবং এ-জাতীয় পরিস্থিতিতে সাঁতারে অদক্ষ উমাপতি মেয়েটিকে নিয়ে চূড়ান্ত কাহিল হয়ে পড়লেন। শরীর এবং মন দুই-ই নিস্তেজ, গতিহীন। কিন্তু গত কয়েক বছর ধ'রেই উমাপতি নানাবিধ প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে এক ধরনের সহিষ্ণুতা এবং স্থিতিশীলতার শক্তি অর্জন করেছিলেন, যা তাঁকে এই নতুন পরিস্থিতিতেও একেবারে দুমড়ে মুচড়ে নিঃশেষিত হতে দিল না। সংসার নামক ঘানিটি তাঁকে টেনে চলতেই হবে, কারণ এ-ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখার চিন্তাটাই তখন তাঁর কাছে সব থেকে বলবতী মনে হ'ল। বছর দুয়েকের মধ্যে উমাপতিকে চাকরি থেকে অবসর নিতে হ'ল এবং তাঁর প্রাইভেট টিউশানির যৎসামান্য উপার্জনই জীবিকা-নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়াল।

ওদিকে কাল-গতির অনিবার্য পরিণামে কৈশোর অতিক্রান্ত হ'ল বিনতা। তার শরীরে যৌবন এলো এবং সেটা এল্লো বেশ প্রবল মাত্রায়। বর্ষার কলাগাছের মতো তার শরীরের এই বাড় ভিন্নতর এক ধরনের বিপত্তি সৃষ্টি করল তাদের নিস্তরঙ্গ পারিবারিকতায়। স্কুলটি বেশ দূরে। স্কুলে যাতায়াতের পথে নানা ধরনের কুৎসিৎ দৃষ্টির সম্মুখীন হতে হয় তাকে প্রায়ই।

তবু এক রকম চলছিল। কিন্তু পরিস্থিতি জটিল ক'রে তুলল একটি ছেলে। নিবারণ দাসের ছেলে পলাশ।

স্টেশন সংলগ্ন বাজারে মুদিখানার দোকান নিবারণের। সামান্য আনাজ-পাতির দোকান দিয়ে শুরু করেছিল নিবারণ। সহজাত একটি কৌশলী ব্যবসা-বুদ্ধি ছিল নিবারণের মধ্যে এবং পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র অনুকূলতায় তার সেই ব্যবসা-বুদ্ধি বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করল। ধীরে ধীরে মুদিখানার দোকান বসিয়েছে, সঙ্গে চালের দোকান। ক্রমশঃ তা ফুলে ফেঁপে পরিণত হয়েছে একটি রমরমে ব্যবসা-কেন্দ্রে। সেই নিবারণের একমাত্র ছেলে পলাশ। স্কুলের মধ্যবর্তী পর্যায়ে এসে একই ক্লাসে বার তিনেক পলাশের ফেল করার সুবাদে নিবারণের সহজ বুদ্ধিতে এটা বুঝতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব ঘটেনি, ছেলের বিদ্যাশিক্ষার জন্য অর্থব্যয় নিছক একটি অলাভজনক লগ্নি। কিন্তু তবু চেষ্টার ত্রুটি করেনি নিবারণ। কিন্তু পরিশেষে হাল ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। তাই পলাশ এখন নির্ভেজাল একটি নিষ্কর্মা এবং বাপের পয়সায় কাপ্তানি ক'রে বেড়ানোতে তার সময় এবং সুযোগ কোনোটারই অভাব নেই। মেয়েদের পেছনে লাগা তার অন্যতম প্রিয় ব্যসন। কয়েকটি শাগরেদও জুটিয়েছে।

এহেন পলাশের কাছে সদ্য-যৌবনা স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী বিনতা যে একটি লোভনীয় টার্গেট হয়ে

উঠবে, এ আর বিচিত্র কী। বিনতার সঙ্গে ভাব জমানোর জন্য প্রয়োজনীয় কাজকর্মে সে বিশেষভাবে মনোযোগী হ'ল। রাস্তায় দেখা হলেই নানারকম ইশারা ইঙ্গিত। এবং ক্রমেই সেটা উপনীত হ'ল বাড়াবাড়ির পর্যায়ে। বৃদ্ধ দুর্বল দরিদ্র উমাপতিকে কেই বা পরোয়া করে। সন্ধ্যেবেলায় টিউশানিতে বেরিয়ে যাওয়া উমাপতির নিত্যকার রুটিন। জীর্ণ মাটির ঘরে একা থাকে বিনতা। মাঝে মাঝে অন্ধকারে বেড়ার গায়ে কাদের কালো ছায়া ফিসফিস করে, বিনতার নাম ধরে ডাকে। কখনো অশ্লীল শব্দ আর বাক্যের চিঠি এসে পড়ে বিনতার সামনে। অক্ষম অসহায়তা আর ভয় সিঁটিয়ে রাখে বিনতাকে। এইসব নষ্টামির বৃত্তান্ত বাবার কাছে বলতে তার স্বাভাবিক সঙ্কোচ। তবু জীবন-সংগ্রামে নানা পোড়-খাওয়া উমাপতি, কখন্ কেমন করে যেন এ সবের কিছু অনুমান করতে পারেন।

একদিন হাতে-নাতে ব্যাপারটা ধরা পড়ল উমাপতির কাছে। ছাত্রের সর্দি-জ্বর জনিত কারণে সেদিন সন্ধ্যের পড়ানোটা বন্ধ। একটা কী অদৃশ্য তাগিদ যেন উমাপতিকে দ্রুত বাড়ীতে ঠেলে এনেছিল। অন্ধকারে নিঃশব্দে কখন এসে দাঁড়িয়েছিলেন ঘরের পাশে। উমাপতির বিস্মিত দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল, কে একজন ঘরের জীর্ণ বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। ঘরের মধ্যে বিনতা পরিস্থিতির এতটা বিপর্যয় সম্পর্কে বোধহীন, হারিকেন জ্বেলে তখন যথাসাধ্য মনোযোগে স্কুলের পড়া তৈরী করছিল।

পারিবারিক শালীনতার এই তীব্র সঙ্কট বৃদ্ধ দুর্বল উমাপতিকে নিমেষে দুঃসাহসী বেপরোয়া করে তুলল। দ্রুত ছুটে এসে অন্ধকারের মধ্যে খপ্ ক'রে ধরে ফেলেছিলেন লোকটার হাত। এবং তাকে চিনতেও বিলম্ব ঘটেনি। নিবারণের ছেলে পলাশ।

রাগ দুঃখ এবং অপমান একযোগে উমাপতির অন্তরাত্মায় নিদারুণ বিস্ফোরণ ঘটাল। সারা শরীরে থরথর ক'রে তীব্র কাঁপুনি অনুভব করেছিলেন। বিমূঢ় কণ্ঠস্বরে শুধু শাণিত ফলকের মতো একটি তীব্র ধিক্কার উচ্চারিত হ'ল— 'লজ্জা করেনা, লজ্জা করেনা তোমার এইভাবে মেয়েদের মান-সম্মান নিয়ে নষ্টামি করতে?'

এ-ধরনের আচরণকারী মানুষ মূলত কাপুরুষ—সুতরাং আকস্মিকভাবে ধরা পড়ায় এবং উমাপতির প্রশ্নের তীব্রতায় পলাশ প্রাথমিকভাবে কিছুটা বিহ্বল হ'ল, কিন্তু পরমুহূর্তে উমাপতিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিমেষে অন্তর্ধান করল।

অতঃপর দীর্ঘায়িত হ'ল ঘটনাটি। কদিন বাদেই উমাপতিকে তার কাজের ফলভোগ করতে হ'ল। রাত্রির নির্জন রাস্তায় টিউশানি-ফেরত উমাপতির পায়ের উপর দিয়ে কে বা কারা সাইকেল চালিয়ে চলে গেল। চোট লাগল উমাপতির বুড়ো হাড়ে। শয্যাশায়ী হতে হ'ল তাঁকে। সংসারে হাঁড়ি অচল হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। ঘর এবং বার—দু'দিকেরই দায়ভার তখন ন্যস্ত হ'ল বিনতার উপর। অনিবার্যভাবেই বিনতার লেখাপড়ায় ছেদ ঘটল।

আকস্মিক কোনো জরুরি কাজে সেদিন স্টেশনে গিয়েছিল বিনতা। যথারীতি কয়েকটি চ্যাংড়া ছেলের ভন্‌ভনানি শুরু হ'ল বিনতার পারিপার্শ্বিকে। এর কয়েকটা পলাশের অনুচর হিসেবে চিহ্নিত। একলা একটি যুবতী মেয়ের বিরুদ্ধে এদের রণকৌশলটি অদ্ভুত ধরনের। সরাসরি কেউ কিছু বলে না। কিন্তু অকারণে, অন্যমনস্কতার ভাণ ক'রে আশপাশ দিয়ে যাতায়াত করে। একটু আলগা ধাক্কা মারে। চকিতে কোনো অশ্লীল মন্তব্য উচ্চারিত হয়। প্রতিবাদ করা যায় না। শুধু এক বিষম জল-বিছুটির জ্বালায় যেন জ্বলতে থাকে সারা শরীর।

সময়ের এক আশ্চর্য যোগাযোগে ঠিক সেই সময়েই একটা আপ ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছিল স্টেশনে। আর সামনের কামরা থেকে ঝটিতি নেমে এসেছিল শঙ্করা।

শঙ্করাকে চেনে বই কী বিনতা। শঙ্করার কার্যকলাপের পরিধি এতো বিস্তৃত যে, এতদঞ্চলের

অধিবাসীদের কাছে সে একটি বাধ্যতামূলক পরিচিত ব্যক্তিত্ব। নামকরণের প্রথা অনুযায়ী কোনো স্বজন হয়ত কবে তার নাম রেখেছিল শঙ্কর। কিন্তু এখন লোকের মুখে মুখে যে নামটি ফেরে, তা শঙ্কর নয়, বর্ণ-বিপর্যয়ে তা 'শঙ্করা' নামে রূপান্তরিত। সমাজ বিরোধী কাজকর্মে তার দক্ষতা নাকি তর্কাতীত—এ জাতীয় ধারণা স্থানীয় ভদ্র অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

তার কাজের গুরুত্বই তাকে এ-সব লাইনে 'গুরু' হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ইদানীং চালের ব্ল্যাক তার জীবিকার্জনের প্রধান হাতিয়ার হয়েছে। সুতরাং শঙ্করার মতো সমাজ-বহির্ভূত বিপজ্জনক ছেলেকে দ্রুত এড়িয়ে যাওয়াই তো ভদ্রঘরের মেয়েদের একান্ত কর্তব্য। সেই কাজটি অত্যন্ত দ্রুত সারতে চেয়েছিল বিনতাও।

কিন্তু বিনতার পিছনের ঐ বেলেল্লা ছেলে-গুলোকে দেখেই ব্যাপারটা অনুমান করতে পারল শঙ্করা। হিংস্র উগ্রতায় টান্ টান্ হয়ে ছেলেগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওরা দলে ভারী। কিন্তু শঙ্করার উদ্ধত মারমুখী মেজাজের সামনে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে সাহস পায়নি। সব কটাই পালিয়েছিল।

ঝড়ে-পড়া পাখির সন্ত্রস্ততা তখন বিনতার চোখেমুখে। এক পলক সেখানে চোখ বুলিয়ে শঙ্করা বলেছিল—'আপনি উমাপতি মাষ্টার মশায়ের মেয়ে না?'

বিনতার চোখ তখন ফাটা আকাশ—জল-ধারায় প্লাবিত। ঘাড় কাত ক'রে অসহায় কণ্ঠস্বরে কোনোমতে বলেছিল—'হ্যাঁ।'

—'বাড়ী যান। ভয় নেই। ওরা আর আপনার পিছনে লাগতে সাহস পাবে না।'—বিনতার মুখের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী কণ্ঠে বলেছিল শঙ্করা।

শুরুর ইতিহাস মূলত এ-রকম। এরপর দুজনের সাক্ষাতের ঘটনা বহু—বহুবার পুনরাবৃত্ত হ'ল। শঙ্করার সহানুভূতি। বিনতার সঙ্কোচের বৃত্তটি ক্রমশঃ গুটিয়ে আসা। দু'চার টাকার সাহায্য। জীবিকার নিরাপত্তা সন্ধান। তারপর ঘটনার অমোঘ পরিণতিতে সেদিনের শান্ত, ভীতু, একান্ত গৃহাশ্রয়ী বিনতা পরিণত হ'ল আজকের বেপরোয়া বিন্তিতে। ফরিদপুরের বিখ্যাত ঘোষাল বংশের গণপতি ঘোষালের ছেলে উমাপতি ঘোষালের ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়া মেয়ে বিনতা ঘোষাল রূপান্তরের ধাপে ধাপে পরিণত হ'ল চাল-পার্টির বিন্তিতে।

প্রথম প্রথম ভয় করত। দ্বিধা এবং সঙ্কোচের বেড়ি যেন জড়িয়ে রাখত দুটো পা-কে। বাজার থেকে ব্যবসায়ী-ব্যাপারীদের কাছ থেকে চাল কেনা, ট্রেনের কামরায় সন্ধানী তৎপরতায় চাল লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া, পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে আত্মগোপনের পন্থা আবিষ্কার, কলকাতার হোটেল বা দোকানে নিয়ে চতুর ব্যবসায়িকতায় সেই চাল বিক্রি করা—এসব জটিল কাজগুলি সম্পন্ন করা প্রথম দিকে বিনতার পক্ষে ছিল বড়ই কঠিন। আশেপাশে কত রকমের লোক। কত রকমের দৃষ্টি।

এই সব বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে শঙ্করা দু'হাত মেলে ওকে আড়াল করে রেখেছে, অনভ্যস্ত কাজগুলোতে বিনতাকে সহনশীল করে তুলবার জন্য আনুকূল্য জুগিয়েছে। অনুভা মালতীরা ওকে সঙ্গ দিয়ে এ লাইনের ঘাট-ঘোট চিনিয়ে তাকে পারদর্শী হতে সাহায্য করেছে। ভদ্রঘরের লেখাপড়া জানা বিনতাকে দলে নিতে প্রথম দিকে ওদের মনে ছিল কুণ্ঠা, অনিচ্ছা। এসব লাইনের কাজে সকলে উপযুক্ত নয়, সব কাজ সকলের সাজে না, পোষায় না—এ জাতীয় ভাবনা স্বাভাবিকভাবেই প্রথম দিকে ওদের মনে বিনতা সম্পর্কে একটা অনীহা জাগিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু বিনতা সম্পর্কে ওদের এই মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটে অবিলম্বে। বিনতার প্রতি একটি ভিন্নতর বিস্ময়বোধ জন্ম নেয়। এখন ওদেরও অকপট স্বীকারোক্তি—'এ-লাইনে বিন্তির মতো এস্‌পার্ট (এক্সপার্ট) মেয়ে আর নেই।'

সেদিনের ঘটনাটা আজও বিত্তির এক উজ্জ্বল স্মৃতি। কী কারণে শঙ্করা সেদিন ছিল অনুপস্থিত। শঙ্করার নিরাপত্তার আওতার বাইরে সেদিনই বিত্তির প্রথম চাল নিয়ে আসা। সেটা ছিল ছুটির দিন। অফিস-কাছারি বন্ধ-জনিত কারণে রেলগাড়িতে তুলনামূলকভাবে ভিড় কম। সেজন্য বিত্তি ইচ্ছাকৃতভাবেই চালের পরিমাণ কিছু বেশী নিয়েছিল। প্রায় ত্রিশ কে.জি.র বস্তা। সঙ্গে ছিল অনুভা মালতী এবং চাল-পার্টির ভিন্ন একটি শাখার আরো কয়েকটি মেয়ে। রেল-কামরার বিস্তৃত একটা অংশে যথেচ্ছ মৌরুসী-পাট্টা গেঁড়ে সবাই কলকাতা যাচ্ছিল। প্রতি ক্রসিং স্টেশনে নিয়মমাফিক খবর সংগৃহীত হচ্ছিল। সর্বত্র নিরাপত্তার সঙ্কেত— সব 'কিলিয়ার'। কোথাও কোনো 'এস্‌পেশাল' নেই। ওদের গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা এবং ঢিলেঢালা নিশ্চিন্ততায় সামগ্রিক পরিমণ্ডলে ছিল একটা উৎসবের আমেজ।

অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই পরিস্থিতি মোড় নিল। কলকাতার কাছের বড় জংশন স্টেশনটায় গাড়ী থামতেই একদল 'এস্‌পেশাল', যেন বা কালান্তক যমদূত, ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের কামরাটার উপর। সাবধানতার বিন্দুমাত্র সুযোগের অবকাশ ওরা ছিল না। বস্তাগুলোকে টেনে টেনে নামাতে লাগল নির্মমভাবে। অনুভা মালতীর বস্তাদুটোও সেই টানের ধারাবাহিকতায় নেমে গেল। চীৎকার, কান্নাকাটি, আর্তনাদ—অসহায় বিপন্নতার এক চূড়ান্ত পরিমণ্ডল।

একটু কোণের দিকে, কিছুটা দৃষ্টির অন্তরালে বসেছিল বিত্তি। পৃথুল বস্তাটা সেঁধিয়ে দিয়েছিল বেঞ্চের তলদেশে। এখন বিত্তি আত্মরক্ষায় অক্ষম এক অসহায় শিকারমাত্র—ভীত দু'চোখের দৃষ্টি মেলে দেখল, ওদিকের বস্তাগুলো নিঃশেষে নামিয়ে দিয়ে দুটো পুলিশ লাঠি উঁচু ক'রে এদিকে ধাবিত। নিঃসন্দেহে ওর বস্তাটাই এখন ওদের একক লক্ষ্যবস্তু। কামরাসুদ্ধ লোক অবাক হয়ে দেখছে ঘটনাটা। কারো দৃষ্টিতে নির্ভেজাল মশকরা।

চোখের প্রতিটি তন্তুতে শিরায় একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করে বিত্তি। পরিত্রাণের কোনো পন্থাই সে খুঁজে পায় না। এতগুলো চাল। নিয়ে গেলে যে সমূহ ক্ষতি, তার গুরুত্ব চিন্তা ক'রে বিত্তি যেন উন্মাদপ্রায়। কঠিন প্রতিজ্ঞায় ওর ওষ্ঠদুটি হয় দৃঢ়বদ্ধ। না, কিছুতেই চালের বস্তা নিতে দেওয়া চলবে না। যে কোনো প্রতিরোধের ব্যবস্থাপনায় ওর মন স্থিত হয়।

দ্রুত উঠে দাঁড়ায় বিত্তি। দশভুজার অমিত পরাক্রম যেন এখন ওর বাহুতে, সর্বাঙ্গে। ভারী বস্তার মুখটা শক্ত ক'রে বাঁধা ছিল দড়ি দিয়ে। বস্তাটাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধ'রে বিত্তি মুখ নত করল সেই বাঁধনের উপর। ধারালো দাঁতের পেষণে কট্‌কট্ ক'রে ছিন্ন ক'রে দিল সেই গ্রন্থি। তারপর দেহের সমস্ত শক্তি দুই বাহুতে সংহত ক'রে প্রাণপণে উলটে দিল বস্তাটাকে। দ্রুত ধাবমান পুলিশ দুটির তৎপরতার ঘাটতি ছিল না, কিন্তু তাদের আগুয়ান হাতগুলো বস্তাটাকে স্পর্শ করার আগেই সমস্ত চাল স্তূপাকারে ছড়িয়ে পড়ল গাড়ীর মেঝেয়। ওদিকে ট্রেন তখন গতিশীল। চলন্ত ট্রেন থেকে উল্লম্ফনে নামতে নামতে পুলিশ দুজন গালাগালি দিল—

'শালী, বাগে পেলে দেখাব তোকে আর একদিন।' —

উদ্বেগ আর শ্রান্তিতে বিত্তি তখন ঘেমে নেয়ে একশা। গাড়ীর গতিবেগ বৃদ্ধি পেতেই বিস্রস্ত চালগুলো আবার দ্রুত হাতে বস্তায় তুলল।

সন্ধেবেলায় সবাই এক জায়গায় মিলিত হ'লে মালতীর কণ্ঠে উচ্ছ্বাস—'তুই দেখালি বটে আজকে বিত্তি!'

ঘটনার আদ্যন্ত বিবরণ শুনে শঙ্করা ওর পিঠের উপর হাত রেখে বলেছিল—'তুমি মাইরি গুরু—আমাকেও হার মানিয়ে দিলে। লেগে থাকো। উন্নতি হবে তোমার এ-লাইনে।'

মিষ্টি হাসির উদ্ভাস খেলেছিল বিত্তির মুখে। বছর পাঁচেক আগে স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী

সভায় গানের প্রতিযোগিতায় যোগ্যতার বিচারে ফার্স্ট হয়েছিল বিপ্তি। পুরস্কার বিতরণ করার সময় সভাপতি এস.ডি. ও সাহেব বিপ্তির পিঠ চাপড়ে ওর কণ্ঠস্বরের মধুরতার তারিফ করেছিলেন। সেদিনও বিপ্তি হেসেছিল। ওর চাল-পাচারের দক্ষতায় শঙ্করার পিঠ চাপড়ানো প্রশংসাবাক্যে আজও হাসল হুবহু সেই একই হাসি।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে অতীতের এই সব ঘটনার আলো-ছায়াময় স্মৃতি-রোমন্থনে কখন যেন একটু ঝিম্ এসে গিয়েছিল বিপ্তির। পিঠের দিকের এলায়িত আঁচলে আকস্মিক একটা টান পড়তেই উচ্চকিত হ'ল। টান্ টান্ স্নায়ুর সজীবতায় সটান ঘুরে দাঁড়াল এদিকে। ভিড়ের মধ্যে কতো যে বিচিত্র প্রকৃতির হাত এসে গায়ে ঠেকে। নিত্যকার চলাফেরার অভ্যাসে এখন এসব বিষয়ে খানিকটা সহনশীল হতে হয়েছে। উপায়ই বা কী! তবু মাঝে মাঝে কী যেন এক অনিবার্য ঘৃণায় ঘিন্‌ঘিন্ করে সারা শরীর। আকস্মিক আঁচলে টান পড়তেই তাই কিছুটা বিহ্বল, হতচকিত বিপ্তি চম্‌কে ঘুরে দাঁড়াল এদিকে।

।। দুই ।।

সদ্য পার হয়ে গেল জংশন স্টেশনটা। বেশ কিছু যাত্রী নেমে গেছে। ফলে কিছু আগের সেই দম-বন্ধ ভিড়ের রশি কিছুটা আলগা। বিপ্তির চোখে ত্রস্ত ভ্রূকুটি—এপাশ ফিরে তাকায়।

নিচে মেঝেতে বসে আছে আধবুড়ো মানদা। এক বগলে চালের পুঁটলি। আর এক বগলে হাড় জিরজিরে রোগা ছেলেটা। মার শুকনো স্তন-বৃন্তে মুখখানা তার ন্যস্ত। ওর কাপড়ের আঁচল ধরে টানার মূলে যে মানদা, এটা স্পষ্ট হয় বিপ্তির কাছে। চোখের দৃষ্টিতে যুগপৎ ভীতি এবং জিজ্ঞাসা প্রকট হয় বিপ্তির—তীক্ষ্ণ চোখে তাকায় মানদার দিকে। কারণ, মানদার এ-ধরনের সঙ্কেত একটিই অর্থের দ্যোতক—গাড়ীতে পুলিশ উঠেছে। কিন্তু মানদার মুখাবয়বে সে জাতীয় কোনো শঙ্কার প্রতিভাস লক্ষ করতে পারেনা বিপ্তি। বরং এক চাপা তরল কৌতূহল মানদার ভাঙাচোরা মুখে কিল্‌বিল্ করছে দেখতে পায়। বিপ্তির মাথাটা ঝুঁকে যায় সামনের দিকে, পরিস্থিতিটাকে যাচাই করবার জন্য কোঁচকানো ভ্রূর তলায় ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মানদার মুখের উপর ন্যস্ত হয়।

উপবিষ্ট মানদার মাথাটা জিরাফের মতো উঁচু হয়, ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে—'তোর ছোক্‌রাবাবু উঠেছে রে বিপ্তি—'

আকস্মিক চমক খায় বিপ্তি এবং দ্রুত ঘাড় ঘোরায় দরজার দিকে। বিপ্তি দেখল—সেই লোকটি, লোকটি না ব'লে ছেলেটি বলাই সঙ্গত, দরজার কাছে অপেক্ষাকৃত পাতলা ভিড়ের মধ্যে সংলগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্যান্ট-শার্ট পরনে—পোষাকের উজ্জ্বলতায় মূল্যের মহার্ঘতা স্বতঃই প্রমাণিত হয়। সহজাত আভিজাত্যের অধিকারী, সুদর্শন বছর চব্বিশ-পঁচিশের তরুণ যুবা। সম্ভবত বিপ্তি এখনো ছেলেটির গোচরে আসেনি। বিপ্তি এখন যেন একটা তেজী ঘোড়া, ঘাড়টাকে টান্ টান্ ক'রে ফিরে দাঁড়াল এদিকে। কিন্তু একটা দুনির্বার আকর্ষণ যেন ওর দৃষ্টিকে স্বতঃই টানতে থাকে পিছনে। যার ফলে কয়েকবার আড়চোখে সে তাকায় ছেলেটির দিকে। বুকের মধ্যে এক অনির্দেশ্য দামামা যেন অবিরাম নিনাদ তোলে। সে শব্দ-তরঙ্গে বিপ্তির ভিতরটা থরথর কাঁপে।

ইতিমধ্যে এসে গেল শিয়েলদা স্টেশন। যাত্রীদের মধ্যে এবার অবতরণের জন্য ব্যস্তবাগীশ চঞ্চলতা। বিপ্তির পক্ষেও এখন আর আত্মগোপন সম্ভব নয়—এবার তাকেও নামতে হবে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে ভিড়ের সুযোগে চেকারকে ফাঁকি দিয়ে এপাশের অরক্ষিত যে গেটটা দিয়ে

ওরা দল ধ'রে পালায়—আজও সে পথ ধরেই পালাতে হবে। ভারী বস্তাটা কাঁকালে তুলে গাড়ীর দরজা দিয়ে নামতেই আকস্মিক চোখাচোখি হয়ে গেল বিন্তির। নাম অনিমেষ—বিন্তিদের চালপার্টির মুখে নতুন নামকরণ—'ছোক্‌রাবাবু'। ধাবমান ভিড়ের স্রোতে বিন্তিকে হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অনিমেষের চোখ দুটো। দু হাতে ভিড় কাটিয়ে দ্রুত ছুটে আসে বিন্তির পাশে। একাগ্র দৃষ্টিতে বিন্তির দিকে তাকিয়ে বলে—

'দেখুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল। আমি না—সেদিন—ঠিক—মানে, আপনাকে কোনো খারাপ কথা বলতে চাইনি।'

বিন্তির সারা মুখে জমাট রক্ত—কঠিন হয়ে ওঠে মুখখানা, কাঁকালের ভারী বস্তার চাপে সটান দাঁড়াতে অসমর্থ, তবু মাথাটা ঘুরিয়ে দু'চোখের ধারালো দৃষ্টিতে তীব্র এক ঘৃণার চাবুক হানে— 'বুঝেছি! কিন্তু আপনারা তো ভদ্দরলোক। আমরা চালপার্টি! জানেনই তো আমাদের কত বড় গ্যাং। দেবো একদিন ফাঁসিয়ে!'

একটি মুহূর্তের বিরতি। বিন্তির শরীরটা আবার সচল হয়। ভিড় বাঁচিয়ে দ্রুত ছুটবার জন্য দুপায়ে গতি আনতে উন্মুখ হয়।

চলতে চলতেই দু'একজন যাত্রীর নজরে আসে ব্যাপারটা। ভিড়ের মধ্যে থেকে উড়ো রসিকতা কানে ভাসে বিন্তির—

'—কি দাদা, কাঁচা যৌবন দেখলেই কি বুকের মধ্যে ডুগ্‌ডুগি বাজে নাকি?'

ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়ায় বিন্তি। মাথা নিচু ক'রে হাঁটছে অনিমেষ। লজ্জায় অপমানে ফর্স্না মুখে কালির পোঁচ। বেশ হয়েছে। এ-রকম একটি প্রতিশোধই তো একান্তভাবে কাম্য ছিল বিন্তির। —ভদ্দর-লোক। আর আমরা চালপার্টি—নাঃ?

শেষ ট্রেনে শঙ্করার সঙ্গে বাড়ী ফিরে খেয়ে দেয়ে হা-ক্লান্ত দেহটাকে বিছানায় এলিয়ে দিয়েছিল বিন্তি। কিন্তু দু'চোখের পাতায় আজ যেন ঘুমের কোনো ছায়া নেই। বারান্দায় খাটের উপরে বাবা শয্যাশ্রয়ী। বিন্তির চালের চোরা-চালানের এই অবৈধ জীবিকা ভয়ানকভাবে আহত করেছিল উমাপতিকে। প্রথমদিকে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটত উত্তপ্ত তর্জন গর্জনে। বংশের মান-সম্মান ইজ্জত সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল—এ জাতীয় চিন্তা তাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলত। কিন্তু তার সাম্প্রতিক মানসিকতা এক ভিন্ন আকার নিয়েছে। এক ধরনের জড়তা যেন আচ্ছন্ন করেছে তার মনকে। দরিদ্র অক্ষম বৃদ্ধ উমাপতি তার পারিবারিক শালীনতার পাঁচিলটিকে টিকিয়ে রাখতে পারছেন না নিছক দারিদ্র আর অক্ষমতার কারণে—এ চিন্তা তাকে ক্রমশঃ প্রতিবাদহীন এক অসহায় জড় পদার্থে রূপান্তরিত করেছিল।

ভোরবেলায় উঠে দু'বেলার রান্না সেরে রাখে বিন্তি। নিজের খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে। উমাপতি তাঁর নিজস্ব তাগিদে টেনে হিঁচড়ে বিছানা থেকে ওঠেন। নিজেই বেড়ে-গুড়ে নিজের খাওয়ার পাট সারেন। বাকি সময়টা নিরুত্তাপ শয্যাবন্দী জীবন।

বিন্তি টের পেলো, একটানা খানিকক্ষণ কাশির দমকে ক্লান্ত বাবাও এবার ঘুমিয়ে পড়েছে। গোটা পৃথিবী যেন এখন শান্ত সমাহিত, ঘুম নামক অতল প্রশান্তিতে জীবকুল নিমগ্ন। কিন্তু বিন্তির চোখে ঘুম নেই। মস্তিষ্কের কোষে কোষে অব্যক্ত যন্ত্রণা। দাহ। আজকাল চোখে জল-টল আসা এক বিরল ঘটনা। নিত্যকার জীবন-ধারার কঠোরতা ওর স্নায়ুগুলোকে সংবেদনহীন, ঘাত-সহিষ্ণু ক'রে তুলেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে, নিস্তব্ধ রাত্রির এই নিরালা অবসরে, বারবার মুছেও চোখের জলটাকে সামলাতে পারছে না বিন্তি।

আজ সারাদিন একটি উত্তেজক অনুভূতি ওর বোধ এবং চেতনাকে টান্ টান্, উগ্র ক'রে রেখেছিল। —বেশ একটা শোধ নিয়েছে—এ-জাতীয় চিন্তায় উত্তেজিত ছিল ওর সমগ্র চেতনা। কিন্তু এখন এই নিস্তব্ধ রাত্রে এক সীমাহীন শূন্যতা, প্রগাঢ় বিষাদ যেন তাকে কোন্ অতলে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সকাল বেলায় অপমানে কালো হয়ে যাওয়া ছোক্‌রাবাবুর সেই ফর্সা মুখখানা যেন স্পষ্ট একটা শরীরী অবয়ব নিয়ে ওর চারপাশে উঁকি দিচ্ছে। ভীরু, অনুতপ্ত কণ্ঠে কিছু যেন বলতে চায় সে বিন্তিকে। কিন্তু সে তো এখন বিন্তি—শুধুই বিন্তি। ভদ্দরলোক নয়, চালপার্টির হা-ঘরে বিন্তি। ওর সঙ্গে তো অনিমেষের মতো ভদ্দরলোকদের কোনো কথা থাকতে পারে না। নিরন্তর এক তীব্র চাবুক হেনে মনটাকে শায়েস্তা করতে চাইল বিন্তি। কিন্তু মন শান্তি হয় কই? চোখের জলও তো বাগ মানে না। প্লাবিত ধারায় চোখের দুই কূলে বিধ্বংসী বন্যার আর্তি।

অনিমেষের সঙ্গে কদিনেরই বা আলাপ! কিন্তু এরই মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর শত্তুর হয়ে উঠল লোকটা বিন্তির।

সেদিনের সেই ভিড়ের গাড়ীর দৃশ্য, সেই দৃশ্যের এক অবিকল প্রতিচ্ছবি প্রতিভাসিত হ'ল বিন্তির চোখের সামনে। ঘটনাকাল দীর্ঘ দূরত্বের নয়। মাত্রই মাসখানেক আগের।

দৈনন্দিন রুটিন-মাফিক সেদিনও সকালের যাত্রী-বোঝাই গাড়ীতে ওরা সদলে চাল নিয়ে যাচ্ছিল কলকাতায়। পথের সাঙ্কেতিক বার্তাদিতে উদ্বেগের আভাস ছিল না বিন্দুমাত্র। কিন্তু জংশন স্টেশনের আগের স্টেশন থেকে গাড়ী ছাড়তেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই রটিত হ'ল এক বিপর্যয়কর খবর—অন্য লাইনের একটা আপ ট্রেনে একদল 'স্পেশাল' নেমেছে জংশন স্টেশনে।

ধাবমান ট্রেনের কামরায় কামরায় উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় ওদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল ব্যাকুলতা, হুড়োহুড়ি। অফিস যাত্রী সুবেশ বাবুরা ওদের এই হুড়োহুড়িতে বিস্তর গাল-মন্দ শুরু করলেন। কিন্তু ওদের তখন এসবে কর্ণপাতের অবকাশ নেই। আত্মরক্ষা এবং আত্মগোপনের সম্ভাব্য সমস্ত রকমের উপায়ের জন্যই তখন ওরা মরিয়া। তবে ভাগ্যটা প্রসন্নই বটে! অজানিত কারণে গাড়ী সিগ্‌ন্যাল পায়নি। জংশন স্টেশনের বেশ খানিকটা আগেই গাড়ীর চলার গতিতে এলো ক্ষণকালের বিরতি। অমনই সবাই যেন দক্ষ পর্বতারোহী, মাথায় কাঁকালে চালের বস্তা চাপিয়ে লাফিয়ে পড়তে লাগল ঝুপ্ ঝুপ্ ক'রে। ইলেকট্রিক ট্রেন পাদানিহীন, লাফিয়ে নামা ছাড়া অবতরণের ভিন্ন পথ নেই। উপায়বিহীন বিন্তিও এক ফাঁকে লাফিয়ে পড়েছিল পার্শ্ববর্তী রেল লাইনের অসমতল খোয়ার উপরে। ওর মাথায় তখন ত্রাণ-লাভের যে চিন্তাটা সক্রিয় ছিল, তা হ'ল, আগে নিজে নেমে তারপর ভারী চালেব বস্তাটা টেনে নামাবে। কিন্তু ভাগ্য ওর সঙ্গে কঠিন তামাসা করল।

বিন্তি নামতে না নামতেই গাড়ীটাতে আচমকা গতি এলো। এবং সেটা বেশ দ্রুত। সিগ্‌ন্যাল পেয়েই ড্রাইভার সাহেব সবেগে এঞ্জিন চালু ক'রে দিয়েছেন। বিন্তি তখন অক্ষম, অসহায়—ধাবমান গাড়ীর সঙ্গে সমতা রেখে অসমান খোয়ার উপব দিয়ে ছুটছিল। আর প্রাণপণে টেনে নামানোর চেষ্টা করছিল ভারী বস্তাটাকে। কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমেই ওব সাধ্য-সীমা অতিক্রম ক'রে যাচ্ছিল এবং যে-কোনো একটা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ঘনীভূত হচ্ছিল ওর চারপাশে।

হঠাৎ ঐ ছেলেটিই, কেমন একটা ঘোর-পাওয়া উদ্দীপ্ত মানুষের মতো এগিয়ে এসেছিল অপ্রত্যাশিতভাবে। এতক্ষণ বিন্তি গাড়ীর মধ্যে জটিল ভিড়ে দাঁড়িয়েছিল ওরই একান্ত সান্নিধ্যে। ছেলেটি আদর-লালিত, কিন্তু বলশালী যুবক। এক ধাক্কা দিয়ে বস্তাটাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল নিচে। আর বিন্তি, যেন মুক্তি পাওয়া এক পক্ষিণী, বস্তাটা কাঁকালে নিয়ে সবেগে পালিয়েছিল নিজস্ব দলবলের সঙ্গে।

ঘটনার সূত্রপাত সেখান থেকেই।

এরপর থেকে দু'জনকে প্রায়শঃই লক্ষ করা যেতে লাগল একই গাড়ীতে। কী এক অদৃশ্য আকর্ষণ যেন ওদের নিত্যদিন এক জায়গায় মিলিয়ে দিতে লাগল। যুবকটিও কোনো অফিসের কর্মী, সেই সুবাদে ডেলি প্যাসেঞ্জার। সকালের অফিস-যাত্রার ট্রেনটিতে বিন্তিরও আগমন এখন নিশ্চিত। যাত্রাপথে একই কামরায় পাশাপাশি দাঁড়ানো। কথাবার্তা কিছুই হয় না। শুধু ভিড়াক্রান্ত কামরায় একান্ত সান্নিধ্যে দুজনের অবস্থান। পরস্পরের চোখের তারায় চকিত দৃষ্টির বিহ্বল মেদুরতা। ভিড়ের চাপে কখনো বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ক্ষণিকের স্পর্শ। সে স্পর্শ সঞ্চার করে কিছু বা শিহরণও। শিয়েলদা স্টেশনে গাড়ী এলেই আবার যে যার ভিন্ন যাত্রাপথে গতিশীল পথিক। গাড়ীতে দেখাশোনা—গাড়ীতেই তার ছেদ। আবার পরদিনের জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষা।

সেই সঙ্গে বিন্তি অপেক্ষা করে রাত্রিটারও। নিস্তব্ধ রাত্রে খেয়েদেয়ে সংকীর্ণ শয্যাটুকুতে শ্রম-ক্লান্ত দেহটিকে এলায়িত ক'রে দেয়। তখন 'ছোকরাবাবু'র মুখখানা যেন ওর সামগ্রিক চেতনায় এক মধুর প্রশান্তি ছড়িয়ে দেয়। ধীরে ধীরে কখন তলিয়ে যায় নিবিড় ঘুমের অতলে।

অনিমেষকে 'ছোকরাবাবু' নামটা দিয়েছে চাল-চালানী দলের মেয়েরা। 'ছোকরাবাবু'—বিন্তির 'ছোকরাবাবু।' ট্রেনের কামরায় ওদের দু'টোর প্রায়শঃ ঘন-সান্নিধ্যে অবস্থান, হাবভাব, বিহ্বল দৃষ্টিপাত,—ওদের অন্তরঙ্গতাকে সকলের কাছে চিহ্নিত করল নির্ভুলভাবে। এবং এসব ব্যাপারের গোপনীয়তা দীর্ঘকাল রক্ষা করা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। ফলে চাল-পার্টির ভিন্ন ভিন্ন বয়সের মেয়ে-পুরুষের কাছে ব্যাপারটা বেশ মুখরোচক প্রসঙ্গের গুরুত্ব পেল। বিন্তি আর বিন্তির ছোকরাবাবুকে নিয়ে ওদের মধ্যে চালু হয়ে গেল বেশ প্রগল্‌ভ রসিকতা।

বিন্তিকে একদিন একান্তে পেয়ে ছানুমাসির সকৌতুক রসিকতা উচ্ছ্বসিত হ'ল—'তুই মর্‌ছোস লো ছুঁড়ী।' ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল বিন্তিও—'মরেছি, বেশ করেছি, তাতে তোমার কি?'

ছানুমাসির মুখে সঞ্চারিত হয়েছিল বক্রতা, বিষাক্ত স্বরের তীক্ষ্ণতায় বলেছিল—'অ, তাই বল্। তাইলে এবার শঙ্করারে বলি, তোর ছোকরাবাবুরে ধইরা একদিন সাতপাক ঘুরাইয়া দিউক। দেখ্‌বি, পিরিতের কেরদানি ছুইট্যা যাই বো।'

বিন্তি আর কথা বাড়ায়নি। কিম্বা বলা যেতে পারে, বাড়াতে সাহস পায়নি। শঙ্করার মুখাবয়বের রুক্ষ কাঠিন্য আর হিংস্র শীতল দৃষ্টি মনে ভাসতেই আপনা-আপনিই স্তব্ধ হয়ে এলো ওর কণ্ঠস্বর।

তাহলে বিন্তি কি ভয় পায় শঙ্করাকে? ভয়? না,—কিসের ভয়! ভয় কেন করতে যাবে শঙ্করাকে? সে তো শঙ্করার উপর নির্ভরশীল নয়। তার পেটের ভাত, পরনের কাপড়—কোনোটির জন্যই তো সে এখন আর শঙ্করার মুখাপেক্ষী নয়। সে তো স্বাবলম্বী। তার নিজস্ব স্বাধীন পরিশ্রমের মূল্যেই তো এখন সম্পন্ন হয় তার এবং তার পারিবারিক গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা। তবে?

তবু বিন্তির যাবতীয় স্বাধীন-চিত্ততা, ঔদ্ধত্য—সব যেন কেমন তেজহীন হয়ে পড়ে শঙ্করার কথা স্মরণে এলে। সেই অভাবী অসহায় দিনগুলোর স্মৃতি নির্মম চাবুকের মতো মনের দিগন্তে বড়ো নির্মমভাবে ঝলসে ওঠে। শঙ্করার উদার দাক্ষিণ্যটুকু না পেলে সেদিন বাপ-মেয়ের কপালে ছিল নিশ্চিত উপবাসী মৃত্যু। শঙ্করার সদা-সতর্ক প্রহরা না থাকলে মাংসলোভী হাজার শেয়াল-শকুনে খুবলে খেত ওর শরীরটাকে। এসব ভাবনার প্রবাহে শঙ্করার একটা নিঃশব্দ কিন্তু সাবলীল অভিভাবকত্ব যেন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে বিন্তিকে।

[illegible] বিন্তি আর ছোকরাবাবু অনিমেষকে নিয়ে কখনো প্রকাশ্য, কখনো অপ্রকাশ্য যে হাসি-মশ্‌করা চলে চাল-পার্টির মধ্যে, তার কিছুই যেন স্পর্শ করেনা শঙ্করাকে। বাদ বা প্রতিবাদ কোনো কিছুই সে করে না। একটা নিরুত্তাপ শীতলতায় সে নিস্পৃহ থাকে। ওর উপস্থিতিতে এসব আলোচনা-প্রসঙ্গের সূত্রপাতে সে কেমন গম্ভীর হয়ে যায়। বিন্তি আর অনিমেষকে কেন্দ্র ক'রে কোনো ফাজিল-ফক্কড় মেয়ে যদি শঙ্করার কাছে নালিশ জানাতে যায়, উলটে শঙ্করাই তাকে প্রশ্রয়হীন দাবড়ানি লাগায়। ত্রস্ত মেয়েটি ভয়ের ভাণ ক'রে পালিয়ে যায়। নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে সমবয়সীদের সঙ্গে পুনরায় মশ্‌গুল হয় উতরোল হাসি ঠাট্টার হুল্লোড়ে।

কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, এসব বৃত্তান্তের কোনো কিছুরই যেন স্থান নেই বিন্তির মনে। শুধু সকালের ঘটনাটা একটা বিশাল বিস্তার নিয়ে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে তার সমগ্র সত্তাকে।

খাল-পাড়ের জঙ্গল থেকে এক পাল শিয়ালের সোচ্চার ধ্বনিতে প্রহর ঘোষিত হ'ল। ঘুরঘুট্টি জমাট অন্ধকার-ভরা মাঝরাত্রি। 'সূচীভেদ্য অন্ধকার' অভিধাটি এ-রকম রাত্রি সম্পর্কেই বুঝি প্রযোজ্য। এই ঘন কালো অমনিশা বিন্তির চোখে শান্তির প্রলেপ এনে দিতে পারল না। দু'চোখের শিরা-তন্তুতে অনির্বাণ প্রদাহ—প্লাবিত অশ্রু-ধারায় সে চোখ যেন শ্রাবণ-সন্ধ্যা। অনিমেষের অপমানিত মুখের ছবিটা তার মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে বিশাল একটা আলোকবিন্দুর মতো।

অনিমেষের সঙ্গে সান্নিধ্যের সুযোগ কতটুকুই বা ঘটে! ভিড়ের ট্রেনে শুধু পাশাপাশি কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকা। সেই ক্ষণ-সান্নিধ্যই বিন্তির মনে জাগিয়ে তুলছিল এক অনুপম মধুর বিস্মরণ। চালের চোরা-চালানী বিন্তির মধ্যে সঞ্জীবিত হয়ে উঠছিল হারিয়ে-যাওয়া বিনতা ঘোষাল। স্কুল-কলেজের লেখাপড়া, ভদ্রজীবন, নিশ্চিন্ত স্বচ্ছন্দ গৃহ-সুখের বিভ্রম যেন এক মায়াবী মরীচিকা, এবং তা ধীরে ধীরে অলক্ষে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছিল বিন্তিকে। অকারণ। অর্থহীন। তবু সেই অর্থহীন স্বপ্নময়তায় বিন্তির মনটা প্রায়শঃই বুঁদ হয়ে উঠত অনিমেষের সান্নিধ্যে। বিন্তির এই সাম্প্রতিক পরিচয় যেন তার নিতান্তই এক তাৎক্ষণিক পরিচিতি, যে কোনো এক অলৌকিক মুহূর্তেই সে যেন আবার ভদ্রবাড়ীর মার্জিত-রুচির বিনতায় পরিণত হবে।

এরই মধ্যে ঘটল দিন কয়েক আগেকার ঐ প্রতারক ঘটনাটি। দিনটা ছুটির। বিকেলের দিক। বিশাল একটা চালের বস্তা নিয়ে বিন্তি যথারীতি স্টেশনে অপেক্ষমাণ। ট্রেনের প্রতীক্ষা। ছুটির দিনেও যাত্রী-সমাগম অপ্রতুল নয়। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ট্রেন আসছে লেট ক'রে। ভিড় বাঁচিয়ে প্লাটফর্মের এক কোণে বস্তাটা রেখে একান্তে দাঁড়িয়ে ছিল বিন্তি। হঠাৎ একটি লোলুপ কণ্ঠস্বর, যেন অভ্রান্ত এক লক্ষ্যভেদী তীরের ফলা, আঘাত করল ওর শ্রুতিকে —

—'এ্যাই অনিমেষ, তোর সেই মালটা না?'

পাশ থেকে ভিন্ন আর একটি কণ্ঠস্বর তার সঙ্গে সঙ্গতে বাজে —'যাই বলিস্ অনিমেষ, তোর টেস্ট আছে মাইরি! কি ফিগার দেখেছিস্!'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়ায় বিন্তি। অনিমেষ। সমবয়সী আরো দুটি ছেলে ওর পাশে। মন্তব্য দুটির উৎস ওরাই।

একটু পিছনে ছিল অনিমেষ। দ্রুত এগিয়ে আসে সামনে। বিব্রত, অপ্রস্তুত মুখমণ্ডলে বিরক্তির ছাপ। ধমক দেয়—'এ্যাই, চুপ কর্। কি হচ্ছে এসব? ভদ্রভাবে কথা বল্।'

সঙ্গীর কণ্ঠস্বর তাতে লজ্জা পায় না। বরং আরো প্রগল্ভ হয়—'কেনরে, অতো ভদ্রতা কিসের? তোর ফিঁয়াসে ব'লে? করে তো চালের ব্ল্যাক! তা, দে না একটু আলাপ করিয়ে।'

সঙ্গীর এই অপমানসূচক মন্তব্য, হ্যাংলামি অনিমেষকে ক্ষুব্ধ এবং মরিয়া করে। কণ্ঠে উত্তাপ প্রকাশ পায়—

'সব জেনেশুনেও ওভাবে কথা বলছিস কেন? জানিসই তো ওরা চালপার্টির মেয়ে। ওদের কত বড় গ্যাং জানিস্? দেবে একদিন ফাঁসিয়ে—'

বিন্তির চারপাশে যেন অন্তহীন শূন্যতা, আর তাতে আবর্তিত হয় সমগ্র পারিপার্শ্বিক। স্নায়ুকোষে যেন তীব্র তীক্ষ্ণ ঘণ্টাধ্বনির আর্তনাদ। ক্রোধ যে এত উচ্চকিত হয়, অপমানের জ্বালা যে এত মর্মদাহী হয়, এ অভিজ্ঞতা বিন্তির নতুন। বিন্তির সেই অবরুদ্ধ ক্রোধ একটা কঠিন জবাবে বিস্ফোরিত হতে চাইছিল। কিন্তু কোনো বাচনিক অভিব্যক্তি বিন্তির সেই রুদ্র ক্রোধকে প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। নির্বাক ওষ্ঠদুটো থরথর কাঁপে, অপমানের জ্বালায় নীলবর্ণ হয় তার চেতনা।

অসহনীয় সেই পরিস্থিতিতে হঠাৎই আবির্ভাব ঘটল ডাউন ট্রেনটির। ট্রেনটি তখন বিন্তির কাছে মুক্তিদূত। বুকের মধ্যেকার অসহ্য ধুকপুকানি আর কাঁকালের চালের বস্তা নিয়ে দ্রুত গাড়ীর বুকে আশ্রয় নিল সে। বস্তাটা নামিয়ে কিছুক্ষণ হাঁপায়। তারপর দমভর নিশ্বাস নেয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিতে অস্বাভাবিকতা।

সেই থেকে ভয়ঙ্কর এক চাপা ক্রোধ, এক বিধ্বংসী জ্বালা বিন্তির চেতনায় নিয়ত ফুঁসছিল। বিনতা ঘোষালের ভদ্র মার্জিত জীবনের যে ন্যূনতম সত্তাটুকু অবশিষ্ট ছিল তার মধ্যে, এই রূঢ় অভিঘাত তা নিশ্চিহ্নে মুছে দিতে কার্যকরী ভূমিকা নিল। তীব্র বিষভাণ্ডের অধিকারী এক উদ্যত নাগিনীর মতো অতঃপর তার মধ্যে জেগে থাকল বিন্তি। শুধুই বিন্তি—চালের চোরাচালানকারী উদ্ধত, এক এবং অদ্বিতীয় বিন্তি। ভদ্রজীবনের যাবতীয় সীমানা-সান্নিধ্য থেকে নিজেকে সে সরিয়ে আনতে চাইল সবলে।

এর পরে বেশ কয়েকদিন গড়িয়ে গেছে নির্বিবোধ। অনিমেষের সঙ্গে মুখোমুখি হবার অবকাশ আসেনি। আজই সকালে দেখা। এবং তারপর ঐ ঘটনা। গত কদিন ধ'রে নিয়ত সে তার ক্রোধকে পুঞ্জিত করেছে, তাকে ক্রমশঃ তীক্ষ্ণ এবং একমুখী করেছে। কঠিন একটা প্রতিশোধ নেবার জন্য তার সমগ্র অন্তর হিংস্র প্রতিজ্ঞায় ছিল আচ্ছন্ন। এবং আজ বড়ো নির্ভুল লক্ষ্যেই সে ইচ্ছাটা পূর্ণ করতে পেরেছে। যোগ্য প্রতিশোধই সে নিয়েছে। প্লাটফর্মের হাজার পাবলিকের মধ্যে অনিমেষের ভদ্রতার মুখোশটাকে টেনে ছিঁড়ে খুঁড়ে তাকে নামিয়ে দিয়েছে ধুলোয়। চূড়ান্ত অপমানের ভুষো কালি লেপটে দিতে পেরেছে তার সুন্দর মুখে। এর থেকে বড়ো প্রত্যাশা তো তার আর কিছু ছিল না। চাল-পার্টির বিদিত, চিহ্নিত মেয়ে সে। ভদ্দরলোকদের সঙ্গে তার তো কোনো সম্পর্ক নেই। থাকতেও পাবেনা।

বাসনা-পূরণের উত্তেজক এক হিংস্র আনন্দে বিন্তির দেহ-মন পরিপূরিত ছিল সমস্ত দুপুর, বিকেল। কিন্তু তারপরেই উত্তেজনাটা প্রশমিত হয়ে এলে, বায়ুশূন্য বেলুনের মতো, স্তিমিত হয়ে এসেছিল ওর মনের প্রতিস্পর্ধী চণ্ডাল রাগটা। এবং এই পরিবর্ত মানসিকতায় দিকচিহ্নহীন সর্বগ্রাসী শূন্যতা ওকে গ্রাস করেছিল। নিতল এক ভার নেমেছিল দেহে মনে।

দিনভর কাজের ক্ষেত্র থাকে ব্যাপ্ত, প্রসারিত। সেখানে শঙ্করার সঙ্গে বিন্তির নিয়মিত দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারটা অনিশ্চিত। কিন্তু সারা দিনের, এবং রাত্রির প্রায় অর্ধাংশের পরিশ্রমী সংগ্রামী কর্মকাণ্ডের অবসানে, শেষ ট্রেনে বিন্তি যখন বাড়ী ফেরে, তখন শঙ্করার সঙ্গটুকু প্রাত্যহিক রুটিনের অন্তর্ভুক্ত ব'লে বিবেচিত। এবং উভয়ের কাছেই এটা জরুরী। শঙ্করার এই সঙ্গ শুধু ট্রেনেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বিন্তিকে সে এগিয়ে দেয় বাড়ী পর্যন্ত। স্টেশন থেকে প্রায় মাইল দুয়েক দূরে ওদের বাড়ী। বাড়ী—অর্থাৎ, মাথা গোঁজার আশ্রয়। রিফিউজী কলোনী। কিছু মানুষের দলা-পাকানো সহাবস্থান। শঙ্করাও ওখানকারই বাসিন্দা। বিন্তিদের ঘর ছাড়িয়ে, আরো কিছু খানা-খন্দ পার হয়ে, শঙ্করার বাসের ঠাঁই।

শেষ ট্রেনে ওরা যখন বাড়ী ফেরে, তখন রাস্তাঘাট ফাঁকা, সুনসান। এক আধজন যাত্রী বা পথচারীর কদাচিৎ সাক্ষাৎ। চালপার্টির আরো দু'চারজন সঙ্গী থাকলেও ভিন্ন রাস্তায় গতি তাদের। ফলে যাত্রা-পথের শেষাংশটুকুতে বিন্তি আর শঙ্করার নির্ভেজাল একাকীত্ব। মেঠো রাস্তার দু'পাশ অসংস্কৃত, বুনো ঝোপ-ঝাড়ের অবাধ বিস্তার। নিশাচর শ্বাপদ, কিম্বা দ্বিপদ জন্তু বা কোনো সরীসৃপ—যে কোনোটিই বিপদের হেতু ঘটাতে পারে। সতর্ক প্রহরায় শঙ্করা রাস্তাটুকু পার করিয়ে আনে বিন্তিকে।

ফিরে আসার এই রাস্তাটুকু যেন দু'জনের কাছে এক মুক্ত আকাশ। কথায় গল্পে দু'জনে বড়ো জড়িয়ে যায়। সারাদিনের অভিজ্ঞতার কথা মেলে ধরে পরস্পরের কাছে। কেনা-বেচার ফন্দি-ফিকিরের বিবিধ আলোচনা, লাভ-লোকসানের হিসাব মেলানো, আগামী দিনের প্রস্তুতি-পরিকল্পনার পর্যালোচনা। ঠাট্টা-পরিহাসের সরস তারল্যও সেখানে কখনো কখনো অনায়াসেই স্থান ক'রে নেয়। কিন্তু নারী-পুরুষের প্রচলিত সম্পর্কটা কখনো মাথা চাড়া দেয় না। জীবন-যুদ্ধে পোড়-খাওয়া দু'টি সহযোদ্ধা বন্ধুর মতো ওরা হেঁটে যায়। হেঁটে যায় পাশাপাশি। পারস্পরিক নির্ভরতার, সমপ্রাণতার বৃত্তটি পেলব মমতায় ওদের সংবদ্ধ করে।

কিন্তু সব কিছুর মধ্যেও একটা জিনিস নজর এড়ায় না বিন্তির। হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব কিম্বা অন্যবিধ আলোচনা—সব কিছুতেই শঙ্করা উচ্ছল, প্রাণবন্ত। কিন্তু কখনো অনিমেষের কোনো প্রসঙ্গ উঠলেই গম্ভীর হয়ে যায় শঙ্করা। ওর চোয়াল আকস্মিকভাবে দৃঢ় এবং শারীরিক কাঠামোটা হয়ে ওঠে টান্ টান্। শুকিয়ে যায় ওর উচ্ছল কথা-বার্তার উৎস। সেই নীরবতা স্থায়ীও হয় বেশ কিছুক্ষণ। শঙ্করার সেই গুম্-মেরে-যাওয়া চেহারার দিকে তাকিয়ে যেন আকস্মিক এক অচেনা ভয়ের শিরশিরানি অনুভব করে বিন্তি। এর থেকে রেগে গিয়ে শঙ্করা যদি বা ঝগড়াও করে খানিক, সেও বুঝি স্বস্তির।

আজও দুজনে যথারীতি ফিরেছিল শেষ ট্রেনে। ট্রেন থেকে নেমে, স্টেশন-সংলগ্ন লোকালয়ের কাছে-পিঠে, গোনা-গুনতি যাত্রী ছিল কয়েকজন। কিছুক্ষণেই নিজস্ব বাসস্থান তাদের আশ্রয় দিল।

রাস্তায় তখন শুধু বিন্তি আর শঙ্করা। কিন্তু অন্য দিনেব উচ্ছলতা আজ অনুপস্থিত। দুজনেই নির্বাক। তারার আলোয়, যেন দুই অশরীরী, নিঃশব্দে হেঁটে চলে পাশাপাশি। এখন মধ্য-হেমন্ত। হিমের আমেজ বায়ুতে প্রবাহিত। দূরবর্তী কোনো গৃহস্থ-বাড়ীর কুকুরের ডাক ছাড়া চতুর্দিকে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা। অন্ধকারে আবৃত চরাচর।

দুজনার মনের অলিতে গলিতে তখন মাকড়সার জালের মতো সারা দিনের ঘটনার আঁকিবুঁকি। বিন্তির মনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল একটি ইচ্ছে, শঙ্করার কাছে সকালের ঘটনাটি মেলে ধরার এক বাসনা তার মনে। অনিমেষের সঙ্গীদের কাছে অপমানিত হবার সেই পূর্বতন ঘটনা, আর আজকে তার উপযুক্ত সমূহ প্রতিশোধ গ্রহণ—এ-কাহিনী শঙ্করার কাছে জানাতে এখন বড়ো আগ্রহ বিন্তির। সারাদিনের টান্ টান্ উত্তেজনাটুকু শঙ্করার কাছে জানিয়ে কিছু হালকা হওয়া। কিন্তু আজ প্রথম থেকেই শঙ্করা যেন ধরা-ছোঁয়াব বাইরে, বাক্‌হীন এক পাথর। বিন্তির ইতস্ততঃ দু'একটি কথা, উত্তরে শঙ্করার দায়সারা 'হুঁ' 'হাঁ' সংলাপ। শঙ্করার মনের তল পায়না বিন্তি।

শঙ্করার মনে তখন ভিন্ন এক ভাবনার দপ্-দপানি। বিকেলে তুমুল এক হাত হয়ে গেছে সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে। বিন্তির অসাক্ষাতে ওরা এসেছিল কয়েকজন। ছানুমাসি, মানদা এবং আরো কয়েকটি মেয়ে। রেললাইনের ওপারের কয়েকটি ছেলে, যারা দলে নবাগত, পিছনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। তৎপরতার প্রাবল্য ওদেরই যেন বেশী।

শঙ্করার মুখোমুখি হতেই ওদের একজনের কণ্ঠ সোচ্চার হ'ল—'এসব হচ্ছেটা কি? আমরা

চাল-পার্টি, কিন্তু আমাদেরও তো একটা নীতি-নিয়ম থাকা দরকার। পাব্‌লিকের সাথে আমাদের চলাফেরা করতে হয়। দলের কোনো মেয়ে রং-বাজি করলে পাব্‌লিকের কাছে আমরা মুখ দেখাব কি ক'রে?'

ছেলেটির কথার স্বল্প বিরতিতে, তড়বড় করে ওঠে ছানুমাসি—'তখনই কইছিলাম, ওসব নেকা-পড়া-জানা ভদ্দরলোকের মাইয়ারে দলে নিও না। এখন কথা ফলল তো! কাঙালের কথা বাসি না অইলে তো কামে লাগে না। ভদ্দরলোকের মাইয়া আইচে চাল-পার্টির দলে! এখন, এক ভদ্দরলোকের পোলায় যেই ইসার দিছে, অমনি নাইচা উঠ্‌ছে ধেই ধেই কইরা। ঝাড়ুমারি অমন ভদ্দর-তাইর মুখি—'

অনুত্তেজিত শান্ত গলায় বলেছিল শঙ্করা—'তা, তুমি কি করতে বলো ছানুমাসি?'

—'ক্যান্? ঝেঁটোয়ে বিদেয় কইরা দে না দল থিক্যা। ভদ্দরলোকের মাইয়ার চাল-পার্টি দলে আওনের শখ হয় কোন্ আহ্লাদে?' —ছানুমাসির কণ্ঠস্বর খ্যান্‌খ্যান্ করে বাজে।

মানদা ফোঁড়ন কাটে—'ঠিক কথা, ন্যায্য কথা কইছে ছানুমাসি।'

শঙ্করার কণ্ঠ ধারাবাহিক নিরুত্তাপ—'দ্যাখো ছানুমাসি, রেলগাড়ি কারো বাপের তালুক না। আর, ব্যবসাতেও কারো নাম লেখা নেই। যার যেমন খুশি, সে নিজের মতো কাজ করতে পারে।'

এবার ও-পাশের একটা ছেলে, বেয়াড়া ধরনের ঢ্যাঙা এবং মারকুটে, একটু সরে গিয়ে, কথা বলে তির্যক ব্যঙ্গে—

—'কত দরদ! তা অতই যদি দরদ, তো সামাল্ দিয়ে রাখলেই হয়। যখন ঢলানি মেরে বেড়ায়, তখন বুঝি চোখে পড়ে না?'

দ্রুত এগিয়ে গিয়েছিল শঙ্করা। বাঁ হাতের আগ্রাসী থাবার মুঠোয় চেপে ধরেছিল ছেলেটির লাট-খাওয়া জামার কলার দুটো। চাপা শাণিত এক ধাতব আওয়াজ বেজেছিল ওর কণ্ঠে—

—'দ্যাখ্ ফট্‌কে, আর একটা বাজে কথা বল্‌বি তো তোর সব কটা দাঁত প্ল্যাটফরমের উপর ফেলে দেব।'

আশপাশের দু'চারজন ট্রেনযাত্রী, নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বিনা-পয়সার সার্কাস দেখতে যাদের কৌতূহল সীমাহীন, এবং এতক্ষণ যারা ঝগড়াটা উপভোগ করছিল, মারামারি বাধার উপক্রমেই তাড়াতাড়ি সরে পড়ল ভয়ে ভয়ে। যাবার আগে মন্তব্য করল—'এরা সব চালপার্টির লোক বাবা—ভয়ানক ডেঞ্জারাস্।'

ফটিকের জামার কলার দুটো শ্বাসরোধকারী আকর্ষণে কিছুক্ষণ ধরে রাখল শঙ্করা। তারপর একটা ঝট্‌কা মেরে সরিয়ে দিল ওকে। ছেলে দুটি এখন স্পষ্টতঃই কোণঠাসা, সারা শরীরে তাদের রাগ, প্রতিহিংসার প্রবল ইচ্ছা, কিন্তু উপায়হীন, ফলে মাথা নিচু ক'রে সরে পড়ল নিঃশব্দে।

সেই থেকে শঙ্করার মনের মধ্যে ভার, নির্বাত গুমোট। চালের বস্তা নিয়ে বেশ কয়েকটা ট্রিপ্ দিয়েছে সন্ধ্যেয়। কিন্তু ওর মুখে কেউ কোনো কথা শোনেনি। লাষ্ট ট্রেনে ফিরে, প্রাত্যহিক রুটিনের নিয়মে স্টেশনে বিস্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ, এবং তারপর যথারীতি ওকে নিয়ে বাড়ি-মুখো যাত্রা। কিন্তু সে গুমোট এখনো অব্যাহত। ফলে শঙ্করা বাক্যহীন। বাক্যহীন এবং এক গম্ভীর বিষাদে আচ্ছন্ন।

অবশেষে যাত্রাপথের সমাপ্তি। পথের ইতি ঘটল বিস্তিদের বাড়ীর কাছে এসে। এরপরেই বাঁদিকে একটা সঙ্কীর্ণ সুঁড়ি পথ। শঙ্করাকে ঐ ছোট পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে আরো কিছুটা। সেখানে ওর নিজস্ব ডেরা।

অন্যদিন এখানে, বিস্তিদের ঘরের পার্শ্ববর্তী এই পরিত্যক্ত ভূমিখণ্ডটুকুতে, মুখোমুখি এসে

দাঁড়ায় দুজনে। শঙ্করার দিকে তাকিয়ে হাসে বিস্তি। শঙ্করার হাসি বিস্তির সে হাসির জবাব দেয়। অন্ধকারের মধ্যেও সে আলোকিত হাসি বড়ো উজ্জ্বল শোভা পায়। দুজনের সে হাসির মধ্যে সারাদিনের জীবন-সংগ্রামের সাথীর প্রতি থাকে গভীর মমতা, উচ্চারিত হয় আগামী সংগ্রামী দিনটির জন্য পরস্পরের প্রতি আনুগত্য আর শুভেচ্ছা। বিদায়-ক্ষণের সেই ক্ষেত্রটিতে আজও এসে পাশাপাশি দাঁড়ায় দুজনে। শঙ্করার থমকানো গম্ভীর কালবৈশাখী মুখ, নিষ্প্রভ করে রাখে বিস্তিকে। অনুচ্চারিত থাকে বিদায়ের হাসিটুকু। শঙ্করার মুখের হাসিটুকুও চকিত বিদ্যুতের মতো শেষ মুহূর্তেও কোনো দীপ্তি পেল না। শুধু সেই নিরেট অন্ধকারে, এক অপরিচিতা নারীর মুখ-সন্দর্শনের নিরাসক্তি নিয়ে, বিস্তির মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল শঙ্করা।

সময় অতিক্রান্ত হয়। বুঝি এক যুগ। অতঃপর, যেন শঙ্করা নয়, অন্য কার কণ্ঠস্বর, ভেসে আসে দূরান্তর থেকে—'তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল বিস্তি।'

শঙ্করার মুখের দিকে তাকায় বিস্তি। কি বলতে চায় শঙ্করা? শঙ্করার মুখের দিকে তাকিয়ে, নিঃশব্দে অপলকে প্রতীক্ষা করে বিস্তি। প্রতীক্ষা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। কিন্তু শঙ্করার মুখে অপেক্ষিত কথাটি উচ্চারিত হতে শোনা যায় না। বাক্‌হীন দাঁড়িয়ে থাকে সে।

এগিয়ে আসে বিস্তি। একখানি হাত বাড়িয়ে দেয়। এবং প্রসারিত হাতখানা রাখে শঙ্করার কাঁধের উপর। ম্লান হাসিতে মায়া বিছিয়ে বলে—'কি কথা তোমার, বললে না?'

কাঁধের উপর থেকে বিস্তির হাতখানা, যেন কী এক মহামূল্য সম্পদ, সন্তর্পণে নামিয়ে আনে শঙ্করা। মুঠোর আশ্রয়ে জড়িয়ে রাখে কিছুক্ষণ। তারপর হাতটা ছেড়ে দিয়ে উদাসীন শূন্যতায় উচ্চারণ করে—'কিছু না, তুমি বাড়ী যাও বিস্তি।'

তারপর ঝাটতি এক ব্যস্ততায়, দ্রুত বাঁ দিকের রাস্তাটায় বাঁক নিয়েছিল শঙ্করা। হেমন্তের ধোঁয়াটে কুয়াশা চারিদিকে। চাপ চাপ, রহস্যময়। দূরবর্তী আকাশের ম্লান তারাগুলো কুয়াশার আড়ালে ক্রমশঃ আবিল। প্রভাহীন। সেই সমারূঢ় কুয়াশার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে, অন্ধকার রাস্তায় শঙ্করা ক্রমশঃ দূরবর্তী হয়।

রাত এখন কটা? কে জানে। সম্ভবত ভোর আসন্ন। ভাবনাগুলির সঙ্গে পরিণামহীন এক সংগ্রামে বিস্তির স্নায়ুমণ্ডলী, চেতনা এখন অবসন্ন। সেই বিবশ আচ্ছন্নতার মধ্যে কখনো অনিমেষ, কখনো শঙ্করার মুখাবয়ব চিত্রের মতো দোলে। তারপর, কখন যেন ঘুম নামে বিস্তির দু'চোখে।

।। তিন ।।

প্রায় মাইল পাঁচেক পরিসর নিয়ে অঞ্চলটির বিস্তৃতি। পূর্বদিকে সীমানা-চিহ্ন হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে যে সুদীর্ঘ পাকা সড়কটিকে, দেশবিভাগের আগে থেকেই তা কীর্তিমান, অখণ্ড বাংলার পূব-পশ্চিমের যোগ-সূত্র হিসেবে যার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। দেশ-বিভাগের পর অভ্যন্তরীণ পরিবহণের ক্ষেত্রে সড়কটির গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। অঞ্চলটির পশ্চিম প্রান্তে একটি খাল, গ্রীষ্মে সাধারণতঃ হাজামজা, বর্ষায় প্রাণবন্ত। গতিশীল। উত্তরে দক্ষিণে পূবে পশ্চিমে—জনবসতি ক্রম-বর্ধমান। উদ্বাস্তু-অধ্যুষিত একটি বিশাল এলাকা।

দেশ-বিভাগের পরে, ১৯৫০ সালটিকে এই উদ্বাস্তু উপনিবেশটির সূচনা-পর্ব হিসেবে নির্দিষ্ট করা গেলেও, এর সম্প্রসারণের কাল-পর্বটিকে নিশ্চিতই কোথাও সীমাবদ্ধ করার প্রচেষ্টা অর্থহীন।

পাঁচ ও ছয়ের দশকের প্রথমপর্বের উদ্বাস্তু আগমনের সেই ভয়াবহ অব্যাহত ধারা, দুকূল-

প্লাবী বন্যা-ধারার মতো যা প্লাবিত করেছিল পশ্চিম বাংলাকে, এখন কিছুটা স্তিমিত। প্রশমিত। কিন্তু সে গতিধারা সম্পূর্ণতঃ রুদ্ধ, ইতিহাস সে কথা বলেনা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি, রাষ্ট্রনৈতিক দুর্বিপাক, যে কোনো অছিলায় পূর্ব-বাংলার জন-জীবনে বিপর্যয়,—এবং তার নিশ্চিত পরিণাম—স্বদেশ স্বভূমি থেকে আরো কিছু হিন্দুর বাধ্যতামূলকভাবে পশ্চিম-বাংলায় আগমন।

সাতের দশকের সূচনা-লগ্নে পূর্ব-বাংলায় অভূতপূর্ব জন-জাগরণ, পাক সামরিক বাহিনীর অত্যাচার, মুক্তিবাহিনী গঠন, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পর্যুদস্ত বাঙালীর ভারতে চলে আসা,—এবং এ-সবের ফলে পশ্চিম বাংলার সামগ্রিক জীবন-ধারায় ভিন্নমুখী আর একটি চাপ। তারপর পূর্ব-পাকিস্তানের গোর-ভূমিতে নতুন এক সম্ভাবনা, —'বাংলাদেশ' যার নাম, সূচিত হয়েছিল। পূব-বাংলা থেকে আগত সাময়িক জন-সংখ্যার ভার, সেই নাবালক শিশু-রাষ্ট্রটি পশ্চিম-বাংলার বুক থেকে যথেষ্ট দক্ষতায় সরিয়ে নিতে পেরেছিল।

কিন্তু এবারও কিছু হিন্দুপরিবার, পূব-বাংলার জীবন-ধারার সন্ত্রাস, অনিশ্চয়তার মোকাবিলায় পর্যুদস্ত, বাধ্যতামূলক শিকড় গাড়লো এদেশের মাটিতে। ফলে পশ্চিম-বাংলার জন-জীবনে তৈরী হল আরো কিছু আরো কিছু চাপ। এ অঞ্চলটার ইতিহাসও এই বৃহত্তর ইতিহাসের সঙ্গে অন্বিত। বিশেষতঃ এটি একটি সীমান্তবর্তী এলাকা। পূব-বাংলার সীমান্ত জেলাগুলি থেকে আগমন প্রত্যাগমন অতীব সহজসাধ্য। পাকা সড়ক এবং রেলপথ—দুটিই যোগাযোগের সহজতম মাধ্যম। সুতরাং এলাকাটি পাঁচ থেকে এই সাতের দশকে এসেও গৃহহীনদের পুনর্বাসনের একটি উত্তম ক্ষেত্র বলে বিবেচিত, সুতরাং সম্প্রসারণ অনিবার্য।

পাঁচের দশকের সূচনা-পর্বে অঞ্চলটির যে চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল, এখনকার এই ব্যাপক, বিস্তৃত, জন-সংঘট্টে কোলাহলিত পারিপার্শ্বিক থেকে তার শনাক্তকরণ নিশ্চিত দুরূহ। প্রাচীনতার স্মৃতি যাদের বলবান, কৌতূহলে তারা তা স্মরণ করতে পারেন মাত্র। কিন্তু নতুন প্রজন্ম, যারা চোখ-ফোটা থেকেই এই পারিপার্শ্বিকতায় লালিত, অঞ্চলটির আদিরূপ তাদের কাছে অকল্পনীয়।

এই গিজগিজে ভিড়, প্যাঁচপেঁচে মনুষ্য-বসতি, কোথায় ছিল তখন! 'জনশূন্য' কথাটিতে হয়ত অত্যুক্তি বর্তাবে, কিন্তু 'জনবিরল' শব্দটি তার সামগ্রিক অর্থেই তখনকার পরিপার্শ্ব সম্পর্কে সুপ্রযুক্ত।

জঙ্গলে ঢাকা যেন এক আদিম বনভূমি। শেয়াল, শূয়োর, সাপ—শ্বাপদ এবং সরীসৃপ —কোনোটিই দুর্লভ নয়। স্যাঁতসেঁতে জলাভূমিতে পক্ষী-শাবকের আকৃতি-যুক্ত মশক-বাহিনী। পূব-সীমানার যশোহর রোড নামক ঐতিহাসিক দীর্ঘ সড়কটি তখনও ছিল। অঞ্চলটির বুক চিরে পূব থেকে পশ্চিমমুখী যে অন্য সড়কটি, বিচিত্র পণ্য-দ্রব্যের পসরায় এখন যা সজ্জিত, সেটিও তখনও ছিল। কলকাতা থেকে যে রেললাইনটি সীমানা অতিক্রম ক'রে বর্তমান 'বাংলাদেশের' অভিমুখী, তারও অস্তিত্ব ছিল তখন। ১৮৮২ সাল থেকেই রেলওয়ে স্টেশনটি সক্রিয় ছিল। কিন্তু জনচিহ্ন ছিল নামমাত্র। বড়ো দুই পাকা সড়কের সংযোগস্থল, লোকমুখে যা 'চৌমাথা' নামে খ্যাত, একটি মাত্র দোকান ছিল সেখানে। সপ্তাহে দু'দিন অবশ্য হাট বসত তখনও ওখানে, এখনকারই মতো। গ্রামীন হাট। আর রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় ছিল নিঃসঙ্গ একটি চায়ের দোকান। সকালের দিকে জন-কয়েক গোয়ালা আসতেন, কাঁধে দুধের বাঁক। ট্রেনযোগ কলকাতায় যাওয়া, দুধ বিক্রি। আর ছিলেন অঙ্গুলিমেয় জনা কয়েক অফিস-যাত্রী, দূরবর্তী আদি গ্রামগুলি থেকে যাঁরা আসতেন এবং ট্রেনের নিয়মিত যাত্রী হিসেবে কলকাতায় অফিস করতেন। সারাদিন এই কটি চেনামুখ। কটি চেনামুখের যাওয়া এবং আসা। অন্য মানুষ দুর্লভ।

দেশভাগের অব্যবহিত পরে, প্রধানতঃ ১৯৫০ থেকেই জন-সমাগমে ঢল নামল। দেশভাগ না হলেও, জন-স্ফীতির সাধারণ নিয়মেই, হয়ত এ-স্থানেও ভবিষ্যতে জনবসতি গড়ে উঠত। দেশভাগ সেই সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করল, দিল ব্যাপকতা। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সে এক মহাযজ্ঞ। সরকারী, বেসরকারী—নানা প্রচেষ্টা। আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী কেউ ক্রীত জমিতে সমৃদ্ধ বাসভূমি নির্মাণ করল। আবার কেউ জঙ্গল কেটে, দখলীকৃত জমিতে নির্মাণ করল বাঁশ খড়ের ভঙ্গুর আস্তানা।

ক্রমেই শুধু মানুষ আর মানুষ। জমির ঊর্ধ্বমূল্য ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রণহীন। 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'—বিষয়-বিরাগী ঠাকুর রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সাধন-মার্গের শ্রুতকীর্তি অভিব্যক্তি। অভিব্যক্তিটি ভিন্ন অর্থে অর্থবান হ'ল। একটু মাটি, ব্যাপক অর্থে কিছু জমি, কিনতে পারলেই বৃদ্ধির বৃদ্ধি, চক্রবৃদ্ধিতে সে টাকা কয়েকগুণ।

পাঁচ ছয় আর সাতের দশকের ভিন্ন ভিন্ন কলোনী অঞ্চলের এটি একটি সাধারণ চিত্র, এবং এর যাবতীয় লক্ষণাদি এ-অঞ্চলটিতেও সার্বিকভাবে প্রকটিত। জন-সমাগমের আধিক্য, জন-জীবনের জটিলতা, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, ব্যবসা কিম্বা চাকরী-সূত্রে এক শ্রেণীর বাসিন্দার উত্তরোত্তর রমরমা, এবং পাশাপাশি বহুলাংশের জীবিকার্জনের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম, সমগ্র অঞ্চলটিতে একটি মিশ্র এবং জটিল আর্থ-সামাজিক আবহ নির্মাণ করল। শহর তো নয়ই, শহরতলী অভিধাটিও গৌরবে প্রযোজ্য। কলোনী অঞ্চলটি তার এবংবিধ জটিলতায় একটি সংবেদনশীল জনপদে পরিণত হ'ল। গ্রামীণ সারল্য নেই, নেই নাগরিক আভিজাত্যও। কিঞ্চিৎ সংস্কৃতি-মনস্কতা, প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চা, স্পর্শকাতর দলীয় রাজনৈতিক চেতনা, ফেলে আসা দেশভূমির নানাবিধ শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতিকে বুকের মধ্যে লালন-জনিত দীর্ঘশ্বাস—আর এর সঙ্গে নিয়ত অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম, —সার্বিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ও চেতনার এক বিমিশ্র সহাবস্থান।

অন্য দৃষ্টিতে, এই উদ্বাস্তু উপনিবেশগুলি ভিন্ন এক অর্থের দ্যোতক। সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকেই মানুষ জেদী, আপসহীন। প্রাকৃতিক বিরুদ্ধতা, বৃহদায়তন প্রাণি-কুলের সঙ্গে অসম সংগ্রাম এবং নানাবিধ প্রতিকূলতা সেদিন ছিল নিত্য-সহচর। কিন্তু জয় অনায়ত্ত থাকেনি। সংঘবদ্ধতা, বুদ্ধি, মেধা আর জয়ের জন্য অবিচল অনলস প্রচেষ্টাই তাকে সিদ্ধকাম করেছিল। পিতৃপুরুষের বাস্তুভূমি থেকে রাজনৈতিক হঠকারিতায় উৎখাত হওয়া এই মানুষগুলির মধ্যেও বুঝি জন্ম নিয়েছিল এক ধরনের প্রবল জীবনাকাঙ্ক্ষা, অস্তিত্ব-রক্ষার বেমক্কা জিদ, যা সার্বিক ধ্বংস আর অবক্ষয়ের মধ্যেও তাদের সঞ্জীবিত রেখেছিল। তা না হ'লে এই নিঃস্ব উদ্বাস্তু মানুষগুলির তাড়িত পর্যুদস্ত জীবনে, অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে আর কোন্ অস্ত্রই বা তাদের আয়ত্তে ছিল?

রেলওয়ে স্টেশন-সংলগ্ন একটি বাজার-ভূমি। মোটামুটি সমৃদ্ধ সাম্প্রতিক বৃহদায়তন এই উদ্বাস্তু অঞ্চলটির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। রেল-স্টেশনটি এ-সেকশনের ব্যস্ততম স্টেশনগুলির অন্যতম। পরিবহণের ক্ষেত্রে বাস, রিক্সা ইত্যাদিও অপ্রতুল নয়। ফলে, বাজারটি সর্বদাই সরগরম।

এপাশে সারিবদ্ধ আনাজ-পাতির দোকান। মাঝখানে একটি লম্বা ফালিতে মাছ আর মাংসের দোকান। দিনের সূত্রপাতে এটি বাজারের ব্যস্ততম এলাকা। অফিস-বাবুদের প্রাতঃকালীন মিলনস্থল। চোখে-মুখে চলনে-বলনে অসম্ভব ব্যস্ততা, হাতে মালিকের মতোই টাল-খাওয়া বহু-ব্যবহারে জীর্ণ দেড়টি ব্যাগ। একটি আনাজ-পাতির আর অন্যটি মাছের। দিনের সূত্রপাতেই শুরু হয়ে যায় প্রাত্যহিক কেনা-বেচা, লাভ-লোকসানের কোরাস। ক্রেতা বনাম বিক্রেতার বিচিত্র সংলাপ।—

—'কি হে বাপু, পাল্লাটা সোজা ক'রে ধরো। এ কি সোনারূপোর ওজন হচ্ছে নাকি? আর কত ঠকাবে বলো দেখি?'

—'আপনি তো বাবু জীবন-ভর খালি ঠকেই গেলেন; জিতলেন আর কবে?'

—'এ্যাঁ, ছোটো মুখে বড়ো কথা! আমাদের মতো চাকরী তো আর করতে হয় না। ব্যাওসা করছো, আর আমাদের রক্ত শুষে দিন দিন ফুলে-ফেঁপে উঠছো। তাই দিনে দিনে তোমাদের এতো তেল বাড়ছে। নাও, এখন দয়া ক'রে হাতটা একটু তাড়াতাড়ি চালাও।'

—'তা, দেন্‌না বাবু আমাকেও একটা চাকরী জুটিয়ে। এই ছাতার রক্ত-শোষা ব্যাওসা ছেড়ে আপনার মতোন ভদ্দরলোক সেজে অফিস করি।'

ক্রেতা অফিস-বাবু এবার রণে ভঙ্গ দেন। মূর্খ দোকানীর এ-জাতীয় স্পর্ধা-সূচক বাক্যের উত্তর দেওয়া অবান্তর মনে করেন। থলিতে সওদা চাপিয়ে ধাবিত হ'ন অন্য দোকানের দিকে।

মাসের শেষ। মানিব্যাগে টান ধরেছে। তবু খাবার পাতে একটু আঁশ্‌টে গন্ধের প্রত্যাশা। মাছ কেনার পয়সা অকুলান। বিকল্পে যদি ডিমের সংস্থান হয়। ঝুড়ি থেকে পায়রার ডিমের সাইজেব একটি মুরগীর ডিম তুলে নিয়ে হাই পাওয়ারের চশমার কাঁচের কাছে নিয়ে ডিমের পরিধি মাপেন ক্রেতা। অতঃপর ক্রেতা-বিক্রেতার সংলাপ—

—'কি হে, তোমার ডিম কত ক'রে?'

—'কি যে কয়েন বাবু! ওডা আমাব ডিম অইব ক্যান্? ওডা তো মুবগীর ডিম।'

'—হ্যা, হ্যা—সে তো বুঝতেই পারছি। আরে, মুরগীব ডিম এ্যাতো ছোটো হয নাকি?'

ত্বরিতে ডিমের দোকানী জবাব দেয়—'আপনিই স্যান্ কন্ ছোডো, যে পাড়াইতেছে, হেই বোঝ্‌ছে ছোডো না বড়ো।'

ক্রেতা-বিক্রেতার এইসব আনুষঙ্গিক সংলাপচারিতায় বাজারের পরিবেশ নিত্যদিন মুখব হয়। কেনা-বেচার পারস্পরিক একটা যোগসূত্রও গড়ে ওঠে। বিশাল এলাকাটির মানুষ-জনেব দৈনন্দিন দেখা-সাক্ষাতের পক্ষেও বাজার-ক্ষেত্রটি গুরুত্বপূর্ণ। এক চক্করে বাজার সেরে, রান্নাঘরের দরজায় বাজারের থলি নামিয়ে দিয়ে কোনোমতে কাক-স্নান সেরে নাকে-মুখে দুটো গুঁজে অফিসে ছোটার ব্যস্ততা সবার মধ্যে। তবু কেনা-কাটার ফাঁকে পরিচিত মুখ দেখলে —'কি কেমন আছেন'—গোছের কুশল-বার্তার হাসি, কিঞ্চিৎ বা রসালাপ, কখনো কিছু পরচর্চা—এসব নিয়ে এই উদ্বাস্তু উপনিবেশের এই বাজারটি একটি কেন্দ্রীয় স্থান বলেই বিবেচ্য।

বাজারের ওপাশটায় মুদি দোকানের সারি। তেল, নুন, ডাল, মশলাপাতির যোগানদার। তারপরেই সারি সারি চালের দোকান। সব মিলিয়ে বেশ বড়ো চালের আড়ত। স্থানীয় বাসিন্দাদের কেনাকাটা তো আছেই, কলকাতায় যারা প্রতিদিন চালের চোরাচালানে নিযুক্ত, তাদের অবাধ লেনদেনে এই চালের আড়তটি সমধিক ব্যবসায়িক গুরুত্ব অর্জন করে। এই অঞ্চলটির পর থেকেই বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকার শুরু—অর্থাৎ খোলা বাজারে চালের ক্রয়-বিক্রয় আইনত নিষিদ্ধ। ফলে এখানকার এই বাজারটিই ওদের পক্ষে অবাধে চাল কেনার মুক্তাঞ্চল। দরদাম মিটিয়ে, চালের বস্তা কাঁখে মাথায় চাপিয়ে বাজার-সংলগ্ন রেল স্টেশনটিতে উপস্থিত হওয়ার অপেক্ষা। তারপরেই ধাবমান রেলগাড়ী ওদের পৌঁছে দেবে মহানগরীতে।

সারি সারি চালের দোকানগুলির প্রান্তবর্তী ঘরটি নিবারণ দাসের। অন্য দোকানগুলির সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে এটিই বৃহত্তম। খুচরো এবং পাইকারী—দু'রকম পদ্ধতিতেই এখানে বিক্রির কাজ চলে। সামান্য ব্যবধানে নিবারণের আর একটি দোকান। সেটা মুদিখানা। দুটো দোকানই নিবারণের প্রখর খবরদারিতে পরিচালিত হয়। তবে মুদি দোকানটায় সাধারণত বসে নিবারণের

এক ভাগ্নে। দু' দোকানেই কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্মচারী পরিশ্রমসাধ্য কাজগুলি—যথা, মালপত্র মাপজোক, খদ্দেরকে সওদা সরবরাহ করা ইত্যাদি, সম্পন্ন করে। ক্যাশ সামলায় নিবারণ আর ওর ভাগ্নে। নিবারণের ঘরে তিনটি পিঠেপিঠি কন্যা, পুত্র পলাশ বাপের ধারা পায়নি, এবং ব্যবসাসূত্রে যথেষ্ট অর্থাগম—এসব পরস্পরবিরোধী পরিস্থিতি নিবারণের চরিত্রে একটি স্থিতধী গাম্ভীর্য আরোপ করেছে। গলায় বৈষ্ণব-সুলভ কণ্ঠীর মালা, প্রৌঢ় কৃষ্ণবর্ণ শরীরে অর্থ-সমৃদ্ধির এক ধরনের চেক্‌নাই, স্বল্প-শিক্ষা কিন্তু বিচক্ষণতা, তার চরিত্রে একটা স্বাতন্ত্র্য এনেছে।

দিনের শুরুতেই যথারীতি বাজার-অঞ্চলটিতে ব্যস্ততার ঢল নেমেছে। আনাজপাতির বাজারের দিকটাতেই এখন জন-সমাগম অধিক। মুদিখানা বা চালের দোকানে ক্রেতার ভিড় হালকা। সারি সারি চালপট্টির সরু গলিতে খুচরো ক্রেতার পাশে ওরাও এসেছে। দোকানীর সঙ্গে দর-দস্তুর, তারপর বস্তায় চাল তুলে পাওনা মিটিয়ে নিকটবর্তী স্টেশনে দ্রুতগতি প্রস্থান।

অনুভা মালতী এবং সমবয়সী আরো কয়েকটা মেয়ে। ভোরের ট্রেনে ইতিমধ্যেই ওদের চাল নিয়ে কলকাতায় এক খেপ ঘুরে আসার পালা সাঙ্গ। এখন দ্বিতীয় খেপের প্রস্তুতি। সব দোকানেই কমবেশী কেনাকাটার ভিড়। তবে ওরা নিবারণের দোকানটাকেই অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করে। নিবারণের চেহারা, বয়সোচিত গাম্ভীর্য, দোকানের কর্মচারীদের মাপজোকের ত্বরিৎগতি এবং দক্ষতা ওদের মনে এরকম একটি ধারণার জন্ম দিয়েছে, দোকানটি সৎ, দাড়িপাল্লার সূক্ষ্ম কারসাজিতে তাদের লোকসান অন্ততঃ ঘটাবে না। ফলে দোকানের মাপজোকের জায়গাটিতে সুর্বদাই একটি জনতা অপেক্ষমান থাকে। অনুভা মালতীর দলটাও ওর অঙ্গীভূত হয়ে চাল মাপাচ্ছিল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে হাসি-তামাসা, পরস্পরের খোঁজ-খবর নেওয়ার রোজ-নামচা। হঠাৎ ছানুবালা—বয়স্কতার সুবাদে সকলের 'ছানুমাসি,'— হাজির হয়।

—'কোথায় আছিলা গো ছানুমাসি এতক্ষণ। তোমারে না দেইখা আমারি ব্যাবাক কয়জনা এতক্ষণ হাক্‌রাইয়া পাক্‌রাইয়া মরত্যাছি। আও মাসি আও—আইয়া পড়ো আমাগো লগে।'

তরুণী অনুভা বয়সোচিত চাপল্যে হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে। ছানুবালার কথায় বরিশালের আঞ্চলিক ভাষার টান। সুযোগ পেলেই কমবয়সী মেয়েগুলো ওর বাকভঙ্গিকে নকল করে এবং ছানুকে রাগায়।

অনুভার হাসিতে সক্রিয় অংশ নেয় লতা এবং চোখ মুখ পাকিয়ে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলে—

—'অমন কথা কইও না গো কইও না। চেইত্যা গেলে মাসির আমার গোঁফ গজাইয়া মাউসা অইব। তখন ঠ্যালা বুইঝোনি।'

আর এক প্রস্থ হাসি, বাসন-ভাঙা লয়ে ধ্বনিত হয়।

তবে কথা যথার্থ। ছানুবালার আচমকা রাগ বড়ই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। ক্রোধের তেজ সাধারণতঃ তাকে অন্ধ করে এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি কটুকাটব্যে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাতে নগ্ন প্রাকৃত শব্দের ব্যবহারের বড়ই প্রাবল্য ঘটে। এবং এসব সুযোগের সদ্ব্যবহাব করতে ছানুবালা বিন্দুমাত্র ইতস্তত করে না। ফলে ছানুকে সহজে কেউ ঘাঁটায় না।

কিন্তু আজ, বড়ই বিপরীত, অনুভা লতার এ-জাতীয় উগ্র উত্তেজক বাক্যাবলীতেও ছানুবালার স্বাভাবিক স্বমূর্তি প্রকাশ পায় না। বগলের তলা থেকে গোটানো বস্তা দুটোকে মাটিতে রেখে, কেমন এক ধ্বস্ত, ভাঙাচোরা চেহারা নিয়ে তার উপরে বসে থাকে।

বাধা পড়ে ওদের হাসির তরঙ্গে। পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। পরিস্থিতি অনুধাবন করতে বেগ পায়। চোখের তারায় প্রশ্ন জাগে। ব্যাপারটা কি হ'ল?

অনুভা এগিয়ে আসে। হাত রাখে ছানুবালার কাঁধে। বলে—'হ'ল কি তোমার ছানুমাসি? অমন ক'রে বসে পড়লে যে?'

ছানুবালার কণ্ঠে আর্ত বিষণ্ণতা-'আমার দুক্কির কথা আর জিগাস্ ক্যান? কাল তো আদ্দেক রাতে বাড়ী গেছি। গিয়া দেখি, নাতিডার ধুম জ্বর। সকালেও জ্বর আসান্ হয়নি। অর মার কোলে ন্যাতাইয়া পইড়্যা রইছে। আর থাইক্যা থাইক্যা জ্বরের ঘোরে চিক্কুর পাড়্তাছে। কি যে করুম! আমার আইতে তাই দেরি অইয়া গেল।'

ওদের সেই উচ্ছল হাসির বদলে এবার চোখে নামে বিষণ্ণতার ঘোর।

ছানুবালা দুই হাতে কপালের ভার ন্যস্ত রেখে বলে—'আমার পোড়াকপালের কথা আর কারে কমু! মুই তো তোগো লগে চালের বেলাক করি। আর আমার লখাইডা বছর খানেক ধইরা রাজমেস্তোরির জোগালের কাম করতে আছিল। এক রকম কইর্যা চইল্যা যাতিছিল। তা হাভাতের পোড়া কপালে সুখের নেকন কয়দিন থাকবে ক'। আজ দুইমাস ধইরা লখাই বাপ আমার বিছেন-ধরা। ইঁট বইতে গিয়া দোতলার বাঁশের ভারা থিক্যা নিচে পইড়া যায়। বুকে চোট পাইচে। যাদব ডাক্তার কইচে, বুকে নি জল জম্ছে। এস্-রে করন্ লাগবে। আর নাকি ভাল-মন্দ খাওয়াতে অইব।'

মালতী বলে—'সে তো করতেই হবে মাসি। রোগ-ব্যাধি শরীরে ঢুকলে তার চিকিচ্ছে তো করানো লাগ্বেই। রোগে তো আর ছেড়ে কথা কয় না।'

—'মোরে আর বোঝাস্ না মালতী! বেবাকই আমি বুঝি। কিন্তু বুইঝা আউগাই কতটুক্ ক'দিনি। লখাই দুইমাস ঘরে বসা। পয়সাকড়ি যা আছিল, সব শ্যাষ। বাজারে দেনা অইচে। লখাইয়ের বউ দিন সাতেক অইল, তিন বাড়ীতে বাসন-মাজার ঠিকা কামের জোগাড় লইচে। এদিকে তো কোলের পোলাডা জ্বর বাধাইয়া রইল। জ্ব'রো পোলা রাইখা কেম্নে যে বউ কামে যাইবে! ভাইবা ভাইবা চক্ষে আন্ধার ঠেকিরে মালতী!'—

রাগ এবং দুঃখের যৌথ প্রতিক্রিয়া ছানুর কণ্ঠে বাজে। তা প্রতিধ্বনিত হয় আর সকলের মনে। সহানুভূতির নিঃশব্দ তরঙ্গ ওঠে আর নামে।

গোটা পরিস্থিতিটায় তখনই ঢিল ছোঁড়ে লতা—'সবাই তো বেশ হুতাশ নিয়েই বসে থাকলে। কয়টা বাজে সে খেয়াল আছে? 'লোকাল' তো ছাড়ল না ছাড়ল।'

সঙ্গে সঙ্গে ত্রস্ততা, হুড়োহুড়ি। অকারণে নষ্ট হওয়া সময়টুকুর জন্য যেন এক পরিতাপ ওদের আরো ব্যস্ত করে।

—'অ মাসি, কাঁ'দো পরে। আগে চাল নিয়ে 'লোকাল' ধরবা চলো।'

বলতে বলতে ছানুবালার বস্তাদুটো টেনে নেয় অনুভা। নিজের বস্তার সঙ্গে সমান তৎপরতা আর দরদে ছানুবালার বস্তার মুখও প্রসারিত ক'রে ধরে দোকানের চালমাপা লোকটির সামনে। চালের পরিমাণ জানায়।

নিজস্ব ব্যস্ততার মধ্যেও মালতী একবার দৃষ্টি ঘোরায় চারপাশে। প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় বলে—'হ্যারে অনুভা, বিস্তিরে দেখি না যে। গেল কই? নাকি, কাজে আসবে না আজ?'

অনুভার হাতের কাজ থামে না, কিন্তু বিস্তির জন্য উদ্বেগ ওকেও স্পর্শ করে। বলে—'তাইতো, বিস্তি তো আসেনি দেখছি। কি হ'ল আবার কে জানে।'

লতা তাড়া লাগায়—'ওরে, হাত চালায়ে কাজ কর্ সবাই। কারো জন্যি ভাবতি হবে না। সব্বাই আসবে। না আ'সে যাবে কোথায় রে? জানিস্ই তো, ভাত দেয় না ভাতারে, ভাত দেয় গতরে। গতর না খাটালি প্যাটের ভাত কেউ মানা দেবে না।'

অনুভা মালতী একযোগে যেন বিষম চমক খায়। চমকে তাকায় লতার মুখের দিকে। চেহারায় একসময় কিছু বা জলুস ছিল লতার, অনুমান করা যায়। রংটা ফর্সার দিকেই। যৌবন এখনো

ছুঁয়ে আছে শরীরে খানিকটা। কিন্তু লাবণ্যহীন কর্কশতার যেন এক সচল উদাহরণ। রুক্ষ, পোড়াটে, ধাতব অভিব্যক্তি। স্বামীর ঘরে ওর জায়গা হয়নি। অনুভা, মালতী—দুজনেই এই কুড়িতেও অনূঢ়া। ভাতারের বস্তুমূল্য কি, তা অনুধাবন করার বাস্তবতা এখনো আসেনি তাদের জীবনে। কিন্তু স্বামী-পরিত্যক্তা লতার তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো উক্তি যেন আমূল বিদ্ধ করে তাদের হৃদয়, এবং সেই রক্তাক্ত হৃদয়-দেশ জুড়ে বড়ো মর্মান্তিক উচ্চারিত হতে থাকে ঐ নির্মম বাক্য-বন্ধ—'ভাত দেয় না ভাতারে, ভাত দেয় গতরে।'

কিছু বাদেই ওরা ঝটিতি কাজ চুকিয়ে, নিজস্ব বস্তার মুখ দৃঢ় বাঁধনে বন্ধ করে। নিবারণ দাসের হাতে চালের দাম মিটিয়ে স্টেশন অভিমুখে রওনা হয়। পরপরই আসে শঙ্করা। সন্ধানী চোখে কাকে যেন খোঁজে। পায় না। দৃষ্টিতে শূন্যতার ছায়া। কিন্তু তা স্থিতি পায় ক্ষণকাল। সহজাত কাঠিন্য ফিরে আসে আবার। এগিয়ে যায় নিবারণের কাছে। প্যান্টের পকেট থেকে একটা নোটের তোড়া রাখে ক্যাশ-বাক্সের উপরে।

—'এতে পাঁচশো আছে দাসমশায়। এটা জমা ক'রে রাখেন।'

তারপর চাল-মাপা লোকগুলোর দিকে ফিরে দাঁড়ায। বৃহৎ আকারের চারটে বস্তা ছুঁড়ে দেয় ওদের দিকে। স্বচ্ছন্দ নির্দেশ দেয়—'চারটে বস্তাই ভর্তি করে দাও।'

চাল বহনাদির কাজকে জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছে, এমন কিছু লোক আশেপাশে ইতঃস্তত দৃশ্যমান। তাদের দুজনকে ইশারায় ডাকে শঙ্করা।

—'লোকাল একটু লেট ক'রে ছাড়বে। লাস্ট কামরায় এই চারটে বস্তা তুলে দিয়ে এসো।' নির্দেশাদির কাজ যথাযথ শেষ ক'রে শঙ্করা আবাব ফিবে আসে নিবারণের কাছে।

নিবারণেব ক্যাশ বাক্সের পাশেই এক প্যাকেট সস্তা দামের সিগারেট। অবিলাসী সরল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নিবারণের এটুকুই ব্যক্তিগত বিলাস। শঙ্করা নিঃসঙ্কোচে তার থেকে একটি সিগারেট বের করে। মুখে নিয়ে নিবারণের দেশলাই দিয়েই তাতে আগুন ধরায় এবং দীর্ঘ একটি সুখটান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে।

নিবারণ হাসে। সে হাসিতে বুঝি কিছু প্রশ্রয় থাকে।

—'আজ যেন একটু দেরি ক'রে আস্‌লি শঙ্করা!'

—'হ্যাঁ দাসমশায়, আজ একটু দেরি হ'ল।'

শঙ্করার মুখের দিকে তাকায় নিবারণ। ওর আরক্ত চোখ দুটোর দিকে এক পলক তাকিয়ে বলে নিবারণ—'শরীর-টরীর খারাপ নাকিরে?'

—'না দাসমশায়, শরীর আমার সহজে খারাপ হয় না, আমি ভাল আছি।'—

'লোকাল' ট্রেন ছাড়ার সময় আসন্ন। চার বস্তা চাল কুলি তুলে দিয়ে এসেছে ট্রেনে। সিগারেটের শেষাংশটুকুতে একটি নিবিড় সুখ টান দিয়ে শঙ্করা দ্রুত পা চালায় স্টেশন অভিমুখে।

নিবারণের দৃষ্টি ক্ষণকাল নিবদ্ধ থাকে শঙ্করার যাত্রাপথে। শঙ্করা অবশ্যই তার দোকানের খরিদ্দার এবং বেশ লাভজনক খরিদ্দার। শঙ্করার নিজের এবং তার চাল-পার্টির লোকজনের যৌথ কেনা-কাটির সুবাদে নিবারণের ধারাবাহিক ব্যবসায়িকতায় একটি নিশ্চিত এবং বড়ো রকম লাভের সম্ভাবনা নিয়ত সূচিত থাকে। সে বিচারে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র খাতির শঙ্করার অবশ্যই প্রাপ্য। কিন্তু লাভ-লোকসানের এই খতিয়ানের ঊর্ধ্বেও একটু বাড়তি ভালবাসা যেন হাল্‌কা এক টুকরো স্বচ্ছ শারদ-মেঘের মতো বিতত থাকে নিবারণের অন্তরে। এই জেদী, দুরন্ত ছেলেটার প্রতি এক ধরণের মমতা তাকে আপ্লুত করে।

।। চার ।।

সকালের দিকে চালের বস্তা নিয়ে গাড়ীতে উঠেছিল বিন্তি। আগের দিন অনিচ্ছাকৃত বিরতি। দেহে মনে যেন চেপে বসে ছিল বিষম এক ক্লান্তির ভার। সব প্রাণ-রস শুষে নিয়ে তা যেন ওকে পরিণত করেছিল অচেতন এক জড় পদার্থে। শুয়ে বসে কাটিয়ে দেওয়া নির্ভেজাল একটি অলস দিন।

কিন্তু গরজ বড়ো বালাই। আর সেই বালাইয়ের টান বড়ো তীব্র, এবং সেই টানে আজ সকালেই বেরিয়ে পড়েছিল যথারীতি। বস্তা বোঝাই চাল নিয়ে হাজির হয়েছিল স্টেশনে। কিন্তু ভাগ্য ওর প্রতি বিরূপতা দেখাল। সকালের দিকের অপেক্ষাকৃত কম ভিড়ের যে ট্রেনটা ওর উদ্দিষ্ট ছিল, সেটা অবিশ্বাস্য যথাযথ সময়ে স্টেশন ত্যাগ ক'রে গেল। ফলে, বিশাল চালের বস্তাটা নিয়ে বাধ্যতামূলক ভাবেই উঠতে হ'ল ভিড়ের ট্রেনে। আগের থেকেই ছিল কামরা-উপ্‌চানো ভিড়। ভারী চালের বস্তা নিয়ে উঠতে গেলেই যাত্রীদের সমবেত কোরাস—'হবে না—হবে না—অন্য কামরায় যাও।'

হবে না, তবু হয়।

বিন্তি এক-সময় কামরার গলির মধ্যে কিছুটা এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কারণ, লোকের গাল-মন্দ, ধাক্কাধাক্কি — সব কিছুতেই সহিষ্ণুতা তখন ওর বড়ো আশ্রয়।

ওদিকে বাইরে যারা ঝুলছিল বিপজ্জনক ভাবে, তাদের সরোষ তর্জন—

—'কি হচ্ছে মশায়, ভিতরে একটু এগিয়ে যান না!' ভিতর থেকে জবাব আসে—'গড়িয়ে গড়িয়ে চলে আসেন না দাদা! ভিতরে তো একেবারে গড়ের মাঠ। হাওয়া খাবেন, স্বাস্থ্য ভালো করবেন, তাড়াতাড়ি চলে আসেন।'

চিঁড়ে-চ্যাপ্‌টা ভিড়, গুঁতোগুতি, ধাক্কাধাক্কি। শালীনতার প্রশ্ন অবান্তর, নিরাপত্তাই বিবেচ্য। ঠ্যালার ধাক্কায় টাল্ সামলাতে সামলাতে রসিক যাত্রীর মন্তব্য — 'ও দাদা, একটু যত্ন সহকারে ঠেলুন।'

কখনো সরোষ তর্জন, কখনো সরস ভাষণ। বিচিত্র এক অবস্থা।

নানাবিধ কৌশল এবং প্রক্রিয়া বিন্তিকে সাহায্য করে। সে আরো কিছুটা এগিয়ে যায় এবং কাঠের পার্টিশানের গায়ে কিছুটা জায়গার দখল নিতে পারে। বস্তাটা সেখানে নামিয়ে একটু হালকা হয়।

পিণ্ড-পাকানো অসহ্য এই ভিড়, এবং সে ভিড় কাউকে দণ্ডকাল সুস্থ থাকতে দেয় না। ওরই মধ্যে বিন্তির দৃষ্টি লক্ষ্যের একটি কেন্দ্রে স্থিত হয়। কামরার ভিতর দিকে একটি বেঞ্চে কুড়ি বাইশের চারটি সদ্য যুবক, পারিপার্শ্বিক ভিড়-ভাট্টা এবং লোক-সমাগম সম্পর্কে চূড়ান্ত তাচ্ছিল্য, নিজস্ব আলাপচারিতায় মগ্ন। সম্ভবতঃ মূলবর্তী কোনো স্টেশন থেকে বস্তুগুলি আহৃত হয়েছে, নচেৎ এই ভিড়ের ট্রেনে বসার জন্য স্থান-সঙ্কুলান সম্ভব নয়। কথাবার্তা রুক্ষ, অমার্জিত। যে আলোচনাই করুক, কণ্ঠস্বর অতি উচ্চগ্রামের, পার্শ্ববর্তী যাত্রীদের কানে তার প্রবেশ বাধ্যতামূলক। এবং কথার ফাঁকে ফাঁকে আরো দু'একটি শব্দ যা উচ্চারিত হচ্ছে, সাধারণতঃ ভদ্র পরিবেশে সেগুলির উচ্চারণ নিষিদ্ধ। কিন্তু সেগুলি যেন ওদের কাছে অতীব সরল সহজ, জলীয় তারল্যে স্বতঃস্ফূর্তবেগে উদ্‌গীরিত হচ্ছে। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে ইতর চতুষ্পদ প্রাণীর মতো কর্কশ খিঁক খিঁক হাসি।

আশপাশের যাত্রীরা উদাসীন, নিরাসক্ত। ভিতরে ভিতরে সকলেই ক্ষুব্ধ, বিরক্ত — অভব্য

এই আচরণে সকলেই বিচলিত — কিন্তু তার বহিরঙ্গ প্রকাশে কেউ দুঃসাহসী হয় না। দার্শনিকতার মুখোস এঁটে, 'এ জগৎ মায়া প্রপঞ্চ'— জাতীয় উপলব্ধিতে মুখের রেখাকে শান্ত অবিচল এবং সহিষ্ণু রাখে। কারণ উনিশ-সত্তরের এই দশকে দেশে যুবশক্তি বড়ই প্রবল, এশিয়ার মুক্তি-সূর্যের গৌরবের প্রতিফলিত আলোয় তারা এখন বড়ই শক্তিমান, বেপরোয়া এবং উদ্ধত। এবং কার মনে কি আছে বলা যায় না, ঐ চারটি যে তাদেরই কোনো অংশের প্রতিনিধিত্ব করছে না, এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। অতএব প্রতিবাদ-হীন থাকাই সবথেকে নিরাপদ। ঘণ্টাখানেকের তো মামলা, ট্রেন একবার শিয়েলদায় এসে গেলেই তো নেমে যাবার পালা। খুঁচিয়ে ঘা করতে যাওয়াটা বাঙালীর বুদ্ধিজীবিতার পক্ষে মানানসই নয়।

ওদের মধ্যবর্তী যুবাটি—পোশাক-আশাকে যে বিশেষ সচ্ছলতা আছে তা নয়, কিন্তু সেগুলি পরিধানের ভঙ্গিটি বড়ই অভিনব। পোশাক-পরিচ্ছদ এবং চেহারাটির সামগ্রিক উপস্থাপনায় হিন্দী চলচ্চিত্রের একজন শ্রুতকীর্তি সুপার-স্টারের অক্ষম অনুকৃতি। কিছু কাঁচা শব্দের মিশেলে সঙ্গীদের উদ্দেশে সে একটি বচন ছাড়ল। বাকি তিনটি উল্লাসে কঁকিয়ে উঠে পরস্পরের গায়ে ঢ'লে পড়ে—

—'সাব্‌বাস গুরু, কি ছাড়লে মাইরি গুরু!'

'গুরু' আরো একটি কাঁচা বস্তু পরিবেশনেব জন্য তৈরী হচ্ছিল। হঠাৎ পার্শ্ববর্তী দণ্ডায়মান এক যাত্রী, নিতান্ত দুঃসাহস, মন্তব্য ক'রে বসে—

•—'ও দাদাভাইবা, কারা আপনারা, এমন ভাবে সেই থেকে কথাবার্তা বল্‌তিছেন—আর তো টিক্‌তি পারতিছি না আমরা—!'

দুঃসাহসী লোকটির দিকে পার্শ্ববর্তীরা চমকিত তাকায়। নিতান্ত গ্রাম্য, মফস্বলীয় চেহারা। এর এত সাহস? কিছু একটা বিপর্যয়ের শঙ্কায় সকলে উদ্‌গ্রীব। এবং যথার্থই তিন যুবক উঠে দাঁড়ায় সটান। কিন্তু যেটি 'গুরু' নামে কথিত হয়েছে আগেই, আসন ছাড়ল না, কিঞ্চিৎ ধীর স্থির, চোখের ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে একবার মেপে নিল লোকটিকে। তারপর সঙ্গীদের দিকে 'গুরু' জনোচিত নির্দেশ দিয়ে বলল—'আরে গব্বর সিং-এর দল, কি যে মাথা গরম করিস্ তোবা, দেখ্‌ছিস না, কুঁচো পাবলিক। এর কথায় মাথা গরম করে নাকিরে বুদ্ধু!— বসে যা বসে যা!

তিন সঙ্গীর আস্তিন গোটানো হাত গুটিয়ে আসে—

—'ঠিক আছে গুরু, তোমার কথাই মেনে নিলাম।'

ওরা গুরুর পায়ের ধুলো নেয় এবং বসে পড়ে। গুরু এবার লোকটির দিকে তাকায়—'এই যে কুঁচো পাবলিক, কি বলছিলে যেন—আমবা কারা? আমরা হলাম—' চারজন হিন্দি চলচ্চিত্রের অভিনেতার নাম বলে, এবং সেই নামে সে পরপর নিজেদের শনাক্ত করে।

তারপর বলে—'কি বললাম, বুঝেছো তো কুঁচো পাবলিক। এবার মুখে চাবি লাগিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। নইলে গব্বর সিং-এব দল তোমাকে পেঁদিয়ে বাপের নাম খগেন ক'রে দেবে। শালা! গাড়ীতে রোয়াবী মারাচ্ছো।'

অতঃপর পরিস্থিতিতে ওদের একাতপত্র আধিপত্য কায়েম হয়। বোঁদামারা পাবলিক যথাসাধ্য ওদের থেকে মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে ভাবলেশহীন।

ওরা আবার নিজস্ব আলাপচারিতায় ব্যাপৃত হয়। কিছু এলোমেলো অসংলগ্ন কথাবার্তা। তারপর একসময় 'গুরু' নামে কথিত যুবাটি ভারিক্কী গলায় বলে— 'এ্যাই, কথা সব ঠিক আছে তো? পরশু থেকে কলকাতার পাঁচটা হলে 'গুরু'র ছবি নামছে। বড়ো টিকিট সব আজ তুলে নিতে হবে।'

সঙ্গী এক যুবা বলে—' ল্যাংড়া তাপসরা কিন্তু ঝামেলা পাকাবে। গুরুর ছবি, ওরাও চাইবে টিকিট আটকাতে। এবার ফাইট লাগবেই।'

—'আরে চেপে যা, ল্যাংড়া তাপসের সাথে কথা-বার্তা আমার পাকা হয়ে গেছে। ওদের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে।'

কামরার যাত্রীরা এসব কথা শোনে এবং যারা বিচক্ষণ, তারা ব্যাপারটার তল পায়। যুবা চারটি সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে। কলকাতার খ্যাতনামা কিছু সিনেমা হলে হিন্দী চলচ্চিত্রের সুপার স্টারের ছবি আসছে। সুপার স্টারটির নামে আসমুদ্র হিমালয়ে যুবশক্তি নব আনন্দে জাগে। তার ছবির টিকিট গুণগ্রাহীদের কাছে পরম রতন বলে বিবেচিত হবে এবং তা প্রথম পর্যায়েই সংগ্রহের জন্য কামড়া কামড়ি শুরু হবে বিলক্ষণ। গুরুর বইয়ের উঁচুদামের টিকিট আগে ভাগে সংগ্রহ ক'রে রাখতে পারলে চার পাঁচ গুণ বেশী দামে নিশ্চিত তা কাটানো যাবে। চমৎকার ব্যবসা একটি। এই যুবা চারটি এ লাইনে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং দক্ষ। এই সাতসকালে ওদের এই কলকাতা-মুখো অভিযানটি এই বিশেষ ব্যবসা-কেন্দ্রিক।

প্রয়োজনীয় দু'চারটি কথা-বার্তার পরই নিজস্ব সাংস্কৃতিক আলোচনাদি পুনরাবৃত্ত হয়। সেই কথাবার্তা, স্বরগ্রাম ক্রমশঃ উচ্চতা পায়। ঝাঁঝালো শব্দাবলীতে কানে জ্বালা ধরে। হঠাৎ কোণের দিক থেকে খ্যান খ্যান ক'রে বাজে একটি তিতিবিরক্ত তিক্ত কণ্ঠস্বর —'পোড়ারমুখো অলপ্পেয়ে গুলো মরেও না, যমের অরুচি সব!'

'গুরু' নামধেয় যুবাটি এবার হুঙ্কার ছাড়ে—'দ্যাখ্‌তোরে ন্যাপা, কোন্ পাব্‌লিক আব্বাব আওয়াজ দিচ্ছে?'

ন্যাপা নামের যুবাটি ফিরে তাকায়। আওয়াজের উৎসটি চোখে পড়ে। খুনখুনে এক বুড়ী। কোণের দিকে বসে আছে। সঙ্গে একটা পোঁটলা, আর একটা ঘটি। পাশে বসা বছর বারো তেরোর নাতি। কালীঘাটে চলেছে মাকালীর পূজো দিতে। সাত্ত্বিক মানসিকতায় কাঁচা শব্দগুলোর প্রকাশ্য উচ্চারণে আগুন চড়েছে বুড়ীর মাথায়।

যুবাটি বুড়ীকে একবার তেরছা দেখে। তারপর উৎকট একটা হাসির তরঙ্গে টেনে টেনে বলে—'হেমা মালিনী রে, তবে ছুঁড়ী নয়, বুড়ী।'

—'আব্বে, হেমা মালিনীর আবার ছুঁড়ি বুড়ী কি রে শালা! হেমা মালিনী ইজ হেমা মালিনী—' গুরু যুবাটি সঙ্গীকে ধমক লাগায়। তারপর সিটি বাজিয়ে বুড়ীর দিকে একটি ফ্লাইং কিস্ ছুঁড়ে দিয়ে বলে— 'জম্মো দিনের আছীব্বাদ লওগো আমার হেমা মালিনী দিদিমা।

বৃদ্ধা স্পষ্টতঃই অপমানিত বোধ করে। কিন্তু পশুশক্তির এই নির্লজ্জ আস্ফালনে বুঝি বা কিছু ভীত হয়। আর কথা বাড়ায় না। শুধু অপমানের জ্বালায় মনে মনে গজরায়।

ইতিমধ্যে গাড়ী এসে পৌঁছল জংশন স্টেশনটায়। দ্রুত অবতরণের একটা প্রক্রিয়া চলল এবং জরদ্গব ভিড়টাকে কিঞ্চিৎ হাল্‌কা করতে তা সহায়ক হয়। কামরার ভিড়টা এখন কিছু সহনীয়।

চার যুবা তখনো বুড়ীকে কেন্দ্র ক'রে রসালাপ খিস্তি খেউড় এবং খিঁক্ খিঁক্ হাসির তুবড়ি ফাটাচ্ছে। আশপাশের যাত্রীরা যথারীতি দার্শনিক নিরাসক্তিতে নির্লিপ্ত।

জংশন স্টেশন ছেড়ে গেল গাড়ী। ওপাশের বেঞ্চে এক সুদর্শন সুবেশ প্রৌঢ়, পরিস্থিতিতে আকস্মিক যোগ করলেন এক ভিন্ন মাত্রা—'এসব তো হ'লরে ভাই অনেকক্ষণ, এবার একটা গান হোক না।'

ভদ্রলোকের উচ্চারণে মনোরম একটি আন্তরিকতার স্পর্শ—যা এই দলটি সম্পর্কে তাঁর পরিচিতির ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করে।

চারটি যুবার শেষতমটি উল্লাসে সিটি মারল—

—'ইয়াঁহু, পাবলিক যে গানা শুনতে চাইছে গুরু।'

মধ্যবর্তী যুবাটি পরম বুঝমানের মতো জবাব দেয়—'পাব্লিক চাইলে আলবৎ গাইতে হবে। পাব্লিকের কথা না শুনলে চলে? আমার গুরুও এই শালা পাব্লিককে ভয় খায়।'

তিন যুবার সমবেত জয়ধ্বনি —'সাব্বাস গুরু।'

আকস্মিক নেমে আসে এক অকল্পনীয় স্তব্ধতা। পারিপার্শ্বিকে শুধু গাড়ীর চাকার একটানা ঝিরঝিরে ধাতব শব্দ। আর সেই শব্দের সঙ্গতে গুণ্‌গুণ্ করতে থাকে মধ্যবর্তী যুবাটির কণ্ঠস্বর। তারপর একসময় অপরূপ সুরের মূর্ছনায় উদ্বেল হয় বাণীর তরঙ্গ—

'বল্‌রে জবা বল্
কেমন করে পেলিরে তুই
শ্যামামায়ের চবণতল।

সাধক কবি নজরুলের সেই অবিস্মরণীয় শ্যামা সঙ্গীত। দরাজ সুরেলা কণ্ঠস্বরে সঙ্গীতের কথাগুলি যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে। শ্যামা মায়ের চরণতলে অকিঞ্চিৎকর জবা পুষ্পটি যেন কি অসামান্যতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সুরের পাখায় ভর ক'রে তা যেন উড়ে যায় অচেতন থেকে চেতনলোকের কোন্ অলৌকিক কৈলাসে। গানটির গায়কও যেন তখন এক দৈবী মায়ায় আচ্ছন্ন। সমাধিগ্রস্ত সাধকের ধ্যান-তন্ময়তায় নিশ্চল তার অবয়ব। বন্ধ দু চোখের পাতায় থির থির কাঁপে এক মায়াবী আলোব বিভা। সঙ্গীতেব কথাগুলি সুরের ঝরণাধারায় আবর্তিত হতে থাকে—বিবর্ধিত হতে থাকে যুবাটির কণ্ঠে।

সময় এসব ক্ষেত্রে বড়ো দ্রুতগামী। অচিরেই এসে যায় শিয়েলদা স্টেশন। একটি স্বপ্নের ঘোরে যেন ছেদ ঘটল আকস্মিক। সময়-সচেতন যাত্রীদের অবতরণের ব্যস্ততায় মুখর হয়ে উঠল কামরাটি। দ্রুত নামতে নামতেও যাত্রীরা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নেয় গায়কটির মুখ। এক গম্ভীর-প্রকৃতি বৃদ্ধ ভদ্রলোক নামতে নামতে সহযাত্রীকে বলেন—

—'বুঝলেন মশাই, আজকালকার ছেলেদের বোঝাই ভার।'—

কোণের সেই অপমানিত বৃদ্ধাটি এবার এগিয়ে আসে গুটি গুটি। যুবাটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক। এক শাপ-ভ্রষ্ট দেবতার প্রতিভাস বুঝি বা তার সামনে। অশ্রুধারা চোখের দুই কূল প্লাবিত ক'রে বৃদ্ধার ভাঙাচোরা তোবড়ানো গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। মমতার মেদুর স্পর্শে বৃদ্ধা হাত বোলায় যুবাটির চিবুকে। তারপর সেই হাতটি ছোঁয়ায় নিজের ওষ্ঠে, কপালে, মাথায়। আর অমোঘ এক জপমন্ত্রের মতো বিড়বিড় ক'রে উচ্চারণ ক'রে চলে বৃদ্ধা

—'তোদের ভালো হোক বাবারা, তোদের ভালো হোক। সোনার টুকরো ছেলে তোরা, ভগবান তোদের বাঁচিয়ে রাখুন।'

যাত্রীরা নেমে যায়।

যাত্রীরা নেমে যায়, কিন্তু স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থাকে বিন্তি। যেন বা নিশ্চল এক পাথরের মূর্তি। তার নিজস্ব চালের বস্তার নিরাপত্তা, গাড়ী থেকে নামা, সুবিধাজনক গেট দিয়ে দ্রুত ছুটে পালানো—এ-মুহূর্তে এসব চিন্তা যেন তার কাছে অর্থহীন। ক্ষণকাল আগের ঐ গান, বহমান ঐ সুরের ধারা, সম্মোহনে তাকে আচ্ছন্ন রাখে। তার চোখের সামনে ভাসে স্থির এক চিত্র। টালিছাওয়া মাটিরঘর। জীর্ণ মুলি বাঁশের বেড়া। ঘনায়মান সন্ধ্যায় আলো আঁধারের খেলা। ঘরের কোণে প্রদীপ শিখা। পাশে মা কালীর বাঁধানো একটি ছবি। এক বৃদ্ধ সেখানে উপবিষ্ট। তার এক পাশে একটি ছেলে। অন্যপাশে একটি মেয়ে। বৃদ্ধ তার সুরহীন ভাঙা গলায় অন্তরের সবটুকু দরদ মিশিয়ে গাইছেন—

'বল্‌রে জবা বল, কেমন করে পেলিরে তুই শ্যামা মায়ের চরণ তল।'—সেই সুরের আকর্ষণে নিশ্চল বসে আছে ছেলেটি। মেয়েটি। স্মৃতির সূত্র ধ'রে বিস্তি যেন হাজার যোজন পথ অতিক্রম করে। ওদের চিনতে পারে। ঐ বৃদ্ধ তার বাবা। ঐ ছেলেটি তার হারিয়ে যাওয়া দাদা। আর ঐ মেয়েটি সে নিজে।

গান বড় ভালবাসত বিস্তি। ভাল গাইতেও পারত। চালের চোরাচালানী বিস্তির কাছে সবই আজ স্মৃতি। দুর্মর স্মৃতি।

তবু ক্ষণকাল আগের ঐ সুরের দোলা তাকে সম্মোহনে বেঁধেছিল। সবাই নেমে গেলেও তার আচ্ছন্নতার ঘোর যেন কাটেনা। শূন্য কামরায় দাঁড়িয়ে থাকে অবিচল। তার মনের দোতারায় —বেজে চলে অবিরাম ঐ সুর, ঐ কথা 'বল্‌রে জবা বল্‌।'—শ্যামা মায়ের চরণতলের ঠিকানা হারা বঞ্চিত এক অকিঞ্চন কাঁদে— কেঁদেই চলে তার বুকের সঙ্গোপন গভীরে।

লতা আর মালতী উঠেছিল পিছনের কোনো কামরায়। গাড়ী থামতেই চলন্ত ভিড়ের স্রোতের অঙ্গীভূত হয়ে, কাঁকালে ভারী চালের বস্তাটি চাপিয়ে নিরাপদ গেটের দিকে যথাসাধ্য দ্রুতগামী হবার চেষ্টায় ছিল। হঠাৎ নজরটা আটকাল মালতীর। যাত্রী-পরিত্যক্ত শূন্য কামরায় বিভোল দাঁড়িয়ে আছে বিস্তি একা। থমকে দাঁড়ায় মালতী—'ও লতাদি, কাণ্ড দেখো। বিস্তি একা একা ভ্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে আছে।'

লতাও দেখে মালতীকে—'তাই তো রে! ও ঠেয়ারীর আবার হলোডা কি? ছেম্‌ড়িডারে নিয়ে আর পারা যায় না।'

চকিতে দুজন ছুটে আসে কামরার দরজায়। হাঁক দেয় —'কিরে বিস্তি, নামবি না তুই?'

চট্‌কা ভাঙে বিস্তির। মানুষ জন, ভিড়, লতা, মালতী, চালের বস্তা—সব মিলিয়ে প্রখর বাস্তব তার নির্মম রূপটি উপস্থাপিত করে বিস্তির কাছে।

সবলে চালের বস্তাটি বিস্তি টেনে তোলে কাঁকালে। নেমে আসে দ্রুত। লতা আব মালতীর দিকে তাকিয়ে ফিক্‌ ক'রে হাসে। তারপর বলে—'চল্‌, চল্‌ লতাদি—তাড়াতাড়ি দৌড়ো।'

।। পাঁচ ।।

জানালার কাছে একটি সিটে একান্তে বসে ছিল শঙ্করা। দ্রুত ধাবমান রেলগাড়ীর পার্শ্ববর্তী দৃশ্যাবলী ভাসছিল চোখের সামনে। যেন অবিকল কোনো চলচ্চিত্রের দৃশ্যপট।

শীতের নরম রোদে পাশ্ববর্তী ধানক্ষেত, গাছ-গাছালি, কাছে দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গ্রামীণতা, যেন কী মায়ায় মাখামাখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কেউই স্থির নয়। এই আছে, মুহূর্তকালে অন্তর্হিত। রেলগাড়ীর গতির সঙ্গে এক একটি ছবি নিমেষে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। রেললাইনের পার্শ্ববর্তী এই সব দৃশ্যাদি তার বহুল পরিচিত, কারণ এপথে তার যাতায়াত প্রায়শঃ, এবং অনায়াস। এ লাইনের শেষ সীমান্তবর্তী রেলস্টেশনটি যেন তাকে এক অমোঘ আর্কষণে টানে, সময় সুযোগের অপেক্ষা না করেই সে বেরিয়ে পড়ে, এবং ঐ ব্যাপ্ত রেলস্টেশনটিতে এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়।

তার এই বিচরণ নিরর্থক হয় না, মনের মধ্যে প্রায়শ জমে থাকে যে ভার, গুমোট—এই এলোমেলো বিচরণ সেই গুমোটটাকে কিছু লঘু হতে সাহায্য করে। খানিকটা সময় এভাবে কাটিয়ে সে আবার ফিরে আসে তার নিজস্ব ডেরায়। পয়সা কড়ির বিচারে দিনটা নিষ্ফলা যায়, কিন্তু অন্যবিধ একটা প্রশান্তি তাকে কিঞ্চিৎ সুস্থির করে।

ট্রেনে এখন ভিড়ের প্রকৃতি মাঝারি আকারের। যতই কলকাতার সন্নিকটবর্তী হবে, ততই পালটাবে ভিড়ের চরিত্র। তবে এখন পড়ন্ত দুপুর, সকাল সন্ধ্যের অফিসটাইমের মারাত্মক সেই যাত্রীস্ফীতি এখন নেই।

মাঝে মাঝেই কামরায় হকারদের চীৎকৃত ঘোষণা, নিজস্ব পণ্য-দ্রব্যের সাড়ম্বর প্রচার-প্রশংসা।

—'এই যে খাঁটি দার্জিলিং-এর চাকভাঙা মধু। একটা কোয়া মুখে ফেললেই স্বর্গের নন্দাকানন।'

কমলা লেবুর ফেরিওয়ালা। ভালো বিক্রি। খদ্দেররা হাতে হাতে বাছাই ক'রে তুলে নিচ্ছে।

—'এই লেবু—এদিকে এক জোড়া।'

শঙ্করা লেবু কেনে। একটা লেবু ভেঙে তারিয়ে তারিয়ে স্বাদ নেয়।

কোণের দিকে একটি বাচ্চা ছেলে। পোশাক-আশাক এবং চেহারা জাত-ভিখারীর পরিচয় জ্ঞাপক। জুল্-জুল্ করে তাকাচ্ছে শঙ্করার দিকে।

শঙ্করা ওকে ডাকে হাতের ইশারায়। গুটিগুটি এগিয়ে আসে ছেলেটি। উদ্বৃত্ত লেবুটি ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে শঙ্করা—'এই নে, লেবু খা—'

ছেলেটির দু'চোখে প্রত্যাশিত লোভ, কিন্তু হাত বাড়াতে সঙ্কোচ। পয়সার জন্য যাত্রীদের কাছে হাতটি সদা-প্রসারিত, কিন্তু লেবুটি নেয়ার ক্ষেত্রে লজ্জা।

—'নে, নে বল্‌ছি—' এক ধমক লাগায় শঙ্করা।

ভীরু হাতে লেবুটি নেয় ছেলেটা। তারপর দরজার কাছে পার্টিশানের দেয়ালে হেলান দিয়ে লেবুটা ভাঙে। এক একটা কোয়া খায়। আর শঙ্করার দিকে জুলজুল তাকায়। আর বুঝি একটু হাসে মিটিমিটি।

আজও কাকভোরে শঙ্করা হাজির হয়েছিল স্টেশনে। চাল নিয়ে কলকাতা যাবার নিয়ম-মাফিক প্রস্তুতি ছিল মনে। কিন্তু এক পাগল-পাগল ছন্ন মানসিকতা ওকে হঠাৎ জেরবার করে। এটা বিগত কয়েকদিনের ধারাবাহিক বিষণ্ণতারই জের। এক আকস্মিকতার ধাক্কায় উঠে বসে উল্টোমুখী ট্রেনে এবং ঘণ্টা দুই বাদে হাজির হয় এ লাইনের শেষ স্টেশনটিতে।

প্লাটফর্মের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে বেড়ায়। কখনো ধীরে। কখনো দ্রুত লয়ে। ওভারব্রীজে কয়েকবার দ্রুত উঠানামা করে। প্লাটফর্মের বেঞ্চে ঝিম মেরে বসে থাকে খানিকক্ষণ। তারপর রেল লাইন বেয়ে সাইডিং-এর দিকে হেঁটে যায় কিছুক্ষণ। একটা মালগাড়ী প্রাগৈতিহাসিক কোনো প্রাণীর মতো দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দ। এই স্টেশনটি, এর সামগ্রিক পারিপার্শ্বিকতা, আজন্ম শঙ্করার চেতনায় গভীরভাবে যুক্ত। যাত্রী-ট্রেনের আসা-যাওয়া, প্যাসেঞ্জারদের ওঠানামা, শীত-গ্রীষ্ম বর্ষা-শরতের স্টেশন-কেন্দ্রিক রূপ-চিত্রের ভিন্নতা শঙ্করার কাছে একটি শরীরী উপলব্ধির মতোই। একটা অদৃশ্য মায়ার বাঁধন তাকে নিয়ত আকর্ষণ করে, এবং সেই আকর্ষণে বারবার সে এখানে ছুটে আসতে ব্যাকুলতা বোধ করে।

সাইডিং-এর দিক থেকে ফিরে আসার সময় স্টেশনের পার্শ্ববর্তী এঁদো জলাশয়টির পাশ দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথ দিয়ে এগিয়ে আসছিল শঙ্করা। লাইনের পাশ ঘেঁষে একটি খুপরি চালাঘর। চায়ের সরঞ্জাম। বেঁচে থাকার সংগ্রামে বিভিন্ন স্টেশনে রেল-লাইনের পাশ ঘেঁষে এ-ধরনের চায়ের দোকান বহুল-দৃষ্ট।

দোকানটিতে দুজন খদ্দের। চেরা বাঁশের বেঞ্চে বসে চা পানে রত। পাশ দিয়ে যেতে যেতে শঙ্করা থমকায়। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। চায়ের দোকানের অভ্যন্তরীণ দৃশ্যাদিতে কোনো অভিনবত্ব

নেই। পাতা উনুন, চায়ের কেটলি, কাচের বয়েমে খান-কয়েক লেড়ো বিসকুট—এ জাতীয় চা-দোকানের বহুল পরিচিত একঘেয়ে চিত্রাদি। কিন্তু একান্ত অভিনিবেশে চা তৈরী করছে যে লোকটি, তার প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করল শঙ্করা। জীর্ণ লুঙি, জালি গেঞ্জিটা আরো ফুটো হয়ে হয়ে বৃহত্তর কয়েকটি ফুটোতে পর্যবসিত, এবং ভাঙাচোরা পোড়-খাওয়া একটি লোক।

মনে হচ্ছিল, লোকটি তার চেনা, কিন্তু স্মৃতি তাকে প্রতারিত করছিল। কিম্বা লোকটি তার চেনা নয়, কিন্তু চেনা হলেও হতে পারত, এ-জাতীয় একটি অনুভূতি ক্রিয়া করছিল তার মনে। রেল লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে, দুই হাত কোমরে রেখে শঙ্করা গভীর অভিনিবেশে লক্ষ করছিল লোকটিকে।

নিরুত্তাপ, ভালো-মানুষ চায়ের দোকানীটি হঠাৎ বড় সচকিত হয়। একটা অস্থিরতা যেন ওকে ব্যাকুল করে।

এই ব্যাকুলতা স্বাভাবিক। উনিশ-সত্তরের এই দশকে সমস্ত দেশ জুড়ে এখন যে অস্থির রাজনীতি চলছে, ক্ষণে ক্ষণে বোমা পেটো ছুরি-ছোরার যে বহুল ব্যবহার চলছে, তাতে আকস্মিকভাবে এ-জাতীয় একটি তেরিয়া-মার্কা উগ্র-যুবকের মনোযোগের বিষয় হলে, উৎকণ্ঠা উদ্বেগ একান্ত স্বাভাবিক। সামান্য চায়েব দোকানী, রাজনৈতিক কোনো সাতে পাঁচে থাকে না, সুতরাং তার নিরাপত্তার সম্ভাবনা কিছুতেই বিঘ্নিত হতে পারে না, এ-প্রকার চিন্তা তাকে আশ্বস্ত করেনা। সামান্য ভুল বোঝাবুঝিতে অতি নিরীহ শ্রমজীবি মানুষও কোথাও কোথাও এই মুক্তি-সন্ধানী তরুণদের হাতে নিগৃহীত হয়েছে, নিহত হয়েছে, এ-সব সংবাদ বাতাসে ভাসে। দোকানীটির কাছেও এসব সংবাদ অজানা নয়। বড় ঘাতক এক সময় এখন। সুতরাং তার পক্ষে ভীত হওয়া স্বাভাবিক।

ভীতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষকে সপ্রতিভ করে। দোকানী সেই সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণায় শঙ্করার দিকে একটু বিনীত হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বলে—

—'আসেন বাবু, চা খান্ তো ভেতরে আসেন। ভালো চা আছে।'

গুটি গুটি এগিয়ে আসে শঙ্করা। বাঁশের বেঞ্চের এক কোণে বসে।

—'টাটকা কেক আছে। 'দেবো বাবু?'—

শঙ্করা কোনো জবাব দেয় না। শুধু নির্নিমেষ লক্ষ করে দোকানীকে।

ফলে দোকানীটি পুনরায় নিরাপত্তার অভাব বোধ করে এবং সন্ত্রস্ত হয়।

দুই নিরীহ কর্মহীন বৃদ্ধ ব'সে চা খাচ্ছিলেন আর সময় কাটাচ্ছিলেন এতক্ষণ। শঙ্করার উপস্থিতিকে তারা খুবই অশুভ ব'লে মনে করেন। চায়ের তলানীটুকু দ্রুত গিলে ফেললেন এবং দাম মিটিয়ে দোকান ত্যাগ করলেন।

শঙ্করা মনে মনে হাসে। তার রুক্ষ, অমার্জিত, চোয়াড় চেহারাটাকে এইসব সুখী-সচ্ছল মানুষগুলি কেন যেন সহ্য করতে পারে না কিছুতেই।

শঙ্করা সহজভাবে বলে—'দিন একটা কেক আর এক কাপ চা দিন।'

চা আর কেক আসে। শঙ্করা চা আর কেকের স্বাদ নেয়।

অদূরে, রেললাইনের পাশ ঘেঁষে, একটি জীর্ণ আস্তানায় একটা উদ্বাস্তু পরিবার দৃশ্যমান। একটি স্ত্রীলোক, এবং কয়েকটি উলঙ্গ অর্ধোলঙ্গ মানব-শিশু, সমবেত প্রচেষ্টায় সকাল-বেলার আহার-সংস্থানের কাজে ব্যস্ত। শুকনো ঝোপ-ঝাড়ের ইন্ধনে উনুনে আগুন জ্বালানোর কৌশলী প্রচেষ্টা। আগুন আর ধোঁয়ার সহাবস্থানের মাঝখানে ভাত বা কিছু তরকারির খোসা-চাপানো

একটি হাঁড়ি। এসব অঞ্চলের সব রেল স্টেশনেই এ-রকম কিছু পরিবার চোখে-পড়া অবধারিত। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর থেকে যার সূত্রপাত, ১৯৫১-এ তাতে আবার নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। এখন সেই বড় ঝাপটটা প্রশমিত, বানের জল যেমন সরে যায় তেমনি, কিন্তু এই সব পরিবার যেন আজন্ম উদ্বাস্তু। ভিটেমাটিহীন, নিরাশ্রয়, নিরালম্ব।

নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে থাকে শঙ্করা। তার দৃষ্টি এক উদাস বিষণ্ণতায় নিবদ্ধ থাকে স্বল্প দূরের ঐ অনিকেত পরিবারটির পথাশ্রয়ী ঘরকন্নার দিকে।

চায়ের দোকানী হয়ত এখন কিছুটা স্বস্তিতে স্থিত, শঙ্করার দৃষ্টির বিষণ্ণতা হয়ত ওকেও কিছুটা আপ্লুত করে। জিজ্ঞাসা করে—

—'দাদার কি এদিকি কোথাও থাকা হয় নাকি? নাকি বাইরে থেকে আস্‌তিচেন?'

অন্য সময় হ'লে শঙ্করা এ-জাতীয় অকারণ কৌতূহলী প্রশ্নে অধিকতর একটি অকারণ জবাব দিয়ে বসত। কিন্তু এখন তার মন নিরুত্তাপ। বলে—'এখানেও থাকি, বাইরেও থাকি।'

বস্তুত এ জাতীয় জবাব নিশ্চিত কোনো অর্থ প্রতিপন্ন করে না। ফলে এই অনিশ্চিতি শঙ্করা সম্পর্কে দোকানীকে আরো সন্দেহ-গ্রস্ত করে।

একটু বাদে শঙ্করাই যেচে আলাপ করে—

—'এ-চায়ের দোকান আপনি কতদিন দিয়েছেন, এর আগের বার যখন আসি, তখন তো দেখিনি।'

দোকানী এ-প্রশ্নের কোনো গভীরতর উদ্দেশ্য আছে কিনা, অনুধাবন করতে পারেনা। তবু বলে—'মাস তিনেক হলো দোকান দিছি। এ ছাড়া বাঁচার আর কোনো উপায় পালাম না।'

শঙ্করা বলে—'এ তো রেলের জায়গা। এখানে আপনি কতদিন থাকতে পারবেন? রেল-পুলিশ তো তুলে দেবে?'

—'দিলি দেবে। কি আর করব ক'ন? পাঁচিশ বছর ধ'রে তো ভা'সে ভা'সে বেড়াচ্ছি, আবার না হয় ভাসব। ওডারে কপাল বলেই মা'নে নিছি।'

—'আপনি রিফিউজি? একাত্তরের, না একেবারে সাতচল্লিশের বিফিউজি?'

শঙ্করার কথায় দোকানী এবার একটু বুঝি বা প্রশ্রয় পায়, হাসে। বলে—'তা দাদা, ঠিকই কইছেন, আমি শুধু রিফিউজি না—এহেবারে কুলীন রিফিউজী।'

শঙ্করা এবং দোকানীর মধ্যেকার ব্যবধানের পাঁচিলটা যেন ক্রমশঃ স্বচ্ছতা পায় এবং আন্তরিকতার স্পর্শ লাগে কথাবার্তায়।

শঙ্করা বলে—'এতদিন এসেছেন আপনি, জমি-জায়গা, ঘরবাড়ী কিছু করতে পারেন নি? থাকেন কোথায় আপনি?'

উদাস এক বিষণ্ণতা আচ্ছন্ন করে দোকানীকে—

—'জমি জায়গা ঘরবাড়ী আর করতি পারলাম কই? কতো ক্যাম্পে যে ঠ্যালা খাইয়ে বেড়াইচি। পশ্চিম বাংলার কোনো জা'গায় পুনর্বাসন পাইনি। তারপরে, এক দলের সাথে চলে গিলাম দণ্ডকারণ্যে। সেহেনেও ঐ ক্যাম্পের জীবন। হপ্তার ডোল তোলো—আর খাও। কোনো কাজ নেই। জাল বোনা, তাস খেলা, আর পরনিন্দে, পরচর্চা। আমার কথা ছাড়ান দ্যান্, কতো জোয়ান জোয়ান ছ্যামড়ারা এই ক'রে আল্‌সে, অকর্মণ্য হয়ে গেল। এদের ঠিকমতন কাজে লাগাতি পারলি কত কাজই না হত!'

—'কেন, দণ্ডকারণ্যে তো অনেকে পুনর্বাসন পেয়েছে শুনেছি।'

—'তা পাইচে। কিন্তু কারো মন টিকতি চায়না। আমরা পূব-বাংলার মানুষ, ও-জা'গায় আমাগের মন টেকবে কেন? তয়, কেউ কেউ এট্রু গোছায়ে নেছে। আমি কিছু করতি পারিনি। তিনডে মাইয়ে ছেলো। তা তিনডেরেই কোনোমতে পর-ঘরি ক'রে দিতি পারিচি। এখন আমরা দুই বুড়োবুড়ি। 'জয়-বাংলার' বছরে ভাবিলাম, দ্যাশে ফিরে যাই। এহোন তো আর পাকিস্তান নেই। এহোন 'বাংলাদেশ' হইচে। তা, যাবো বললিই কি আর যাওয়া যায়। জমি-জা'গা সব বেহাত হয়ে গেছে। দ্যাশে গেলিও তো আবার সেই আগাছার মতোন ভা'সে বেড়ানো। কোনো উপায় না পাইয়ে এই চায়ের দোকান দিচি। দোকানের পেছনে ছাবড়ার তলায় বুড়োবুড়ি থাকি। একর'ম চলতিচে।'

—'কিন্তু কতোদিন এভাবে থাকতে পারবেন? পুলিশ কি থাকতে দেবে?'

—'উঠোয়ে দিলি—চলে যাব। কি আর করব বলেন। আমাগের কথা ভাবার তো আর কেউ নেই। আবার এইরকম রেল লাইনের ধারে কোনো জাগায় ঘর বাঁধার চেষ্টা করব। বাঁধা ভিটের কপাল যে আর কোনোদিন ভগমান দেবে, তা তো মনে কয়না।'

সকালেব শীতেব নরম রোদে ক্রমশঃ তাপ ঘনায়। বেলা বাড়ছে। রেললাইনের উন্মুক্ত, প্রশস্ত পারিপার্শ্বিকতায় উজ্জ্বল রোদের আভা।

শঙ্করা উঠে দাড়ায়। প্যান্টের পকেট থেকে মানিব্যাগ বের ক'রে খাবারের দাম মেটায়।

কিছুক্ষণের স্বচ্ছন্দ আলাপচারিতায় দোকানীর মন এখন শঙ্করা সম্পর্কে প্রায় অনাড়ষ্ট। তবু সে মাঝে মাঝে আড়চোখে শঙ্করাকে দেখে। এই অপরিচিত হঠাৎ-আসা যুবাটির কার্যকলাপ, কথা-বার্তায় কোনো উদ্দেশ্য সংগুপ্ত আছে কিনা, অনুধাবনের চেষ্টা করে।

মাথা নীচু ক'রে শঙ্করা নাতি-উচ্চ চালাঘরটি থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর রেল লাইন ধরে অন্যমনস্ক হাঁটতে থাকে স্টেশনের দিকে।

আর তখনই দোকানীটি একটি আকস্মিক চমক অনুভব করে। তার এই চমকের কারণ, শঙ্করার দেহের একটি বৈশিষ্ট্য-চিহ্নের প্রতি তাঁর আকস্মিক দৃষ্টিপাত। শঙ্করার কানের পিছনে ঘাড়ের উপরে প্রায় ইঞ্চি চারেক লম্বা একটি সাদা জড়ুল। শঙ্করার টান টান উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের দেহ-ত্বকে ঐ সাদা জড়ুলটি সহজেই দৃশ্যমান। রঙের বৈপরীত্যে জড়ুলটি সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং শঙ্করার চেহারাটি তার নিজস্ব উগ্র তীক্ষ্ণতার সঙ্গে আরো একটি বৈশিষ্ট্য-চিহ্ন নিয়ে মুদ্রিত হয় দর্শকের চেতনায়।

কিন্তু চায়ের দোকানীটির মনে নিছক কৌতূহল নয়, সেই কৌতূহলের সঙ্গে বহুদূরাগত এক স্মৃতি যুক্ত হয়ে তাকে বিস্মিত এবং বিহ্বল করে। তার মন অনুসন্ধানী হয়।

সেই সন্ধানী সূত্রে একটি সদ্যোজাত শিশুর স্মৃতি ভাসে তার মনে। সেই শিশুটির ঘাড়ের উপরেও ছিল অবিকল এমনই এক জড়ুল-চিহ্ন।

অকুস্থল পাশেরই এই রেল স্টেশন। ১৯৪৭ এর দেশভাগের অব্যবহিত পরেকার কথা। বাস্তুভিটে, জমিজায়গা সব কিছু ফেলে রাতের অন্ধকারে, চুপিসাড়ে মানুষ তখন প্রাণের মায়ায় এক ক্ষিপ্র পলায়নকারী। ও বাংলা থেকে পালিয়ে আসছে এ-বাংলায়। দলে দলে মানুষের সে যেন এক মহাযাত্রা। হত্যা, ঘর জ্বালানো, লুঠ, নারীধর্ষণ—সভ্যতার ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়।

দেশত্যাগের সেই অনিশ্চিত মহাযাত্রার স্রোতে ভাসতে বাধ্য হয়েছিল যশোরের প্রান্তবর্তী এক চাষী। গোপাল মণ্ডল। গোপাল মণ্ডল এখন আর চাষী নয়। সরকারী খাতায় সে এখন নিতান্তই এক রিফিউজী। পরাশ্রিত, পরান্নজীবী। সম্প্রতি বাঁচার তাগিদে রেললাইনের গা ঘেঁষে রেলের জমিতে এই অস্থায়ী চায়েব দোকানটি তুলেছে। চায়ের দোকানী গোপালের মনে এখন সেই সব স্মৃতি বড়ো মমতায় ভাসমান হয়।

স্ত্রী আর কোলের শিশুকন্যাকে নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে গোপাল এসে আশ্রয় নিয়েছিল এই রেল স্টেশনটিতে। দলে দলে উদ্বাস্তুর মহা সঙ্গম-ক্ষেত্র। মানুষের ভিড়ের সে এক পিণ্ডাকার রূপ। পরনে জীর্ণ বেশ, নিরন্ন পেট, কারো বা স্বজন-হারানোর বেদনা—চারিদিকে ভবিষ্যৎহীন এক নিরূপায় শূন্যতা। এরই মধ্যে স্টেশনে টিনের শেডের তলায়, বিস্তর চেষ্টায় হাত তিন চার আশ্রয়-ভূমির দখল নিতে পেরেছিল গোপাল।

সমগ্র স্টেশন-এলাকাটি তখন যেন প্লাবন-তাড়িত দ্বীপখণ্ড, যে কোনো মুহূর্তে সমূহ নিমজ্জনের আশঙ্কা। প্রতিদিনই নতুন নতুন ছিন্নমূল মানুষদের আগমন ঘটছিল। নোয়াখালি, কুমিল্লা, ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, যশোর,—বিচিত্র এক সহাবস্থান।

স্টেশনের টিনের শেড, অস্থায়ী ক্যাম্প, সরকারী রিলিফের খিচুড়ি-অন্ন—সেই সুবিশাল আশ্রয়-হীনতা আর অপরিসীম ক্ষুধাতে সামাল দেয়ার পক্ষে ছিল একান্তই অপ্রতুল। সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় সরকারী ক্যাম্প বসান হ'ল। সংখ্যাগোনা, নামলেখা—নামলেখা, সংখ্যাগোনা —ক্যাম্পে ক্যাম্পে নতুন বাসভূমি। স্টেশনের টিনের শেডের তলা থেকে দু'জন যদি স্থানান্তরিত হয়, পাঁচজন তার দখল নেয় ফের।

এমনই এক বিপর্যয়ের দিনে, এক বাদুলে সন্ধ্যায় খুলনার এক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসেছিল একটি দল। উদ্বাস্তু মাত্রই তখন দিশেহারা, বিতাড়নের শঙ্কাচ্ছন্ন। কিন্তু এই দলটির বিপর্যয় যেন তুলনাহীন। পুরুষগুলো যেন বাজে-পোড়া নিষ্পত্র তালগাছ, মেয়েগুলোর দু'চোখে সর্বস্ব হারানোর ভীতির পরিণামী এক নিরালম্ব শূন্যতা। তাদের সামগ্রিক উপস্থিতিতেই প্রতিফলিত হচ্ছিল—অত্যাচারের কী ভয়ঙ্করতাকে তারা অতিক্রম করে এসেছে। নিঃসম্বল, ত্রস্ত, বিধ্বস্ত কয়েকটি নারী পুরুষ শিশুর সীমান্ত পেরোনো ঐ দলটি এসে আশ্রয় নিয়েছিল স্টেশনের শেডের তলায়।

এই দলেই ছিল একটি বউ। প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবার, প্রতিটি ব্যক্তিমানুষ তখন নানাবিধ অত্যাচারের অভিজ্ঞতার বাহক, কিন্তু এই বউটির নিপীড়ন-কাহিনী যেন সকলকে বোবা বানিয়ে দিল। পশুশক্তি যখন পাশব অত্যাচারে মত্ত হবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওর উপর, ওর দুঃসাহসী স্বামী, এক তরুণ চাষী, নিজের দু'বাহুর শক্তি আর ভালবাসাকে আশ্রয় ক'রে রুখে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সেই প্রতিরোধ বিপক্ষের সাম্প্রদায়িক পশুশক্তিকে আরো হিংস্র করেছিল। নিপুণ ঘাতকতায় কণ্ঠনালী ছিন্ন করেছিল সেই সাহসী তরুণের সম্মিলিত পশুবাহিনী কাম-লালসায় উপভোগ করেছিল শোকার্তা তরুণী বধূটির প্রায়-অচেতন দেহটিকে। অন্তঃসত্ত্বা বধূটিকে আবদ্ধ ক'রে রেখেছিল তাদের গোপান আস্তানায়।

তারপর একদিন ওদের অসতর্কতা কিম্বা অবহেলার সুযোগে—যেহেতু বধূটি তখন ক্রমিক অত্যাচারে স্বাস্থ্যহীনা, ভোগ্যা হিসেবে অপাংক্তেয়, পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। গর্ভিণী বধূটি পাগলের মতো ছুটেছিল দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য, যাত্রাপথে সাক্ষাৎ পেয়েছিল আর একটি দলের, যারাও ছিল সমানভাবে উৎপীড়িত। সেই উচ্ছিন্ন, অত্যাচারিত, অপরিচিত দলটির সঙ্গে কী এক

অমোঘ শক্তিতে বধূটি অতিক্রম ক'রে এসেছিল সীমান্তের দীর্ঘ পথ। অবশেষে আশ্রয় পেয়েছিল স্টেশনের এই জনারণ্যের আশ্রয়হীনতায়। সকলেই তখন আশ্রীয়প্রার্থী, শরণার্থী। কে কাকে আশ্রয় দেয়! কিন্তু তবু গোপালের স্ত্রী মালা তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। পরম মমতায় ভগিনী স্নেহে কাছে টেনে নিয়েছিল নিঃসহায়, নিষ্পর সুবালাকে।

সুবালার মধ্যে কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীনতার লক্ষণ দেখা দিল। যে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মধ্যে তাকে কাটাতে হয়েছে সদ্য অতিক্রান্ত দিনগুলি, যে দুঃস্বপ্নের স্মৃতি তাকে এখনো প্রতি মুহূর্তে তাড়িত করে, তাতে এ পরিণাম তার পক্ষে একান্ত সম্ভব। কখনো আর্ত ত্রাসে 'বাঁচাও বাঁচাও' ব'লে আর্তনাদ, কখনো দীর্ঘকালীন বাক্যহীন বিহ্বলতা—এমনি সব নানাবিধ অসঙ্গতির মধ্যে সুবালার পাগলামি প্রকাশ পেত। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, স্থানকাল—সবকিছু সম্পর্কেই সে যেন তখন বিগতস্পৃহ। কিন্তু যখন এই বিহ্বলতার ঘোর তার মধ্যে থাকত না, তখন সে শান্ত, বাধ্য, লজ্জাশীলা একটি বধূ।

এদিকে তার প্রসবের দিন অনিবার্য নিয়মানুসারে সমীপবর্তী হচ্ছিল। সুবালার সব দায়িত্ব স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়েছিল গোপাল আর মালা। সরকারী ডাক্তারবাবু এলে তাদের সাধ্যানুযায়ী আবেদন-আকুতি জানিয়ে এই নিষ্পর হতভাগিনী বউটির জন্য তারা ওষুধ-পত্রাদি সংগ্রহ ক'রে এনে দিত। স্টেশনের এই শেডের তলাটি সকলেরই স্বল্পকালীন বাসস্থান, সরকারী নির্দেশ এলে পরিবারসুদ্ধ কোনো ক্যাম্পে চলে যাওয়াটা ছিল বাধ্যতামূলক। কিন্তু সুবালার একটা কিছু ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত গোপাল আর মালা কোথাও যেতে পারেনি। সরকারী বাবুদের হাতে পায়ে ধ'রে এ অনুমতিটা তারা সংগ্রহ করেছিল। হতভাগিনী সুবালার প্রতি সকলেই ছিল কিছুটা সহানুভূতিশীল। সুবালার প্রতি গোপাল এবং মালার এই নিঃসম্পর্কিত আত্মীয়তার স্নেহার্তি, যত্ন এবং উদ্বেগটুকুকে সবাই শ্রদ্ধার চোখে দেখত।

কয়েক মাসের ব্যবধানে স্টেশনের এক কোণে নামমাত্র আব্রুরক্ষাকারী চটঘেরা আঁতুড়-ঘরে সুবালার কোলে এসেছিল সন্তান, একটি পুত্র-সন্তান। সুবালার মানসিক ভারসাম্য শেষ দিকে অনেকটাই স্থিত হয়েছিল, ছেলে কোলে পেয়ে তার পূর্ণ সুস্থতাও ফিরে এলো। সুবালার সুস্থ সন্তান-প্রসব সম্পর্কে অনেকেই ছিল সন্দিহান, কিন্তু ব্যাপারটা ভালোয়-ভালোয় মিটে গেলে সকলেই যেন স্বস্তিতে শ্বাস নিল মালা তার নিজ গর্ভজাত সন্তানের মতোই সুবালার ছেলেটিকে পরিচর্যা করল।

কয়েক দিনেই আবিষ্কার করা গেল, শ্যামবর্ণ নধরকান্তি নবজাতকটির কানের পিছনে ঘাড়ের উপর একটি সাদা জড়ুল। সুবালার ছেলেটি এমনিতেই স্টেশনের উদ্বাস্তুদের কাছে ছিল কৌতূহলের বিষয়, শরীরের এই নতুন চিহ্নটি তাকে আরো আকর্ষণীয় করল। যে যার সংস্কার, বিশ্বাস অনুযায়ী জড়ুলটির ব্যাখ্যা দিল, এর শুভাশুভ সম্পর্কে নানা লৌকিক এবং অলৌকিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করল।

উদ্বাস্তুদের মধ্য থেকে কেউ একজন তার নামকরণ করল—'শঙ্কর', সুবালার কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে বাপের সঙ্গে পদবী মিলিয়ে—'শঙ্কর মণ্ডল।'

এর কিছুদিন বাদেই গোপাল আর তার স্ত্রী মালাকে ধুবুলিয়া ক্যাম্পে স্থানান্তরিত করেছিলেন সরকারী উদ্বাস্তু-ত্রাণের কর্মকর্তারা। সুবালা আর তার ছেলে যাবার অনুমতি পায়নি। গোপাল আর মালা ধুবুলিয়া ক্যাম্পের সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রার মধ্যেও বারবার সুবালা আর তার ছেলেটির

কথা স্মরণ করত, নিষ্পর মানুষও যে কেমন আপন হয়ে যেতে পারে, এসব ভেবে অশ্রুপাত করত। কিন্তু কোনোদিনই আর সুবালা বা তার ছেলের সঙ্গে দেখা হয়নি।

সদ্যোজাত সেই শিশুটি, ঘাড়ের কাছে যার ধবল জড়ুল, স্টেশনের রক্তসম্পর্কহীন আত্মীয়রা যার নাম দিয়েছে শঙ্কর—তার বর্তমান চেহারাটাকে শনাক্ত করতে পারাটা গোপালের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু এই যুবকটির ঘাড়ের কাছের ঐ সাদা জড়ুলটি যেন অনিবার্যভাবেই সেই হতভাগিনী সুবালার ছেলেটির কথা মনে করিয়ে দেয়।

গোপাল একবার ভাবে, ডেকে ছেলেটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু ভরসা পায়না। কোন্ ঘটনার কি প্রতিক্রিয়া হয়, এবং কোথাকার জল কোথায় গড়িয়ে কি বিপত্তি বাধায়, এসব ভেবে সে নিরস্ত হয়। শুধু বাইরে বেরিয়ে রেল লাইন বরাবব তাকিয়ে থাকে অপলক। দীর্ঘ যুবাটি খোয়া-বিছানো রেললাইনের পার্শ্ববর্তী বহমান পায়ে-চলা পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে উদাস, অন্যমনস্ক। যুবাটিকে দেখতে দেখতে আপন অজান্তে একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ে গোপালের। অতীতের স্মৃতি ওর ‐নে বিষণ্ণ ছায়া ফেলে।

স্টেশনে ফিরে এসেছিল শঙ্কবা। মনেব ভিতরে কি এক জ্বালা, যা ওকে কোথাও তিষ্ঠুতে দেয় না। তবু স্টেশনের কোণের দিকে কাঠের বেঞ্চে ঝিম্ মেরে বসে ছিল খানিকক্ষণ। এখন স্টেশন অপেক্ষাকৃত ফাঁকা, ট্রেন ঢোকার বা ছাড়ার মুখে হয়ত আবার ভিড় বাড়বে। এক আগ্রাসী শূন্যতার বোঝা বুকে নিয়ে কেটে গিয়েছিল খানিকক্ষণ। অদূরে একপাল ভিখারী ছেলে প্লাটফর্মের বাঁধানো চত্বরে ‐ক্কা-দোক্কা খেলছিল। শঙ্করার উদাস, অন্যমনস্কতা সেখানে কিছুটা নিবদ্ধ থাকে।

দেখতে দেখতে তা‌র মনে ভাসে এক শৈশব, যা সে অনেককাল আগে ফেলে এসেছে। সেই দিনগুলোতে ঐ ভিখারী ছেলেগুলোর মধ্যে তারও স্থান ছিল। ওদের দেখতে দেখতে সেই স্মৃতি নৈকট্য পায়। স্টেশনেব যাত্রীদের কাছে ভিখ্-মাঙা, ভিক্ষার পয়সায় দোকান থেকে কিছু কিনে খাওয়া, আর সব ভিখারী ছেলেদের সঙ্গে এক্কা-দোক্কা খেলা, রাত হ'লে স্টেশনের কোনো দেয়ালের পাশ ঘেঁষে ঘুমিয়ে থাকা। মাথাব উপরে শাসন করার বা আদর করার কেউ নেই, ভিখারী ছেলেগুলোর সঙ্গে কখনো ভাব-ভাব, কখনো চুলোচুলি।

এই সব ভাবনার পথে তার মনে ভাসে এক নারীর মুখ, আবছা অস্পষ্ট, যাকে সে 'মা' বলত। সেই নারী তাকে বড়ো স্নেহে আগ্‌লে রাখত, খাওয়াত, কাঁদলে ‐কালে নিয়ে আদর ক'রে ঘুম পাড়াত। তখনও মা-ছেলের আশ্রয় ছিল এই স্টেশনই, তবু মার কোলটুকু যেন বড়ো নিরাপদ ছিল। বড়ো মায়াময়।

তারপব একদিন 'মা' নামক সেই মমতাময়ী নারীটি হারিয়ে গেল তার জীবন থেকে। নিষ্ঠুর পৃথিবীতে বড়ো একা হয়ে গিয়েছিল শঙ্করা। তারপর একটু একটু ক'রে নিজেই বাঁচার পথ আবিষ্কার করেছিল, শিখেছিল ভিক্ষা করতে। ভিক্ষার পয়সার বিনিময়ে কি ক'রে দোকান থেকে খাবার কিনতে হয়, রপ্ত করেছিল সে কৌশল।

তাবপব, সাত ঘাটের জলে নানাবিধ নাকানি-চোবানি খে‌তে খেতে, বড়োই আশ্চর্য, আজও বেঁচে ‐াছে শঙ্করা, এবং বড়ো হয়েছে এতোটা। এই বেঁচে থাকা, এবং বেঁচে থাকার জন্য দিনরাত নানা ‐কৌশলী সতর্ক পদক্ষেপ মাঝে মাঝেই অসহিষ্ণু ক'রে তোলে শঙ্করাকে। এগুলোকে মনে হয় অর্থহীন। কিন্তু এর বিকল্প কোনো পদ্ধতি তার জানা নেই। ফলে, তার এই অক্ষমতার যন্ত্রণা মাঝে মাঝে মাত্রাহীন মনে হয়।

'বাবা' পরিচয়ের কোনো ব্যক্তির স্মৃতি তার নেই। ছোটবেলায় মা নামক যে নারীটিকে চিনত, যার কোলের আশ্রয়টুকু শঙ্করার কাছে সেই বয়েস ছিল অপরিহার্য, সেই নারীটিকেও শঙ্করা

এখন আর কোথাও খুঁজে পায় না। অথচ তার সব কাজের মধ্যেই এই খোঁজাটুকুও নিঃশব্দে সক্রিয় থাকে। কিন্তু তার কোনো প্রচেষ্টাই কার্যকরী হয়না।

হারানো মাকে খুঁজে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনার সূত্রই শঙ্করার জানা নেই। এই সব শূন্যতা তার মনে ক্ষত সৃষ্টি করে। নিরালা অবসরে সে ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হয়।

স্টেশনের বেঞ্চে এখন সে একা, নিঃসঙ্গ,এবং এসব ভাবনা তাকে জারিত করছিল। কুরে কুরে খাচ্ছিল নিঃশব্দে। তন্ময়তার ঘোরে পাশ ফেরে এবং দেখে, এক রোগা ভিখারী ছেলে, হাতখানা শঙ্করার দিকে প্রসারিত, মিন্ মিন্ ক'রে বলছে —

— 'দশটা নয়া দেবেন বাবু?'

এক্কা-দোক্কার আসর থেকে কখন বেরিয়ে এসেছে ছেলেটি। খেলার মধ্যেও জীবিকার ব্যাপারটি সক্রিয় থেকেছে মস্তিষ্কে এবং বিশ্রামরত বাবুটির মনে সঠিকভাবে করুণা উদ্রেক করাতে পারলে যে কিছু পয়সা মিলবে, এ-বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়ে প্রত্যাশার হাতটি প্রসাবিত ক'রে রেখেছে।

শঙ্করা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ছেলেটিকে।

বছর পনেরো ষোলো আগেকার বালক-শঙ্করার মূর্তিটি অবিকল যেন ওর চোখে ভাসে। ওই ডিগডিগে শরীর, শীর্ণ হাত, ভিক্ষার প্রত্যাশায় কুণ্ঠিত দৃষ্টি। নির্ভেজাল আত্ম-প্রতিকৃতি।

অকস্মাৎ এক চণ্ডাল রাগ যেন শঙ্করাকে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য করে। সটান উঠে বসে এবং প্রচণ্ড ধমক লাগায় —

— 'পালা, পালা এখান থেকে।'

বেগতিক দেখে ছেলেটি দ্রুত সরে যায়, কিন্তু পালায় না। খানিকদূব গিয়ে বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকায় শঙ্করার দিকে, খারাপ একটি গালাগালি দেয় এবং মুখ ভ্যাংচায। তারপব দ্রুত ছুটে গিয়ে মিশে যায় দলের সঙ্গে।

আরো কিছুক্ষণ বসে থাকে শঙ্করা। শীঘ্রই হয়ত কোনো ট্রেন আসবে, স্টেশনে যাত্রীব সংখ্যাধিক্য ঘটছে। এখানে আর দীর্ঘক্ষণ অবস্থান শঙ্করা নিরাপদ মনে করল না। অদূরে স্টেশন-মাস্টারের ঘরের সামনে দাঁড়ানো দুই রেল পুলিশ ডিউটি দিচ্ছে, মাঝে মাঝে আড়চোখে তাবা লক্ষ রাখছে শঙ্করার দিকে। শঙ্করার বয়সী বহু ছেলেই এখন উগ্রপন্থী নকশালী কার্যকলাপে লিপ্ত, এবং এ-বয়সী যে কোনো ছেলেই পুলিশের চোখে সন্দেহভাজন। এই কাল-ধর্ম অনুযায়ী স্টেশন-বেঞ্চে দীর্ঘক্ষণ অকারণ অবস্থানকারী শঙ্কবা রেল পুলিশদ্বযের মনোযোগের কেন্দ্র-বিন্দু হয়ে উঠছিল।

শঙ্করা উঠে দাঁড়ায় এবং আড়মোড়া ভাঙে। একটা ট্রেন ঢোকে স্টেশনে। একটু বাদেই ট্রেনটা কলকাতাগামী হবে।

সামনে যে কামরাটা পেয়েছিল, তাতেই উঠে বসেছিল শঙ্করা। জানালার পাশে একটা ফাঁকা সিটে বসেছিল। একজন দু'জন ক'রে যাত্রী উঠে ফাঁকা সিটের দখল নিচ্ছিল। সেই ক্রম-বর্ধমান যাত্রীদের মধ্যে প্লাটফর্মের উপর আরো দু'একটি ভিখারী বালকের সঙ্গে শঙ্করা দেখতে পায় সেই ভিখারী ছেলেটিকে, যে পয়সা না পেয়ে ওকে ভেংচি কেটেছিল।

শঙ্করা ওর দিকে এবার প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে তাকায়, জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে কাছে ডাকে। সন্ত্রস্ত ভাবটা সামলে এগিয়ে আসে ছেলেটি এবং প্লাটফর্মের নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে শঙ্করার দিকে হাতটি প্রসারিত করে দেয়। পকেটে হাত দিলে শঙ্করার হাতে উঠে আসে একটি আস্ত আধুলি এবং সেটি সন্তর্পণে শঙ্করা রাখে ছেলেটির প্রসারিত মলিন কচি হাতখানার উপর। ছেলেটি

একবারও ঘাড় সোজা করে না, পয়সাটা মুঠো ক'রে ধরে, এবং নিঃশব্দে সরে যায় শঙ্করার সামনে থেকে।

শঙ্করার দুই চোখের জমিতে তীব্র এক জ্বালা তাপ ছড়ায়।

তারপর একসময় সচল হয়েছিল ট্রেন। দু'পাশের দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে, কখনো বা অলস তন্দ্রার ঘোরে, যাত্রী-সাধারণেব ভিড়-ভাট্টা ওঠা-নামা ইত্যাদি সম্পর্কে নিস্পৃহ উদাসীনতায় মগ্ন থেকে শঙ্করা ক্রমশঃ তার নিজস্ব স্টেশনটির সমীপবর্তী হয়।

।। ছয় ।।

আর গোটা কয়েক স্টেশন অতিক্রম করলেই নামতে হবে শঙ্করাকে। ঘন্টা দুয়েক আগের সেই নিস্পৃহ উদাসীনতা, নিস্তেজ জাড্য এখন তার মন থেকে সম্পূর্ণ অপসৃত। দৃষ্টিতে ফিরে এসেছে সতর্ক কুটিলতা, স্নায়ুতে প্রত্যাশিত টান্ টান্ অনুভব। এবং আকস্মিকভাবে, স্টেশনে অবতরণের সময়টি ঘটনাবহুল হ'ল।

কামরাটিতে এখন যাত্রীসংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত না হলেও, সীমিতও নয়। বসবার আসন সব পূর্ণ তো বটেই, দুই বেঞ্চের মাঝখানের গলিতেও দু'একজন যাত্রী দাঁড়িয়ে। উপরের লম্বা বাঙ্কে পোঁটলা-পুঁটলি, ব্যাগ-ব্যাগেজের সহাবস্থান। 'চোর-জুয়াচোর-পকেটমার নিকটেই আছে'— জাতীয় সতর্কীকরণ লিখিতভাবে কোথাও ঘোষিত না থাকলেও নিজস্ব মালিকানার দ্রব্যটি সম্পর্কে সবাই সচেতন, ওঠা নামার হিড়িকে কারো কোনোটি বেহাত না হয়।

বাঙ্কের সেই পোঁটলা-পুঁটলি ব্যাগ-ব্যাগেজের সার্বজনীন মেলায় ছিল গোটা দুয়েক সাপের ঝাঁপি, রিফুকর্ম-করা পাতলা কাঁথার মতো কাপড় দিয়ে ঝাঁপি দুটি আলগাভাবে ছিল আবৃত, যার ফলে ঝাঁপিদুটির বাহ্যিক চেহারা যাত্রীদের দৃষ্টিগম্য ছিল না। সাপুড়েটি কাছেই ছিল, দীর্ঘ যাত্রাপথে বেঞ্চের এক পাশে কখন্ বসতে পেরেছিল, এবং সারা সকাল দুপুর এখানে-সেখানে সাপ খেলা দেখিয়ে রেলযোগে প্রত্যাবর্তনের পথে কিছুটা বা ক্লান্ত, গাড়ীর দুলুনিতে সঙ্গতি রেখে একটু আধটু ঝিমিয়ে নিচ্ছিল।

কিন্তু আকস্মিক ঘটল এক বিপর্যয়। অন্য কোনো ব্যাগের ধাক্কাতেই হোক, বা গাড়ীর ঝাঁকুনিতেই হোক, একটি ঝাঁপি বাঙ্কের উপর থেকে ছিটকে পড়ল মেঝেয়। ঝাঁপিটির আবরণ বা তার মুখের বাঁধন — কোনোটিই যথেষ্ট মজবুত না থাকায় ডালাটি স্থানচ্যুত হ'ল। এবং ঝাঁপির অভ্যন্তরে এতক্ষণ যে তার বিশাল দীর্ঘ শরীরটি নিয়ে কুণ্ডলীকৃত ছিল, সেই সরীসৃপটি এবার মুক্তির আনন্দে মেঝের পরে ফুট দুয়েক উচ্চতায় ফণা মেলে গজরাতে লাগল।

নিমেষে গাড়ীর মধ্যে এক বিষম প্রলয়ঙ্কর অবস্থা। নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ব্যস্ততা, হুড়োহুড়ি। কেউ সিটের উপর উঠে দাঁড়ায়, কেউ বাঙ্কের উপর উঠতে সচেষ্ট, কেউ বা ঝুলতে লাগল হাতল ধ'রে। একজন আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল — 'ও বাবা' সাপুড়ে, কোথায় গেলে, তোমার সাপটাকে ধরো বাবা'। সেই ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়,—আরো অনেকের কণ্ঠে—

— 'কোথায় গেলে বাবা সাপুড়ে, তাড়াতাড়ি ধরো সাপটাকে—, না হলে যে খেয়ে ফেলবে আমাদের।'

বেঞ্চের কোণে গুটি-সুটি সাপুড়েটির এই হৈ হট্টগোলে আকস্মিক তন্দ্রা ভাঙ্গে এবং অবস্থাটা অনুধাবনের চেষ্টা করে। মেঝের দিকে নজর পড়তেই বোধগম্য হয় সমস্ত ব্যাপারটা। দ্রুত উঠে আসে সে।

বেসামাল, সন্ত্রস্ত যাত্রীদের কাছে ছিন্নবেশ মলিন সাপুড়েটি তখন যেন এক দেবদূত। সকলের করুণ আবেদন উচ্চারিত হয় তার উদ্দেশে — 'বাঁচাও বাবা, বাঁচাও।'

সাপুড়েটি এবার আর ব্যস্ত হয় না, ধীরে সুস্থে সকলের দিকে একবার তাকায়, একগাল হাসে, বলে—

—'ভয় নাই কত্তামশায়রা, ভয় নাই মা জননীরা, এ আমার আদরের খোকা, মা মনসার বাহন, কিচ্ছু কইবে না আপনাগো, ওনার বিষদাঁত ভাঙাই আছে।'

গোখরোটি তখনো তার বিশাল ফণা মেলে হেলছে দুলছে, আর মেঝের বুকে আছড়ে পড়ে ছোবল মারছে। সে দৃশ্যে যাত্রীদের চোখে দ্বিগুণতর হয় আশঙ্কা।

সাপুড়ে ঝাঁপিটি এনে পাশে রাখল সাপটির। তারপর ধাঁ ক'রে ঘাড়ের দিকটা চেপে ধ'রে মাথাটা নামিয়ে দেয় ঝাঁপির বুকে। সুড়সড় ক'রে ঝাঁপির মধ্যে ঢুকে যায় সাপটা। ঝাঁপির চারপাশে দড়ির বাঁধন দৃঢ় করে সাপুড়ে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচে যাত্রীরা। বেসামাল, বিসদৃশ অবস্থান থেকে যে যার স্বস্থানে ফিরে আসে। এবং নিমেষেই ভিড়ের চরিত্র পালটায়। এতক্ষণ যারা ছিল প্রাণভয়ে ত্রস্ত, তারা এখন সাহসী বীরপুরুষ। যে এতক্ষণ ছিল পরিত্রাতা দেবদূত সদৃশ, সে এখন নিতান্তই একটি বজ্জাত, বেআক্কেলে সাপুড়ে।

—'এ্যাই শালা সাপুড়ে, গাড়ির মধ্যে সাপ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, দাঁড়া তোর মজা দেখাচ্ছি।' উৎসাহী সমর্থকের অভাব হয় না। পূর্বোক্ত বলশালী কণ্ঠস্বরটির সমর্থনে কোরাস শোনা যায়— 'হ্যা দাদা, লাগান তো কয়েক ঘা, গাড়িতে সাপ নিয়ে যাওয়ার মজা টের পাক ব্যাটাচ্ছেলে।'—

সাপুড়েটিকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য নিশ্চিত একটি গ্রুপ তৈরী হয়ে যায়। ওদিকে যাত্রীদেব অনেকেই তখন স্বস্থানে ব'সে, কে কোথায় কবে কত বড়ো সাপ দেখেছে, কোন্ সাপের বিষ কেমন, — ইত্যাদি নানাবিধ সর্প-বিষয়ক আলোচনায় নিবিষ্ট হয়। এদিকে শিক্ষাদাতা গ্রুপটি ক্রমেই সাপুড়েকে বৃত্তাকারে ঘিরে ধরে । আস্তিন গোটানোর পালা চলে। কিন্তু কেউই সাপুড়েকে প্রথম আঘাতটি করবার উদ্যোগ নিতে চায় না। অপাঙ্গে একবার তাকায়, সাপুড়ের ঝাঁপির দিকে, আর একবার তাকায়, সাপুড়ের দিকে। তারপর একজন সোৎসাহে হুঙ্কার ছাড়ে — 'কি হ'ল দাদা, লাগান না দু'ঘা।'

পাশ থেকে জবাব আসে — 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, লাগাতে তো হবেই, আপনিই লাগান আগে এক ঘা।'

এ জাতীয় চাপান উতোর চলতে থাকে। পরিস্থিতির জটিলতায় স্বাভাবিকভাবেই সাপুড়েটি ভীত হয়, চারিপার্শ্বস্থ যাত্রীদের দিকে হাত জোড় ক'রে করুণ মিনতিতে বলে—'দাদা বাবুরা, এবারকার মতো আমারে মাফ কইরে দেন, এমন কাজ আর কর্‌বনি কোনোদিন—এই কান মল্‌তাছি।'

প্রতিপক্ষের এ-হেন শোচনীয় নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে যুযুদান গ্রুপটির মানসিকতা দ্বিধা-বিভক্ত হয়। একদল সাপুড়েটিকে ক্ষমা ক'রে দেবার পক্ষপাতী, আর একদল, এভাবে দুষ্কৃতিকে প্রশ্রয় দেওয়া ভীরুতার নামান্তর, এ-জাতীয় সমাজ-সংস্কারমূলক বাক্যাবলীতে আস্ফালিত হতে থাকে। ফলে, সাপুড়ে লোকটি ক্রমশঃ গুরুত্ব হারায় এবং যাত্রীরা নিজস্ব বাদানুবাদে উত্তেজনা ছড়ায় পরিবেশে।

আকস্মিক ভাবে, সেই উত্তেজনায় ভিন্ন মাত্রা যুক্ত হয়।

যাত্রীরা যখন সাপুড়ে-কেন্দ্রিক বাদানুবাদে উত্তেজিত, অন্য বিষয়াদি সম্পর্কে অসচেতন, সিটে উপবিষ্ট কিঞ্চিৎ দূরবর্তী এক মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা আকস্মিক তীব্র চীৎকারে ঘোষণা করলেন— 'এই যে ও ভাই, আপনার পকেট থেকে ব্যাগ বের করে নিচ্ছে দেখেন।'

নিমেষে চঞ্চল হয়ে ওঠে জনতা। ভদ্রমহিলার উদ্দিষ্ট যুবাটি দ্রুত পাশ ফেরে এবং চেপে ধরে প্যান্টের হিপ পকেট। হাত সাফাইয়ের গুণে তার পকেট থেকে তখন সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসেছে মানিব্যাগটি। কিন্তু সবলে চেপে ধরায় সাফাইকারীর হাত থেকে তখন ব্যাগটি পড়ে গেল মাটিতে। অর্থাৎ পকেট মারটি ধরা পড়ল একেবারে হাতে-নাতে।

উত্তেজনার খোরাক হিসেবে একটা এলেবেলে সাপুড়ে অপেক্ষা একটা তরতাজা পকেটমার যে অধিকতর আকর্ষণীয় টার্গেট, সেটা প্রতিপন্ন হতে বিলম্ব ঘটল না। বছর কুড়ি বাইশের পকেটমার ছোকরাটির কর্মটি যে বিষম দুঃসাহসের তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, কিন্তু তার চেহারাটি নিতান্তই রোগা-প্যাংলা, প্যাকাটি-সদৃশ। কিন্তু সেই প্যাকাটি-সদৃশ যুবাটির উপর এবার অজস্রধারে বর্ষিত হতে লাগল কিল চড় ঘুষি। 'মার্ শালাকে, শেষ করে দে একেবারে'— এ জাতীয় বচনাদির মৌখিক প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতগুলিও সকর্মক থাকল। পকেটমার যুবাটি প্রাথমিকভাবে বাধা দানে কিছুটা সচেষ্ট থাকলেও অচিরেই প্রতিরোধ ক্ষমতা হারাতে বাধ্য হ'ল এবং নেতিয়ে পড়ে থাকল মেঝের উপর।

শঙ্করা ওর সিট থেকে উঠে এসে দাঁড়িয়েছিল একপাশে। দুর্বল, রোগাটে ওই ছেলেটির উপর সমবেত এলোপাথাড়ি নির্বিচার আক্রমণের প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওর বাস্তববোধকে সতর্ক করল এ-বিষয়ে বিরত থাকতে। এই মুহূর্তে পকেটমারটির সমর্থনে কিছু বলতে যাওয়ার অর্থই হ'ল, সমর্থনকারীকেও ওর দলভুক্ত মনে করা হবে এবং নিশ্চিত ওই নির্বিচার হাটুধে প্রহার নেমে আসবে। সুতবাং, বাধ্য হয়েই শঙ্করা নিশ্চেষ্ট থাকল এবং নজর রাখল পরিস্থিতির দিকে।

ভিড়েব পাশ থেকে একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'ও দাদাবা, মারবেন ব'লে কি এই রকম ক'রে মারবেন? এখন ওই ছেলেটা যদি মারা যায়, তখন কি করবেন? পুলিশ কিন্তু আপনাদেরই ধরবে।'

সেই মারমুখী হিংস্র গ্রুপটা এ উক্তিতে আকস্মিক চমক খায়। অবস্থার গুরুত্ব অনুভব করে। একজন তার পাশের জনকে দেখিয়ে বলে —' ইনিই সবচেয়ে বেশী মেরেছেন। বুট জুতো দিয়ে আট দশটা লাথি মেরেছেন।'—

—'আর আপনি বুঝি ধোঁয়া তুলসী গঙ্গা জল? তাই না? সমানে যে ঘুষির পর ঘুষি চালিয়ে গেলেন, তাতে বুঝি কিছু হয়নি?'—

শুরু হয়ে যায় পারস্পরিক বাদানুবাদ, দোষারোপ। প্রত্যেকেই প্রমাণ করাব চেষ্টা করে, সে মারলেও তার আঘাত এমন কিছু গুরুতর নয়, অন্যেরা যা করেছে সেটাই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ, এবং তার ফলেই পকেটমার ছেলেটির এই সঙ্কটজনক দশা এবং সকলের হাতে দড়ি পড়ার অবস্থা।

একটি সাবধানী বিচক্ষণ কণ্ঠস্বর পরামর্শ দেয় — 'শোনেন, যা হবার তা তো হয়ে গেছে। এখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ক'রে লাভ নেই। কি ক'রে এখন বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, সেটাই ভাবেন। আমি বলি কি, সামনের স্টেশন থেকে গাড়ী চলতে শুরু করলেই ওটাকে প্লাটফর্মের উপর ঠেলে ফেলে দেবেন। তাহলে আর আমাদের কোনো দায়-দায়িত্ব থাকবে না।'

আশু বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার পক্ষে পরামশটি লাগ্সই মনে হয়, অন্ততঃ এর বিপক্ষে কোনো প্রতিবাদ উত্থাপিত হতে দেখা যায় না। চলতি ট্রেন থেকে মুমূর্ষু ছেলেটিকে প্লাটফর্মের উপরে ঠেলে ফেলে দেওয়ার ব্যাপারে চোখে-চোখে তৈরী হয় একটি সমঝোতা।

ট্রেনের মধ্যেকার এই ঘটনাবলীর উত্তেজনায় শঙ্করা এতক্ষণ ছিল আবিষ্ট, উত্তেজিত। খেয়াল

ছিল না তার যাত্রাপথের আর কতটা বাকি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই বুঝতে পারে, তার গন্তব্য স্টেশনটি আসন্ন। সে প্রস্তুত হয় নামার জন্য কিন্তু ওই পকেটমার ছেলেটির পরিণাম কি দাঁড়ায়, সেটা না জেনে নামতেও দ্বিধান্বিত হয়।

ট্রেন থামল স্টেশনে। স্বল্প বিরতিতে আবার সচল হ'ল ট্রেন। আর তখনই কয়েকটি সবল হাতের ধাক্কায় অচেতন পকেটমার ছেলেটির দেহটি জড়-পিণ্ডবৎ গড়িয়ে পড়ল প্লাটফর্মে। আর তখনই, তার পাশে পাশেই, দ্রুত লাফ দিয়ে নামল শঙ্করা।

প্লাটফর্ম এখন অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। ট্রেন থেকে সদ্য নামা কিছু যাত্রী। চলতি ট্রেন থেকে গড়িয়ে পড়া একটি অচেতন মনুষ্যদেহ আশপাশের লোকদের কৌতূহলী করে। কিন্তু মনুষ্যদেহটির বিধ্বস্ত, রক্তসিক্ত অবস্থা এবং তার পাশে শঙ্করার বিপজ্জনক উপস্থিতি লোকজনের কৌতূহলকে দানা বাঁধতে দিল না। অনর্থক বাজে ঝুট ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া নির্বোধের বৈশিষ্ট্য— এ আপ্তবাক্যটি স্মরণ রেখে অচিরেই স্থান ত্যাগ করল তারা।

.শঙ্করা অচেতন ছেলেটাকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে এনে ঠেস দিয়ে রাখল প্লাটফর্মের প্রান্তবর্তী রেলিং-এর গায়ে। সন্নিকটেই একটি চায়ের দোকান। দোকানের দায়িত্বে ছিল একটি কিশোর। দ্রুত শঙ্করা গিয়ে ডাকে — 'এই নন্তু—'

চায়ের দোকানের ছেলেটি — যার নাম নন্তু — বেরিয়ে আসে।

—'এক কেটলি জল দে তো তাড়াতাড়ি' — শঙ্করা বলে।

—'কি হয়েছে শঙ্করাদা?' —ব্যস্ত ছেলেটি জিজ্ঞাসা করে।

ধমক লাগায় শঙ্করা — 'বলছি আগে জল দে।'

ছেলেটি তাড়াতাড়ি মাটির জালায় সংরক্ষিত জল থেকে কেটলিটা ভর্তি ক'রে এনে বাড়িয়ে ধরে শঙ্করার দিকে। কেটলিটা নিয়ে দ্রুত ফিরে আসে শঙ্করা।

লোহার রেলিং-এর গায়ে সেই বিধ্বস্ত মনুষ্যদেহটি পূর্ববৎ সমর্পিত। ঠোঁট মুখ ফাটা। রক্তাক্ত। এখানে সেখানে টিব্‌লি-আকারে ফোলা। কালসিঁটে দাগ। দেহটিতে প্রাণের লক্ষণ স্বল্প।

চিত্রটি আকস্মিক শঙ্করাকে দাঁড় করিয়ে দেয় এক দৃশ্যের সামনে। এমনই এক রেলওয়ে স্টেশন-সংলগ্ন বিশাল মাঠ। চড়কের মেলা চলছে সেখানে। দোকান পাট। কেনা বেচা। তেলেভাজা জিলিপি — কত খাবারের দোকান। রং-বেরঙের বেলুন, নাগরদোলা। কত মানুষের ভিড়ে সরগরম সেই মেলা। তারই মধ্যে এক সদ্য বাল্য উৎরানো ভবঘুরে কিশোর। পেটভর্তি বেয়াড়া রকম ক্ষিধে, যা তাকে কোথাও তিষ্ঠোতে দেয় না, অবিরত তাড়িয়ে নিয়ে ফেরে, বয়সটা যতদিন বাল্য-সীমার গণ্ডি পার হয়নি, লোকের কাছে বকুনি-টকুনি তিরস্কার শুনেও দু চার পয়সা ভিক্ষে মিলত। কিন্তু এখন সে এক ধিড়িঙ্গে কিশোর, লোকের কাছে ভিক্ষে চাইলে — 'এতোবড়ো দামড়া ছেলে ভিক্ষে চাইছিস্, কাজ করতে পারিস নে'— ইত্যাদি উপদেশ শুনতে হয়। কিন্তু কোথায় যে কাজের বিনিময়ে পয়সা বা খাদ্য সহজলভ্য, একথা তাকে কেউ জানায় না, পরন্তু তার ক্ষিধের যন্ত্রণাটা প্রবল থেকে প্রবলতর হয় এবং সে যন্ত্রণা মেটাতে সে হন্যে হয়ে ফেরে। নানা আদাড়ে-পাদাড়ে ভ্রমণশীল সে এক সময় ভিড়ে যায় এই মেলাটায়।

মেলার নানারকম স্ফূর্তি আর খাবার-দাবারের সমারোহ তাকে আকর্ষণ করে কিন্তু ক্ষুধা-শান্তির কোনো পথ পায় না। মেলার প্রান্ত-সীমায় রম্‌রম্ করে চলছিল একটি ঘুগনির দোকান। রসুইকর হিসেবে দোকানীটির সম্ভবত নিপুণতা কিছু বেশী, ফলে তার দোকানের ঘুগনি বেশ সুস্বাদু এবং খদ্দেরের প্রাচুর্যও সমধিক। খদ্দেররা শালপাতার ঠোঙ্গায় ঘুগনি খেয়ে এঁটো পাতাগুলো ছুঁড়ে ফেলছিল পাশে। কয়েকটা এঁটো-পাতা-চাটা কুকুর ভুক্তাবশিষ্টের সন্ধানে সেখানে খেয়োখেয়ি করছিল।

সারা মেলায় কয়েকপাক চক্কর দিয়ে হতাশ বেপথুমান সেই ছেলেটি এসে জুটেছিল এই ঘুগ্‌নি দোকানের পাশটিতে। কুকুরগুলোর কাছ থেকে কিছুটা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে মাটি থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছিল ইতস্ততঃ ঠোঙাগুলো আর জিভটাকে যথাসম্ভব প্রসারিত ক'রে চেটে নিচ্ছিল যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যকণা। সন্ধ্যের মুখে মেলা হয়েছিল আরো জম-জমাট। ঘুগনির দোকানের চারপাশে খদ্দেরের ভিড় জমে আরো। সেই ভিড়ের মধ্যে এদিকে ওদিকে হাত চালিয়ে শালপাতার ঠোঙা কুড়োতে কুড়োতে অতর্কিতে ছেলেটির একটা হাত ঢুকে যায় এক ভদ্রলোকের শার্টের সাইড-পকেটে। ভদ্রলোক ওর হাতটি চেপে ধরেন এবং সপাটে ওর চোয়ালে একটা চড় কষিয়ে দেন আর চীৎকার ক'রে বলেন— 'হারামজাদা পুঁচকে ছোঁড়া, এর মধ্যেই পকেটমারা শিখেছিস?'

কিছু একটা বলার চেষ্টা করেছিল ছেলেটি। কিন্তু ওর সেই ক্ষীণ কণ্ঠ সমবেত ক্রুদ্ধ গর্জনে চাপা পড়ে গিয়েছিল এবং সমান তালে কিল চড় নেমে এসেছিল ওর উপর। দোকানীটি তখন দোকান সামলাতে ব্যস্ত। কিন্তু তারই মধ্যে ওর একক প্রতিবাদ শোনা গেল—

'আপনারা ওকে মারছেন কেন বাবু, ও একটা ভিখারী ছেলে, আপনারা যা ভাবছেন, তা নয়।'

ধমক দিয়েছিলেন ভদ্রলোকেরা—'তুমি থামো তো হে। এই পকেটমার ছোঁড়াটার হয়ে তোমাকে আর দালালি করতে হবে না।'

ত্রিপল ঢাকা ঘুগনির দোকানের এক কোণে সারারাত পড়ে ছিল হতচেতন ছেলেটি। সর্বাঙ্গে সহ্যাতীত ব্যথা, আর পেটে খিদের মোচড়। পরদিন সকালে খানিক বেলায় ওকে ঠেলে তুলেছিল সেই সহৃদয় দোকানী। একটি বৃহৎ শালপাতার ঠোঙায় অনেকখানি ঘুগনি এনে তুলে ধরেছিল ওর আরক্ত, বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে— 'কাল খানিকটা ঘুগ্‌নি বেঁচে গেছে, তুই এটুকু খেয়ে ফেল শঙ্করা।'

সর্বাঙ্গের ব্যথা ভুলে, চোখের জলে মাখামাখি ক'রে সেই ঘুগনিটুকু চেটেপুটে খেয়েছিল ছেলেটি দুর্লভ সামগ্রীর সমাদরে।

দৃশ্যটি সরে যায় শঙ্করার আবিল দৃষ্টিপথ থেকে চকিতে। এবং এখন আর কোনো অতীতচারণা নয়, প্রখর বাস্তবতায় সম্মুখবর্তী মৃতবৎ ঐ যুবাটি তাব কাছে অধিকতব গুরুত্ব পায়।

কেটলির জল নিয়ে যুবাটির চোখে মুখে ঝাপটা দেয় শঙ্করা, রুমাল ভিজিয়ে সন্তর্পণে মুছে দেয় ওর মুখের ক্ষতস্থান, কালসিটে দাগ।

শঙ্করার শুশ্রূষাদি অবিলম্বে ফলপ্রসূ হয়। যুবাটি চোখ মেলে। কিন্তু দৃষ্টিতে বিহ্বলতা। ঘোর লাগা ভাব।

কিছুক্ষণ বাদে খানিকটা ধাতস্থ হয় যুবাটি। নিজের চেষ্টায়, দুই হাতে ভর রেখে রেলিং এর গায়ে টান হয়ে বসে।

অতঃপর উভয়ের মধ্যে নিম্নক্রম সংলাপ বিনিময় হয়।

— 'নাম কি তোর ?'

— যুবাটি নিরুত্তর।

— 'কি রে, কথার উত্তর দিচ্ছি না যে? কানে কম শুনিস্ নাকি?'

— 'রতন। রতন হালদার।'

— 'থাকিস কোথায়?'

— 'এত নাম ঠিকানা জানার দরকার কি তোমার? ধরা পড়েছি, এখন পুলিশে দিতে চাও, দিয়ে দাও।'

— 'বাঃ, এই তো বেশ বচন ফুটেছে দেখছি। এতো রোয়াবি যদি তো ধরা পড়লি কেন? আর ধরা পড়ে প্যাঁদানি খেয়ে অমন কুঁই কুঁই করছিলি কেন?'

—'করেছি, বেশ করেছি, তাতে তোমার কি?'

—'দ্যাখ্ রতন, কথা যদি সোজা করে না বলবি তো এক থাপ্পড়ে তোর সব কটা দাঁত নামিয়ে দেবো।'

শঙ্করার উগ্রতা ধাক্কা দেয় রতনকে। অমানুষিক প্রহারের এক নির্মম অভিজ্ঞতা সদ্য সে অতিক্রম করে এসেছে, তার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা রতনের সারা দেহে ওর অজান্তেই ত্রাসের কাঁপুনি জাগায়। ওর ঠোঁট দুটো থরথর কাঁপে বারকয়েক। বসে থাকে নির্বাক। নিঃশব্দে জল গড়ায় চোখের কোণ বেয়ে। ক্ষণকালের বিরতিতে আবার ওদের সংলাপ শোনা যায়—

— 'কি হ'ল, কথার জবাব দে, কোথায় থাকিস?'

— 'আগে থাকতাম হাবড়া অশোকনগরে। এখন থাকার কোনো ঠিক নেই।'

— 'তা হঠাৎ এ কাজে নামতে গেলি কেন?'

— 'ক্যানো মাইরি সমান তালে ভ্যান্‌তাড়া চালাচ্ছো? একটা কিছু না করলে খাবো কি?'

— 'আগে খেতিস্ কি?'

— 'অশোকনগরে দাদার বাড়ী থাকতাম। ক্লাস এইট অব্দি পড়েও ছিলাম। পড়াশুনো ভাল লাগত না। বউদি রোজ ক্যাটর ক্যাটর করত। দাদা কাজ করত সুতোকলে। সামান্য মাইনে। তা, একদিন সুতোকলের মালিক কারখানা বন্ধ করে দিল। বেকার হয়ে গেল দাদা। বৌদি একদিন বলল — তোকে আর খাওয়াতে পারব না। পথ দেখ্। তা, একদিন রাগ করে বেরিয়ে গেলাম বাড়ী থেকে।'

— 'তারপর থেকে এই কাজে লেগোছিস্?'

— 'না, কিছুদিন স্টেশনে মাল বওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি। তাবপব তোমাদের এদিকের এক চোলাই মদের ভাটিতে ভিড়েছিলাম।'

— 'মদ বানাতিস্?'

— 'না, মালিক আমাকে ওসব কাজ দেয়নি। আমার ছিল অন্য কাজ। চোলাই ভাটির তো লাইসেন্স নেই। মাঝে মাঝেই পুলিস আসত। তা, পুলিশের সাথে ভাটির মালিকের শাঠ ছিল। মাসে মাসে পুলিশকে টাকা গুনত মালিক। কিন্তু পুলিশকেও তো ডিউটি দেখাতে হবে। মাঝে মাঝে আসত, দু একটা হাড়ি গামলা ভেঙে দিত, তারপর কাউকে না কাউকে ধরে নিয়ে যেত। মালিক আমাকে লাগিয়েছিল এই কাজে। ওখানেই থাকতাম। অন্য দিনগুলোয় মালিকের ফাই-ফরমাশ খাটতাম। আর পুলিশ এলে আমাকে এগিয়ে দিত মালিক। ব্যবস্থা তো সব আগে থাকতেই করা থাকত। হাতে দড়ি বেঁধে পুলিশ আমাকে নিয়ে যেত, একদিন দুদিন আটকে রাখত থানায়। তারপর ছেড়ে দিত। আবার আমি ফিরে আসতাম ভাটিতে।

—'তা, ভালই তো চাকরি পেয়েছিলি, ছাড়লি কেন?'

—'ছাড়লাম আর কোথায়, ছাড়িয়ে দিল আমাকে। একদিন মালিককে বলেছিলাম— বাবু, অনেকদিন তো এ কাজ করলাম, এবার আমাকে একটা পাকা কাজের ব্যবস্থা করে দেন। মালিক শুনে চোখ ছোট ক'রে তাকিয়েছিল আমার দিকে খানিকক্ষণ, তারপর হেসে বলেছিল— তোর

পাকা চাকরীর শখ হয়েছে রে ব্যাটা, তা দেবো ব্যবস্থা করে। তা, মালিক আমার পাকা চাকরীর ব্যবস্থা ভালই করে দিল। কয়েকদিন বাদেপুলিশ এল। যেমন যাই, এগিয়ে গেলাম। আমাকে বেঁধে নিয়ে গেল পুলিশ। কিন্তু এবার আর আমাকে ছাড়ল না। চোলাই মদের কারবারী বলে ছয় মাসের জেল হয়ে গেল। জেল থেকে বেরিয়ে এক গাছতলায় বসে ছিলাম। ভাবছিলাম কোথায় যাব। আমার তো কোথাও যাবার জায়গা নেই।'

—'আবার ভাটিতে ফিরে গেলি না কেন?'

—'কি মাথা মোটার মতো কথা বলছ মাইরি! ভাটিতে যদি পিরিত থাকত, তাহলে মালিক কি আমাকে এইভাবে জেলে পাঠায়?'

—'তার পরেই কি এই কাজে আসলি?'

—'তা বলতে পারো। জেল থেকে বেরিয়ে তো বসে ছিলাম এক গাছের তলায়। ওদিনই জেল থেকে ছাড়া পায় হাবিব ব'লে এক ওস্তাদ পকেটমার। হাবিব আমার পাশে বসে আমার তত্ত্ব-তলাশ নেয়। দোকানে নিয়ে মাংস-পরোটা খাওয়ায়। তারপর বলে, কাজ করবি? কি আর করি। লেগে গেলাম হাবিবের সাথে। প্রথম প্রথম এক সাথে। তারপর স্বাধীনভাবে।'

— 'তা, লাইনটা কেমন?'

—'লাইনটা কেমন, তা দেখতে পেলেনা? ধরা পড়লে বাপেও ছাড়ে না। পেঁদিয়ে শালা বেন্দাবন পাঠায়. তবে মাল হাতাতে পারলে শাহেনশা।'

বিরতীহীন, দীর্ঘ এই আলাপাদির ধকল বড়ই ক্লান্ত করে রতনকে। জোরে জোরে শ্বাস টানে। খানিক আগের অমানুষিক প্রহার ওর শরীরকে বিধ্বস্ত ক'রে রেখেছিল।

ইতিমধ্যে স্টেশন মাস্টার পরবর্তী ডাউন ট্রেনের আগমনবার্তা ঘোষণা করেছেন। ক্রমশঃ যাত্রীর ভিড় জমছে স্টেশনে। কারো কারো কৌতূহলী দৃষ্টি, নীরব জিজ্ঞাসা শঙ্করা রতনকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয়। কিন্তু উত্তরের জন্য বিশেষ সচেষ্ট হয় না। বা হতে সাহসী হয় না।

গাছ-গাছালির ফাঁকে, স্টেশনের ওভার-ব্রিজ আর ওভার হেডের ধাতব অস্তিত্বের রন্ধ্রপথে শেষ বিকেলের আলোয় প্লাটফর্মের বুকে আলো-ছায়ার জ্যামিতিক নকশা। পরপর কয়েকটা ট্রিপেব শেষে আবার চালেব বস্তা কাঁকালে চাপিয়ে কলকাতাগামী ট্রেন ধরবার জন্য কল্‌কল্‌ করতে করতে প্লাটফর্মে উঠে এল বিন্তি মালতী লতা অনুভাদের একটি দল। ওরাও শঙ্করাকে এই ভিন্নতব পরিস্থিতিতে হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে কৌতূহলী হয়। কিন্তু ওদের বিশেষ পাত্তা দেয় না এখন শঙ্করা। ওরা যথারীতি প্লাটফর্মের অগ্রবর্তী দিকটিতে এগিয়ে যায়।

রতনের বিধ্বস্ত চেহারাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে শঙ্করা। তারপর নিজে উঠে দাঁড়ায় এবং রতনের একটা হাত ধরে টান মারে—'নে ওঠ্। চল্ আমার সঙ্গে।'

রতনের দৃষ্টিতে কিছুটা ভীতি, অনিশ্চয়তা। তবু সে উঠে দাঁড়ায়, জিজ্ঞাসা করে—'কোথায় যাবো?'

—'চল্ না, অত কথা কিসের।'

শঙ্করাকে অনুসরণ করে রতন। স্টেশনের বহির্ভাগে রেলেরই জমিতে টালি-মুলিবাঁশের একটি ঘর। ভিতরে কয়েকখানা বেঞ্চ পাতা। পাউরুটি, আলুর দম, চায়ের ব্যবস্থা।

শঙ্করা দোকানীকে অর্ডার দেয় 'দু-খানা পাউরুটি, আর দু-প্লেট আলুর দম।'

শঙ্করার আচরণ বিহ্বল করে রতনকে। তার কণ্ঠে বিমূঢ়তা—'আমি খাবো না, আমার কাছে পয়সা নেই।'

শঙ্করার দৃষ্টিতে এক প্রসন্ন প্রশ্রয় — 'পয়সার কথা তোকে ভাবতে হবে না। আমি খাচ্ছি, আমার সাথে খাবি। তাতে আবার পয়সার কথা কিসে উঠছে রে?'

নিঃশব্দ মনোযোগিতায় একসময় খাওয়া শেষ হয় দু'জনার। হাত মুখ ধুয়ে এসে চায়ের অর্ডার দেয় শঙ্করা। পকেট থেকে বিড়ি বের হয়। দুজনের হাতের বিড়িতে আগুনের স্পর্শ দুজনের নৈকট্যকে নিবিড় করে।

হাতল-ভাঙা জীর্ণ কাপে চা আসে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে শঙ্করা বলে—'কাজ করবি?'

প্রহার, থানা-পুলিশ, নির্যাতন ইত্যাদির পরিবর্তে কাজের প্রস্তাব। আপ্লুত হয় রতন, কিন্তু তার সংশয় অবিনাশী। অতীতে হাবিবের কাজের প্রস্তাব এবং আজকের এই সদ্য পরিণামী অভিজ্ঞতা তাকে হিসেবী, বিচক্ষণ করে।

— 'কি কাজ, কেমন কাজ, তা না জেনে তোমারে কথা দি কেমন করে।'

—'দ্যাখ্, আমার নাম শঙ্করা। তোর থেকেও সাত ঘাটের জল খাওয়া মাল আমি। সব ছেড়ে এখন ট্রেনে চালের কারবার করি। রাজী থাকিস্ তো লেগে যা আমার সাথে।'

রতনের কালশিটে-ক্লান্ত চোখ দুটিতেও এ উক্তি অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যের বার্তা ছড়ায়—

— 'চালের কারবার? না গুরু, ওসব ছোটো কাজে আমার পোষাবে না।'

নিমেষেই হিংস্র আর শানিত আভা পায় শঙ্করার দৃষ্টি— 'দ্যাখ্ রতন, মুখ সামলে কথা বলবি। ছোট কাজ? পেটের ভাত জোগাড় করবি তার আবার ছোট কাজ বড়ো কাজ কি বে বান্চোত? খুব তো বড়ো কাজের শখ! এদিকে কলজের হাড় কখানা তো পায়রার পাখনা। ফুঁ দিলেই মট্। আবার বড়ো কাজের রোয়াবি মারাচ্ছিস? তো, চল বাইরে। সব শুনলে পেঁদিয়ে পাবলিক তোর বড় কাজের শখ ঘোচাবে।'

রতন জড়িয়ে ধরে শঙ্করাব একখানা হাত। কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতা আর নির্ভরতাব স্পর্শ লাগে—

—'নাও মাইরি, ছাড়ান্ দাও এবার, কি করতে হবে সেই পথ বাতলাও।'

নির্বাক শঙ্করা দৃষ্টির আঙুলে কিছুক্ষণ পরিমাপ করে রতনকে। তারপর সুস্থিত কণ্ঠে বলে—

— 'কাছাকাছি কোথাও একটা থাকার ডেরা বার করতে পারবি?'

ভাবনার আবর্তে ক্ষণিক ঘুরপাক খায় রতন। হঠাৎ যেন আবিষ্কারেব আনন্দে বলে—

—'হ্যাঁ, পারব। বারাসতে আমার এক মাসির ঘর আছে রেললাইনের ঝুপ্ড়িতে। কিছু পাত্তি ছাড়লে ওখানে একটা থাকার জায়গা হতে পারে।'

—'ঠিক আছে, তাহলে শরীরটাকে একটু হালে এনে দু'চারদিন বাদে চলে আয় আমার কাছে। এখানকার চালের আড়তে এলেই আমাব খোঁজ পাবি। তোকে আড়তের দোকানদারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। দরকারে ধারে চাল নেওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দেবো।'

পকেট থেকে আবার দুটো বিড়ি বের করে শঙ্করা। দুজনের বিড়ির সুখটানে যেন অলৌকিক এক মৌতাত নামে। ওদের সদ্য-স্থাপিত বন্ধুতা সেই মৌতাতে পারস্পরিক নির্ভরতার প্রতিশ্রুতিতে সঞ্চারী হয় দৃঢ়-মূল শিকড়-বাকড়ে।

।। সাত ।।

বিকেলের দিকে নিবারণের দোকানে নিয়ম-মাফিক একটি রগড় জমে। নিয়ম-মাফিক, যেহেতু ঘটনাটির প্রায়শঃই পুনরাবৃত্তি ঘটে। আশপাশের কিছু কিছু দোকানদার এবং দর্শকবৃন্দ, যারা নিবারণের লক্ষ্মীশ্রীর ক্রমবর্ধমানতায় ঈর্ষাপরায়ণ, অথচ প্রকাশ্যে সোচ্চার হবার মতো দুঃসাহসী নয়, তারা ঘটনাটিতে যথেষ্ট মজা পায় এবং বিকশিত-দন্ত হয়ে রগড়টি উপভোগ করে। এতে নিবারণের ক্রোধ দ্বিগুণতর হয়। কিন্তু ক্রোধ-প্রকাশের যথার্থ ক্ষেত্রটি অনায়ত্ত জেনে দোকানের কর্মচারীদের উপরই গায়ের বাগ-ঝাল ঝাড়ে—

—'হারামজাদারা, দোকানে বসে কি সব নাকে তেল দিয়ে ঘুমোস্? ক্যাশবাক্সের মাল স'রে যায়, তোরা থাকিস্ কি করতে দোকানে?'

নিবারণের উত্তাপের জবাবে একজন বৃদ্ধ কর্মচারী, বয়সের সুবাদে কিঞ্চিৎ সমকক্ষতার দাবিদার, বিনীত কণ্ঠে বলে—

—'সবই তো জানেন কত্তামশায়, পলাশ দাদাবাবু কিভাবে আমাদের উপর এসে জুলুম করে। আজও দুতিন জনের দল জুটিয়ে এনে জোর করে আমার কাছ থেকে ক্যাশ বাক্সের চাবি কেড়ে নিয়ে ক্যাশ বাক্সের টাকা নিয়ে গেছে। পলাশ দাদাবাবুকে আমরা কি ক'রে বাধা দেব?'

নিবারণ ব্যাপারটা যে না বোঝে, তা নয়। কিন্তু বুঝেও যেন না বোঝার ভান করে। এবং একটা লুকোচুরি খেলার অবতারণা ঘটে।

ক্যাশবাক্সের পাশে প্রায় সারাক্ষণই গদিয়ান থাকে নিবারণ। কিন্তু দরকারে-অদরকারে মাঝে মাঝে তাকে এদিকে ওদিকে যেতে হয়। দোকানের কর্মচারীরা, যুবা-বৃদ্ধ নির্বিশেষে, সকলেই বিশ্বাসী, আস্থাভাজন। দোকানের মালপত্র বা ক্যাশ বাক্স, উভয়ই এদের কাছে সুরক্ষিত। বিশেষ প্রয়োজনে দোকান-ত্যাগের আগে ক্যাশ বাক্সের চাবিটির দায়িত্ব সাধারণত বৃদ্ধ কর্মচারীটির হাতে ন্যস্ত হয় এবং সেও সেটি দায়িত্বের সঙ্গে সুরক্ষার ব্যবস্থা করে।

কিন্তু এই বাঁধা নিয়মের মধ্যে সম্প্রতি একটি বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে নিবারণ-পুত্র পলাশ। এবং পলাশ যেন মূর্তিমান একটি বিভীষিকা-স্বরুপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি পলাশের সঙ্গে বাড়ীর পারিবারিকতার যোগসূত্র নিতান্তই ক্ষীণ, অন্নগ্রহণের সময়টুকু ছাড়া বাড়ীর অন্য কোনো ব্যাপারে তার কোনো ভূমিকা নেই। পিতা নিবারণ এবং পুত্র পলাশের মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি বর্তমানে একান্তই বিরল। এবং তার জন্য নিবারণ, অন্তত বহিরঙ্গে, বিশেষ কোনো আফসোস দেখায় না। নিজস্ব ব্যবসা-পত্রের ক্রমবর্ধমান দায়-দায়িত্ব নিয়েই দিন-রাত্রির অধিকাংশ সময় তার অতিবাহিত হয়। কিন্তু পলাশ সম্প্রতি এই বাঁধা নিয়মে কিঞ্চিৎ ছন্দ-পতন ঘটিয়েছে।

নিবারণের কোনো আকস্মিক অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কখনো কখনো পলাশের আবির্ভাব ঘটে দোকানে। সদ্য যুবা-ধর্মের নানা ব্যসন এখন তার করায়ত্ত, এবং সদলবলে সেগুলো যথাযথ লালন করা যথেষ্ট ব্যয়-সাপেক্ষ। নিজস্ব আয়ের সূত্রে সেগুলো বজায় বাখা সম্ভবপব নয়, এবং সেজন্য বর্তমানে তাকে দোকানের ক্যাশ-বাক্সের উপর হামলা চালাতে হয। পবপব কয়েক দিনই এবকম ঘটেছে। দোকানে ফিবে এসে নিবারণ হম্বি-তম্বি করে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখনই দোকান-ত্যাগের সাময়িক প্রয়োজন ঘটেছে, চাবিব গোছা যথারীতি বৃদ্ধ কর্মচারীটির হাতেই দিযে গিয়েছে।

বৃদ্ধ কর্মচারীটি কখনো বা বলেছে—

—'কত্তামশায়, চাবিটা আপনি সঙ্গে ক'রেই নিযে যান। রোজ বোজ এই ঝামেলায় কেন ফেলেন আমাদের!'

নিবারণ একটুখানি চোখ ছোট করে তাকিয়ে থাকে। তারপর সকলের দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে বলে—'দোকানে কাজ করবে, আর দোকানের মালপত্র, ক্যাশবাক্স আগলাতে পারবে না, তাহলে কাজকর্ম ছেড়ে দিলেই হয়। চাবি আমি এখানেই রেখে গেলাম। সামলাতে পারলে সামলিও, না হয়, যা হবার তা হবে।'

অর্থাৎ, তার অনুপস্থিতিতে পলাশ এসে যে ক্যাশ বাক্স থেকে কিছু টাকা হাতিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এতে নিবারণের নীরব প্রশ্রয় রয়েছে। দোকানের আর কেউ না হোক, বৃদ্ধ কর্মচারীটি, যে এই দোকানের সূচনা-পর্বের দুঃখ-দৈন্যের সংগ্রামী দিনগুলো থেকে বর্তমান পর্যন্ত নাগাড়ে সংযুক্ত রয়েছে, ব্যাপারটা সম্যক অনুধাবন করতে পারে। বখাটে, গোল্লায়-যাওয়া সন্তানের প্রতি পিতার এই মমত্বটুকুকে নিঃশব্দে অনুভব করে বৃদ্ধ কর্মচারীটি। এবং হামলা ক'রে টাকা নিয়ে পলাশ যে আরো উচ্ছন্নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, এটা জেনেও নিবারণ অন্ধ পিতৃস্নেহে পলাশের অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে বাধা সৃষ্টি করতে পারছে না— এটা কর্মচারীটি বোঝে। কিন্তু তারা নিতান্তই বেতন-ভুক কর্মচারী, মনিব এবং মনিব-পুত্রের এবম্বিধ আচরণাদির মধ্যে বেশী না জড়ানোই তাদের পক্ষে নিরাপদ। বাপ-ছেলের এই আচরণাদি নিয়ে অন্যান্য দোকানের লোকজনের মধ্যে যে সব হাসি-মস্করা চলে, সে বিষয়েও ওরা নিস্পৃহ থাকার চেষ্টা করে।

ক্যাশবাক্স সামলে, নিবারণ আবার গদিয়ান হয়। দোকানের স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম, খদ্দেরদের আগমন-নির্গমন, চলতে তাকে নিয়ম-মাফিক।

দোকানে ঢোকে শঙ্করা। সঙ্গে রতন। গদিঢাকা ছোট খাটটার এক পাশে হাতের ভর রেখে দাঁড়ায় শঙ্করা—

—'এটাকে নিয়ে এলাম দাসমশায়। এর নাম রতন। লাইনে কাজ করবে। মাল-পত্তর যখন যা চাইবে, দেবেন। টাকাকড়ির দায়িত্ব আমার।'

রতনকে একবার আপাদমস্তক দেখে নেয় নিবারণ।

বলে— 'এটাকে আবার কোথা থেকে জোটালি? দেখে তো মনে হচ্ছে তোর মতনই বেনো জলের কুটো। ভেসে বেড়ানো পার্টি।'

রতনের দৃষ্টি বক্র, অসহিষ্ণু হয়।

শঙ্করা বলে—'অতসব কথায় কাজ কি দাসমশায়? মনে বাখবেন, এও আপনার আর এক খদ্দের। খদ্দেরকে মাল দেবেন, তার অত পরিচয় আর হ্যানা-তানায় দরকাব কি?'

নিবারণ রাগে না। একটু হাসে ।

—'সে তো ঠিক কথাই রে! খদ্দেরই তো আমার লক্ষ্মী। তা, সে খদ্দেরের আবার পরিচয় কি? তা, তুই ছেলেটাকে সঙ্গে ক'রে আন্‌লি, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম— কোথা থেকে জোটালি।'

রতন এবার ফোড়ন কাটে—'কেউ কাউরে জোটায় না, যার জোটাব সে আপনি জুটে যায়।

নিবারণ এবার প্রকৃতই হাসে—'বেশ তো কথাখান্‌রে! যাব জোটার সে আপনি জুটে যায়। তা বেশ, তা বেশ!'

কর্মচারীদের দিকে তাকিয়ে হুকুম দেয় — 'ওরে, শঙ্করাদের মালটা তাড়াতাড়ি মেপে দে।'

রতনকে নিয়ে শঙ্করা চাল মাপার জায়গায় যায়। ঢাউস বস্তায় ভর্তি চালের নিঁখুত পরিমাপ। খাতাপত্রে দরদাম পরিমাপের হিসেবী সঙ্কেত-ভাষা। তারপর চাল নিয়ে চলে যায় ওরা দুজন।

ক্যাশবাক্স কোলের কাছে নিয়ে তার উপর হিসেবপত্র লেখা জাবেদা খাতাটা চাপিয়ে, নিবারণ বিক্রি-বাটার পরিমাপাদির উল্লেখ রাখতে নিবিষ্ট থাকে। আর, রতনের ঐ তুখোড় বাক্যবন্ধ, —'যার জোটার সে আপনি জুটে যায়'— ধ্বনি-তরঙ্গ হয়ে রণিত হতে থাকে অন্তরের অন্তস্তলে।

নাকের ডগায় উপবিষ্ট মাছি-বিতাড়নের ভঙ্গীতে কথাটাকে তাড়ানর চেষ্টা করে নিবারণ, কিন্তু ঘুরে ফিরে কথাটা যেন আরো জাকিয়ে বসে, এবং সুড়সুড়ির মতো মন জুড়ে তিরতির করে।

এবং অনিবার্যভাবে অনেকদিন আগেকার সেই ঘটনাটা ছায়া ফেলে মনে।

তখনো নিবারণের ভাগ্য লক্ষ্মীশ্রীর মুখ দেখেনি। পূববাংলার বাড়ীঘর জমি জায়গা ছেড়ে এদেশে এসে নিবারণও তখন বেনো জলের কুটো— ঘাট-আঘাটা, স্থান-অস্থানে ভাসমান। ভাগ্য-পরীক্ষার হা-ক্লান্ত নানা কৌশলী প্রচেষ্টায় দিন-রাত্তির জেরবার।

ব্যবসা-কর্মের কিছু লেনদেনের সুযোগ-প্রত্যাশায় নিবারণ গিয়েছিল হাবড়া বাজারের এক খ্যাতনামা অবাঙালী ব্যবসায়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে। ফেরার পথে হাবড়া স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় বসে ছিল নিবারণ। গ্রীষ্মের দুপুর। বৃষ্টি নেই দীর্ঘদিন। আকাশ যেন আগুন। বাতাসে তার ত্বক-প্রদাহী হল্কা। স্টেশন-সংলগ্ন বৃক্ষতলের এক চায়ের দোকানে নিবারণ ছিল অপেক্ষারত। ট্রেন না আসা পর্যন্ত সময়টুকু অতিবাহনের জন্য পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাদির প্রতি মনঃসংযোগের চেষ্টায় ছিল ব্যাপৃত। হঠাৎ নজর টানল দৃশ্যটা।

বছর দশ বারোর এক দঙ্গল উদ্বাস্তু ছেলে। দেশ-ভাগের ঝাপটে তখন এ লাইনের সব স্টেশনই এক একটি উদ্বাস্তু-নিবাস। এসব ছিন্নমূল পরিবারেরেই কিছু বংশধর এরা। দারিদ্র, সঙ্গে সহযোগী গ্রীষ্মতাপ, ফলে পরিধেয় যৎ সামান্য। স্টেশন-সংলগ্ন একটি ডাবের দোকান। প্রখর গ্রীষ্মতাপে রেলযাত্রীদের তৃষ্ণাশান্তির ব্যবস্থা। জলপানের পর ডাবের খোলটি পরিত্যক্ত হয়। সেগুলি স্তূপীকৃত হয় স্টেশন-ঘরেব দেয়ালের পাশে। ছেলেগুলোর ভিড় এখানেই। পরিত্যক্ত ডাবের খোলগুলির মধ্যে সুকৌশলে আঙুল গলিয়ে সন্ধান নেয়, হালকা নারকেলের সর জমেছে কিনা। নিশ্চিত হলে নির্দিষ্ট খোলটি ফাটিয়ে মহানন্দে ভাগাভাগি ক'রে চেটেপুটে খাওয়া। যে স্বল্পতম আহার্যটুকু এ বয়সে একটি ছেলের পেটে সববরাহ হওয়া একান্ত জরুরি, সারাদিনে অন্ততঃ দু'বার, এদের এই নিরাশ্রয় জীবন-যাত্রায় তা একান্তই দূরাশ্রয়ী কল্পনা। ফলে এক তীব্র দুরন্ত ক্ষুধা তাদের সর্বদা অস্থির, চঞ্চল রাখে, কোথাও সুস্থিত হতে দেয় না, চালিত করে স্থান থেকে স্থানান্তরে। ডাবের খোল ভেঙে শাঁস খাওয়ার মধ্যে কিঞ্চিৎ ক্ষুধাশান্তির সঙ্গে যুক্ত হয় যৌথ প্রচেষ্টার এক ধরণের কৌম অনুভূতি। ফলে ওদের কাছে ব্যাপারটা সাময়িক ভাবে হলেও খুব গুরুত্ব পায়, এবং অবিলম্বে এটা বিশেষ একটা ক্রীড়ারূপে পরিণত হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই চঞ্চল স্বভাবের জন্য ওদের কাছে ব্যাপারটা গুরুত্ব হারায়। ওবা স্থানান্তবে চলে যায় ভিন্ন কোনো আমোদের সন্ধানে, অথবা ক্ষুধা-শান্তির ভিন্নতব উপায়ের তল্লাশে।

কিন্তু নিবারণ লক্ষ করে, একটি দুরন্ত রোখা ছেলে তখনো একটার পর একটা খোল তুলে নিচ্ছে, মনোযোগে নারকেলের অস্তিত্ব পরীক্ষা করছে এবং হতাশ হচ্ছে বারবার। এভাবে উপর্যুপরি হতাশা-জনিত ক্রোধ তার চোখে মুখে ধীবে ধীরে জ্যৈষ্ঠের খরশান তাপ ও জ্বালার প্রবাহ সঞ্চার করে। চণ্ডাল এক মরিয়া ক্রোধ যেন সম্মোহিত করে তাকে। অতঃপর সে আর ডাবের খোলে শাঁসের অস্তিত্ব পরীক্ষা করে না, কি এক নির্ভেজাল জিঘাংসায় উন্মাদপ্রায়, একের পর এক ডাবের খোল তুলে ছুঁড়ে মারতে থাকে স্টেশন-রুমের দেয়ালের গায়ে। ইতস্ততঃ পথিকরা তার এ আচরণে বিস্মিত হয়, কিন্তু দ্রুত অকুস্থল ত্যাগ করে বিনা মন্তব্যে। ছেলেটি যেন ক্ষিপ্ত এক মহাবল দুরন্ত জিঘাংসা। খানিকক্ষণ সে ব্যাপৃত থাকে এই একক সংগ্রামে, তারপর বোধহয় ক্লান্ত হয়। গাছের ছায়ায় চায়ের দোকানের খুঁটিটাতে হেলান দিয়ে বসে থাকে চুপচাপ। দৃষ্টিতে এক অমোঘ শূন্যতা।

নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা, জীবন-যাত্রার নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্বেগাদিব মধ্যেও নিবাবণেব

মনে জাগে কৌতূহল। ছেলেটাকে কাছে ডাকে হাতছানি দিয়ে। সে নির্লিপ্ত। কিন্তু আরো বার কয়েক ডাকতেই আশ্চর্য, সে উঠে আসে। কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায় নিবারণের। নিবারণ জিজ্ঞাসা করে—

—'বিস্কুট খাবি?'

—'খাব।' — সঙ্কোচহীন জবাব।

দোকানীর কাছ থেকে বিস্কুট নিয়ে নিবারণ দেয় ওকে। নিরুত্তাপ উদাসীন খেয়ে যায় ছেলেটি।

— 'তোব কে আছে?'

— 'কেউ না।'

— 'কোথায় থাকিস তুই?'

— 'কোথাও না।'

এবার হেসে ফেলে নিবারণ। বলে—

—'সে কিরে। তোর কেউ নেই, কোথাও থাকিস্ নে, কেমন ছেলে রে তুই!'

ছেলেটি নিরুত্তর। ভাবলেশহীন।

ছেলেটিকে দেখে নিবারণ। কত আর বয়স হবে। ওর ছেলে পলাশের থেকে কিছু বড়। নিবারণের ঘরে পুষ্যির অভাব নেই। বুড়ো মা, বউ, ছেলে পলাশ, আরো তিনটি মেয়ে। অভাবের সংসার। সব কটা মুখে সঠিক অন্ন জোগাতে নুন আনতে পান্তা অকুলান। তবু এই মুহূর্তে আকস্মিক যেন বেহিসেবী হঠকারী হয়ে ওঠে নিবারণ।

—'এ্যাই ছেলে, তুই যাবি আমার সঙ্গে?'

—'কোথায়?'

— 'কোথায় আবার? আমার বাড়ী।'

— 'হ্যা, যাব।'

এক কথায় রাজী। আশ্রয় এবং আশ্রয়হীনতা ওর কাছে যেন পয়সার এপিঠ আর ওপিঠ। উল্টনো আর পালটানো উভয়ই যেন সমতুল। এই বয়সেই জীবন-যুদ্ধের নানা পোড় যেন নিরাসক্ত উদাসীন দার্শনিক ক'রে তুলেছে তাকে।

—'ঠিক আছে, আমার কাছে বসে থাক্। ট্রেন এলে, আমার সঙ্গে যাবি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। নিবারণ আবার বলে—

— 'তোর নাম কি রে?'

— 'কেন, নাম দিয়ে কি হবে? সঙ্গে নিয়ে যাবে, তার জন্য আবার নাম লাগবে কেন?'

—'বারে, নাম না জানলে তোকে ডাকবো কি ব'লে?'

দূরের আকাশের দিকে ছেলেটির দৃষ্টি লগ্ন থাকে ক্ষণকাল। তারপর নিবারণের দিকে তাকিয়ে বলে—'আমার নাম শঙ্করা।'

সেই সব স্মৃতি এখনো অমলিন নিবারণের। পিতৃমাতৃহীন সেই কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেটি, শঙ্করা যার নাম, তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিল। সর্বত-অসচ্ছল নিজের সংসারে একটি পুষ্যি বাড়িয়ে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। এখন মনে হয়, সংসারে কেই বা কাকে আশ্রয় দেয়! রতনের কথাই হয়ত ঠিক, কেউ কাউকে জোটায় না, যে জোটার সে আপনিই জুটে যায়। আবার চলেও যায়।

বছর তিনেক নিবারণের সংসারে আশ্রিত ছিল শঙ্করা। বাড়ীর ফাই-ফরমাশ, দোকানের ছোটোখাটো কাজ— এসবে রপ্ত হয়েছিল বিলক্ষণ। কিন্তু ব্যায়বৃদ্ধির সহজাত দূরদৃষ্টি তাকে বুঝতে শিখিয়েছিল, নিবারণের নিজস্ব সংসার-যাত্রা, তার পারিবারিক পরিমণ্ডল শঙ্করার স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার পক্ষে অনুকূল নয়। এবং এ উপলব্ধির পর পরই সে ত্যাগ করেছিল নিবারণের মোটামুটি, ডালভাত-সম্পর্কিত নিশ্চিত আশ্রয়। তার পর থেকে শঙ্করা দীর্ঘদিন বেপাত্তা, নিরুদ্দেশ।

প্রথম প্রথম একটু আধটু খোঁজাখুঁজির চেষ্টা করেছিল নিবারণ, এবং পরে বুঝেছিল, এসব অর্থহীন। ফলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ কিলোনোর নিরর্থক প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়েছিল। তাছাড়া নিবারণের ব্যবসা-বাণিজ্যের পালে তখন সদ্য টানের হাওয়া লাগতে শুরু করেছে। অন্যবিধ জগৎ তখন তার কাছে তুচ্ছ। এতদিনের কঠিন পরিশ্রমের সুফলটুকু কড়ায় গণ্ডায় উসুল ক'রে তাকে আরো শ্রীবৃদ্ধি দানে তৎপর, মনোযোগী ছিল। ফলে স্নেহবন্ধনহীন শঙ্করার তখনকার নিরুদ্দেশ হওয়াটা কোনোই গুরুত্বে চিহ্নিত হতে পারল না।

তবু একটা টান ছিল নিবারণের মনে। সমবয়স্ক, সামান্য সাদৃশ্যের কোনো যুবককে আকস্মিক দেখে এমত বোধের উদয় হ'ত— শঙ্করাই বুঝি বা। এবং হতাশ হতে কালক্ষেপ ঘটত না। নিবারণ তার সর্বাঙ্গীণ ব্যবসায়িক পরিকাঠামোর মধ্যেও অজান্তে তখন একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করত।

বেশ কিছুদিন বাদে একটা উড়ো খবর এসেছিল নিবারণের কাছে। দমদমের কালু গুণ্ডা, যে ছিল তদঞ্চলের স্বঘোষিত সম্রাট, শঙ্করা নাকি এখন তার আশ্রিত। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় মধ্যবর্তী বা পশ্চাদ্‌বর্তীর সামাজিক কৌলিন্য নগণ্য। প্রথম দিকের স্থান অধিকারীর জেল্লাই আলাদা। খেলোয়াড়, রাজনীতিক, অভিনেতা— সবই হওয়া চাই প্রথম সারির। এমন কি, গুণ্ডা হলেও, যদি প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা অর্জন কবা যায়, সমাজবাসী ইতর-ভদ্র জনেরা কিছু সমীহ অবশ্যই করে। শীর্ষস্থানে পৌঁছোনোর সব ক্ষেত্রে মতো এ লাইনেও কৃতিত্ব অর্জন করা যথেষ্ট শ্রমসাধ্য, এবং এ-ব্যাপারে কালুগুণ্ডা তার অঞ্চলেব আপামর জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট পরিচিতি অর্জনে সক্ষম হয়েছিল।

কালুগুণ্ডার কাছে শঙ্করার আশ্রয় পাওয়ার সংবাদে নিবাবণ হর্ষ এবং বিষাদ—দুটিতেই আবিষ্ট হয়েছিল। কালুগুণ্ডার শাগরেদ হতে পাবায় অবশ্যই এক ধরনের গৌরব আছে, কিন্তু এ গৌরব শঙ্করাকে কোন্ পথে, কোন্ অনিবার্য পরিণামের দিকে টেনে যায়ে যাবে, এটা ভেবে বিষাদও অনুভব করেছিল নিবারণ। ছিনতাই, ওয়াগন ভাঙা —এসব কাজে সিদ্ধহস্ত কালুগুণ্ডার অন্যতম সহযোগী হিসেবে শঙ্করাকে কল্পনা করতে নিবারণ আর্ত বোধ করেছিল। বেঁচে থাকার সংগ্রামে জীবিকার একটা পথ অবশ্যই নির্বাচন করতে হবে, কারণ অন্ন তো কোথাও সুলভ নয়, কিন্তু তার জন্য এ-জাতীয় একটি হঠকারী পন্থা নির্বাচন, সহজ-বুদ্ধি নিবারণের কাছে উৎকট বলে বোধ হয়েছিল। সেই সঙ্গে ধর্মভীরুতায় একটা অপরাধ-বোধও তাকে পীড়া দিচ্ছিল। তাব কোনো আচরণ শঙ্করাকে বাধ্য করেনি তো এই বৃত্তি নির্বাচনে?

পরিস্থিতি যখন এই পর্যায়ে, এক বর্ষণ-ক্ষান্ত বিকেলে শঙ্করা ফিবে এসেছিল নিবাবণের দোকানে। সে তখন রুক্ষ জোয়াড় এক রাগী যুবক। একটা নিষ্ঠুব কাঠিন্য ছিল ওর সমস্ত অবয়বে। দোকানের মধ্যে আকস্মিক এ-ধরনের একটি জঙ্গী মূর্তির আবির্ভাবে, কাল-ভূমিব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায়, দোকানের কর্মচারীরা সন্দেহ-কুটিল বা সন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়েছিল শঙ্করাব দিকে। সে সন্ত্রাসের ছায়া পড়েছিল নিবারণের চোখেও। ক্যাশ-বাক্স জাপটে ধ'রে অনুধাবন কবার চেষ্টা করেছিল যুবাটিকে, এবং এক আবিষ্কাবের আনন্দ তাকে উল্লসিত করেছিল আকস্মিক—

—'আরে, শঙ্করা না? শঙ্করাই তো মনে হচ্ছে।

—'মনে হলে হচ্ছে। তা নিয়ে অত ভাবার কি আছে?'— জেদী জবাব যুবাটির।

অকস্মাৎ যেন এক মত্ত হস্তী, ক্যাশবাক্সটি সজোরে ঠেলে সরিয়ে, গদি থেকে দ্রুত নেমে এসেছিল নিবারণ। সস্নেহ আলিঙ্গনে বদ্ধ করেছিল যুবাটিকে। আব তার আত্মগত কণ্ঠ কী এক মায়া-মমতায় বলে ওঠে— 'তুই তাহলে ফিরে এলি শঙ্করা আমি জানতাম, আমি জানতাম তুই ফিরে আসবি!'

অতঃপর নিবারণের কণ্ঠে উচ্চকিত হাঁক— 'ওরে চা নিয়ে আয়, শঙ্করাকে চা দে। আর দ্যাখ্ তো, সিঙ্গাড়া ভাজলে নিয়ে আয়।'

অতঃপর যেন এক প্রিয়-মিলনের আনন্দ। নিবারণ কিছুটা বৎসল-স্বভাব। কিন্তু শঙ্করাকে কেন্দ্র করে তার এ-জাতীয় আচরণকে কেউ আদিখ্যেতা হিসেবে অভিহিত করলে বিশেষ অন্যায় হবে না। এটা জেনেও নিবারণ যেন আচরণে কিছুটা ভারসাম্য হারায়। ছেলেকে কেন্দ্র করে ভিতরে ভিতরে কোথায় যেন একটু তাপ সঞ্চিত হচ্ছিল। নিবারণের পুত্রটি, নাম যার পলাশ, এই বয়সেই একটি নির্গুণ এঁড়ে গরু, অথচ কাপ্তানীতে ওস্তাদ, ফলে নিবারণের অন্তরের পরিশ্রমী সৎ মানুষটি তার সমস্ত পিতৃস্নেহ সত্ত্বেও ছেলের প্রতি ক্রমশঃ বিরূপ হয়ে উঠছিল। তুলনায় অনাথ, এই পথে কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেটির পুরুষালী তেজ, জীবনকে জিতে নেবার একরোখা লড়াকু মনোভাব, শঙ্করার প্রতি নিবারণের এক ধরনের আকর্ষণ তৈরী করে। জীবন-সংগ্রামে সে এক অকপট যোদ্ধা, অন্য কাউকে সে যুদ্ধে সামিল হতে দেখলে, তাকে বাহবা দিতে নিবারণের ভিতরটা স্বভাবতই উদ্‌গ্রীব হয়।

শঙ্করা চা সিঙ্গাড়া খায়। তারপর নির্ব্যাজ প্রস্তাব রাখে — 'দাসমশায়, একটা কথা বলব, রাখতে হবে।'

সম্বোধনটা কানে লাগে, তবু এটা উপভোগ করে নিবারণ।

—'বল্ না, কি করতে হবে আমাকে!'

— 'কত জনের কাছে কত রকম কাজই তো করলাম। তা ভেবে দেখলাম, ওসব আমার পোষাবে না। এবার আমি নিজের মতো ক'বে বাঁচতে চাই। আপনাকে সাহায্য করতে হবে।'

— 'কি করবি, সেটা আগে বল্।'

ক্ষণিক বিরতি। সঙ্কল্পের স্থিরতা বোঝাতেই বোধহয় শঙ্করার এই বিরতিটুকুর অবকাশ। বলে—

—'ভালো কাজ তো আমাকে দিয়ে কিছু হবে না। আর কোনো বাঁধাধরা কাজে আমার মনও বসবে না। এখানকার থেকে কলকাতার বাজারে চালের দাম অনেক বেশী। ভাবছি, এবার চাল-পাচারের কাজটা শুরু করব। ঝুঁকি হয়ত আছে, তবে স্বাধীন ব্যবসা তো। পেরে যাব হয়ত।'

স্পষ্টতঃই নিবারণ আহত হয়েছিল মনে মনে। এতক্ষণ সে এই ভেবে উল্লসিত ছিল যে, ছোঁড়াটাকে একবার যখন পাওয়াই গেছে, এবার ওকে কাছে রেখে পুরোপুরি দোকানের কাজে গাঁটছড়া বেঁধে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। কিন্তু ওর দেখছি প্রতিকূল গাওনা।

নিবারণ বলেছিল — 'তোর যদি সেটাই ভালো লাগে, তাহলে তাই কর্।'

—'আমার কাছে কিন্তু মালকড়ি বেশী নেই। প্রথম দিকে ধারে কাজ শুরু করব। খাতায় হিসেব রাখবেন। পরে আস্তে আস্তে সব মিটিয়ে দেব।'

এভাবেই শুরু হয়েছিল শঙ্করার বর্তমান জীবন-যাত্রা। উৎস মুখে ছিল নিবারণ। জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকার হরেক ধান্দা, হরেক পথ।

আর তারও পরে শঙ্করার লড়াকু নেতৃত্বের অনুগত হয়েছিল এ লাইনের চাল-পাচারকারী মেয়ে-পুরুষের প্রায় সবকটি মানুষ।

সেই শঙ্করাই আজ আবার আশ্রয় দিয়ে ডেকে নিয়ে এসেছে আর এক লড়াকুকে। কি যেন নাম বলল ওর? রতন। আপন মনে ঘাড় নাড়ে নিবারণ— সাধ্যে যেটুকু কুলোয়, করতে হবে বইকি রতনের জন্যও।

।। আট ।।

কালগতিতে দিন অতিক্রান্ত হয়। এ-লাইনের ট্রেনের ভিড়ও দিনকে দিন কিংবদন্তীতে পরিণত হয়। কোনো আলিশান ভিড়কে উপমিত করতে হলেই বলা হয় —'আরে বাপ, এ যে দেখছি বনগাঁ লাইনের ভিড়।'— ভিড়ের চরিত্র নির্ণয় করতে যাত্রীমহলে চালু হয় নানা রসিকতা। টই-টম্বুর ভিড়ের মধ্যে এক যাত্রী বলে তার পার্শ্ববর্তীকে— 'ও দাদা, করছেন কি, সেই থেকে আমার উরু চুলকোচ্ছেন।'— পার্শ্ববর্তী যাত্রী অপ্রতিভ, কিন্তু সপ্রতিভ জবাব— 'ওঃ তাই বলেন, সেই জন্যেই সুখ পাচ্ছিনে। ওটা যে আপনার উরু, বুঝতে পারিনি ভিড়ের মধ্যে।'— ইত্যাকার নানা চালু রসিকতা।

টিকিট কাটার দায় নেই, সুতরাং যদিচ্ছা ট্রেন-ভ্রমণ বাধাহীন। টিকিট চেকার এ লাইনে একটি দুর্লভ সামগ্রী, কখনও এঁদের আবির্ভাব ঘটলেও ভিড়ের চেহারা দেখে নিরাপদ দূরত্বে আত্মগোপন করে‌ন। স্বল্পসংখ্যক মাসিক টিকিট এবং দৈনিক টিকিটের বিক্রি-বাটা থাকলেও মোটামুটি একটা সমীক্ষা চালালেই বোঝা যাবে, টিকিটছাড়া যাত্রীর পাল্লাটা কতখানি ভারী।

নিয়মিত অফিসযাত্রী ছাত্র, হকার, ব্যবসায়ী, ভেণ্ডার এবং হরেক ধান্দার যাত্রী-সাধারণেব সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইদানীং বোঝার উপর শাকের আঁটি-সদৃশ আরো কিছু লোকজন। সম্প্রতি পূর্ব বাংলায় 'জয় বাংলা' কায়েম হয়েছে। খান সেনাদের বর্বর অত্যাচারে যারা এদেশে প্রাণের দায়ে অনুপ্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাবা অধিকাংশই আবার 'জয-বাংলায' প্রত্যাবর্তন করেছেন। কিন্তু এদের একটা অংশ এখনো অবস্থান করছেন এদেশে। এ-রকম একটি মানসিক অনুভব তাদের মধ্যে সক্রিয—'আর কবে আসব, এদেশে এসেইছি যখন একবার, তখন কলকাতা নামক মহানগরীটির সঙ্গে যতখানি পারা যায, পরিচয়-টরিচয ক'রে যাওযা যাক।'— ফলে কলকাতা দর্শনের মহান কর্তব্যে রেল গাড়ীতে সকাল সন্ধ্যে এদের সমুপস্থিতি নতুনতর বিড়ম্বনা তৈবী করে। ট্রেনে ওঠানামা, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ানো ইত্যাদির যে সমস্ত স্বাভাবিক নিয়মাদি মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য, এরা তাতে ওয়াকিবহাল নয়, এবং তাদের এ অজ্ঞতা ভিড়েব গাড়ীতে নানা বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে।

কোনো অফিস-যাত্রী হয়ত ধমক দিলেন— 'গাড়ীতে উঠেছ, টিকিট কেটেছ?' — কিন্তু উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিসম্প্রদায় দাঁড়িয়ে থাকবে নির্বিকার, দৃষ্টিতে বিস্ময়, বক্তব্য যেন এই — 'কেন বাবু রাগ করছ মিছিমিছি, আমি না গেলেও তো তোমাদের গাড়ী যেতো। তোমাদের সেই যাওয়া গাড়ীতেই না হয় আমি একটু উঠে বসেছি। এর জন্য আবাব টিকিট কাটতে হবে কেন?'

হরেক মেজাজের, হরেক মর্জির যাত্রী। সীমান্তবর্তী এ অঞ্চলটির ক্রম-বর্ধমান জন-জীবনের উদ্বেলতার অংশীদার হয় ট্রেনের কামরাগুলি। যাত্রাপথে জটিলতা দ্বিগুণ থেকে দ্বিগুণতর হয়।

চাল-পাচারকারীদের দলও বৃদ্ধি পায় ক্রমশঃ। ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও মোটামুটি একটা লাভেব সম্ভাবনা, ক্রম-বর্ধমান বেকারী প্রভৃতি কারণে এ উপজীবিকাটিতে নতুন নতুন মুখের আমদানী হতে থাকে। এবং প্রথম দিকের ভীরুতা, লুকোছাপা ইত্যাদি অন্তর্হিত হয়ে এদের মধ্যে ক্রমশঃ প্রকাশ পেতে থাকল সংঘবদ্ধতা এবং বেপরোয়া মনোভাব। ট্রেনে সমস্ত চালের বস্তা না ওঠা পর্যন্ত ট্রেনের গার্ডের যোগসাজশে ট্রেন আটকে রাখা, কামরায় ওঠার মুখে চালভর্তি বিশালাকৃতি বস্তা সারিবদ্ধ সাজিয়ে যাত্রীদের ওঠানামায় ব্যাঘাত ঘটানো, অকারণে যাত্রীদের উত্তেজিত মেজাজ দেখানো,— প্রভৃতি ব্যাপার-স্যাপার চাল-পাচারকারীদের আচরণের একটি নিয়মিত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হতে লাগল। এরা বাধ্য থাকল না কোনো নিয়ন্ত্রণের সীমারেখা মেনে চলতে।

উপজীবিকাটিতে ক্রমশ নতুন নতুন মুখের আমদানি ঘটায়, দল এবং উপদলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শঙ্করার গ্রুপটিই বৃহত্তর বলে পরিগণিত হয় এবং অন্যান্য উপদলগুলির উপরও তার কর্তৃত্ব বজায় থাকে কমবেশী। রেললাইনের ও পারের কয়েকটি ছেলে, যারা বিস্তিকে কেন্দ্র ক'রে কিঞ্চিৎ রোয়াবী দেখানোর পরিকল্পনা ভেজেছিল, তারাও শঙ্করার একদিনের ঝাঁঝালো দাবড়ানিতে দমে গেছে। এবং বুঝেছে, এ-লাইনে ক'রে ক'ম্মে খেতে গেলে শঙ্করার মতো একটি শক্ত-পোক্ত তেজী বট-বৃক্ষের আড়ালে থাকাটাই নিরাপদ।

মুখে মুখে বার্তা ছড়ায়। আজ সন্ধ্যেয় শঙ্করার দলটির কাজ বন্ধ থাকবে দু'ঘন্টার জন্য। দলে এসেছে নতুন আগন্তুক। তার সঙ্গে পরিচয় হবে সকলের। স্টেশনের পাশে বটতলার মাঠে সন্ধ্যাকালীন সমাবেশের বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয় মুখে মুখে।

ভিন্ন ভিন্ন বয়সের শ'-দেড়েক নরনারীর সমাবেশ ঘটে সন্ধ্যাবেলায় উদ্দিষ্ট স্থানে। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে অফিস ফেরত যাত্রীদের মনে স্বাভাবিক কৌতূহল। কিন্তু সমাবেশের মধ্যে চাল-পার্টির লোকজনের উপস্থিতির অনুভবে অবজ্ঞা আর সন্ত্রাসে তারা দ্রুত পাশ কাটায়।

বৃত্তাকার সমাবেশটির মধ্যস্থলে শঙ্করা। তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তি রতন। যথাসম্ভব ঘাড় গোঁজ ক'রে সমাবেশটির গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করছে। এটি নিতান্তই একটি তামাশা, না অন্যকিছু, এটা অনুভব করতে না পেরে ক্রমশ তার বক-সদৃশ কণ্ঠদেশটি বক্রতা প্রাপ্ত হয়।

সারাদিন সে আজ শঙ্করাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে। নির্বারণ দাসের দোকানে পরিচয়-পর্বের পর চাল নিয়ে শঙ্করার সঙ্গে বেশ কয়েক ট্রিপ দিয়ে এসেছে কলকাতায়। বলা বাহুল্য, সব ব্যাপারগুলিই ঘটেছে শঙ্করার প্রত্যক্ষ নেতৃত্বাধীনে এবং রতনের শিক্ষানবিশী-পর্ব সন্তোষজনক।

উঠে দাঁড়ায় শঙ্করা। ভূমিকাহীন শান্ত গলায় বলে—'তোমরা সবাই শোনো। এব নাম বতন। আজ থেকে আমাদের দলের এক ভাই। আমরা ছাড়া ওর আর কেউ নেই।'

মেয়েদের দলটির মধ্যে একজন, নাম যার লতা, কল্‌কল্‌ ক'রে বলে ওঠে—

— 'কেউ নেই মানে, আমরা আছি কি জনি? ওই যে কথায় বলে না— যদি থাকে মোহন-বাঁশী, কত হবে সেবাদাসী। আমাদের রতন্ ভাইয়ের এমন মোহন-বাঁশীর মতন চেহারা, আমরা ওর জন্যি হাজার গণ্ডা সেবাদাসী ধ'রে আ'নে দেব।'

লতার সকৌতুক রসিকতায় সমাবেশটি উচ্ছল হয়ে ওঠে। হাসির দমকে উচ্চকিত হয় সবাই। আধো-অন্ধকারে বক্তা-রমণীটির মুখ দেখবার জন্য রতন একবার ঘাড়টা চকিতে উঁচু ক'রেই আবার নতমুখ হয়।

অনুভা ফোড়ন কাটে— 'ও লতাদি, তুই যে দেখছি একেবারে রসের হাঁড়ি উলটে দিলি। আচ্ছা পাগল বটে তুই।'

অনুভার কথায় লতা দমে না। বরং ওর খবখরে কণ্ঠস্বরে খেলা করে কৌতুক আর বেদনার আলোছায়া—

'আমারে তুই পাগল বল্‌লি ছেম্‌ড়ি! তয় শোন্—

—'আপনি পাগল, ভাতার পাগল, পাগল তার চেলা,

এক পাগলকে রক্ষা নাই, তিন পাগলের মেলা।

বুঝলি, আমরা সবাই পাগল। দ্যাখ্‌না, ক্যামোন পাগলের মেলা বসে গেছে।'

উপবিষ্ট একজন, কিছু বা বয়স্ক, উঠে দাঁড়িয়ে বলল—

—'ও শঙ্করা, তুমি কি এইসব নছল্লা শুনতি ডাকে আনলে আমাদের? সভ্য-ভব্য কথা দুই চারডে হলি তাই কও।'

ফোঁস করে লতা— 'ও বাবা, এ যে নাকের চেয়ে নাকের ডাক বেশী। তা কোন্ কত্তায় কথাডা ব'লে।' মুখখান এদিগি এট্টু ফেরাও দেখি, বদনখান্ দেখি। আমি কারো ডরাই নাকি? আমারও নাম লতা। মনে রাখবা — 'স্যাক্‌রা বাড়ীর বেড়াল ঠক্‌ঠকিতে ভয় পায়না।'

বিন্তি লতার হাত ধরে টেনে বলে — 'তুমি বসোতো লতাদি। সব কথায় তোমার কথা বলতে হবে নাকি?'

হঠাৎ লতা, পর্যুদস্ত, বিষণ্ণ, ছিন্নমূল লতার মতোই থুপ্ করে বসে পড়ে বিন্তির পাশে। দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থাকে নিস্পন্দ। নিরুদ্ধ অশ্রুর দমক তার পৃষ্ঠদেশে থর থর কম্পন তোলে। অনুভা, বিন্তি তার পৃষ্ঠে হাত বোলায় মমতায়। কিন্তু তারা কেউই বুঝতে পারে না, ক্ষণকাল আগে যে লতা ছিল পরিহাসপ্রিয় কৌতুকময়ী, তারপর প্রতিপক্ষের প্রতি ক্ষমাহীন ক্রোধময়ী, সেই কেন এখন এমনভাবে অশ্রুপাত করছে! স্বামী পরিত্যক্তা, অভাব-দুঃখে পোড়খাওয়া এই মেয়েটি বরাবরই কিছু খামখেয়ালী, কখনও রসিকা, কখনো রুক্ষ, কখনও মনের দুঃখে বিগলিতা। কথায় কথায় ছড়া কাটার স্বভাব। কিন্তু এমত রোরুদ্যমানা মূর্তি তো তার বিরল।

ক্ষণপরেই লতার থেকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল ভিন্ন দিকে। উঠে দাঁড়িয়েছে দলের নবাগত একটি ছেলে। কিঞ্চিৎ জঙ্গী-ভাবাপন্ন। ময়লাটে শার্টটার আস্তিন গোটানো, সেটাকে আরো কিছুটা গোটানোর প্রচেষ্টা সেরে চড়া গলায় বলে— 'আমি একটা প্রস্তাব রাখছি। শঙ্করাদাও শোনো। আমার কথা মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছে। আমি বলছি, আমরা যে কাজ করছি, সবাই ছাড়া-ছাড়া ভাবে করছি। এটা ঠিক হচ্ছে না। আজকাল কলকারখানা, অফিস সব—জায়গায় ইউনিয়ন তৈরী করছে। ইউনিয়ন গ'ড়ে মালিক অথবা সরকারের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধে আদায় করছে। আমাদেরও একটা ইউনিয়ন গ'ড়ে তোলা দরকার।'

সমবেত জন-মণ্ডলীর মধ্যে হাল্‌কা গুঞ্জন। সে গুঞ্জনে ছেলেটির বক্তব্যের প্রতি সকলের সমর্থনের ইঙ্গিত।

উঠে দাঁড়ায় ভিন্ন বক্তা— 'একাজে আমাদের সকলের মত আছে। তবে শঙ্করা ভাই কি বলে, সেটা আগে শোনা চাই। ওর মত না হ'লে একাজ হবে না।'

উঠে দাঁড়ায় শঙ্করা। দ্বিধা এবং অপ্রস্তুতের ভাব তার স্বাচ্ছন্দ্যকে ব্যাহত করে। ছেলেটির এই প্রস্তাবটির আকস্মিকতায় সে কিঞ্চিৎ বিহ্বল। এবং সমবেত জনতাকে সম্বোধন ক'রে ভাষণাদি দানের ব্যাপারে অপটুতা তাকে ক্লিষ্ট করে।

যে ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে দৃপ্ত অথচ সংক্ষিপ্ত ভাষণে ইউনিয়নের প্রস্তাব রাখল, প্রতিদিনকার কর্ম-সুবাদে মোটামুটি ওর পরিচয় জানে শঙ্করা। নাম বরুণ। বেকারত্বের জ্বালায় এ-লাইনে আজকাল দু'চারটি শিক্ষিত ছেলেমেয়েও যুক্ত করেছে নিজেদের। এ ছেলেটিরও স্কুলের উঁচু ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষালাভের কথা শুনেছে শঙ্করা। অধিকন্তু একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তার যোগ আছে, এ-ধারণাটিও চাল-পার্টির মধ্যে বহুলভাবে প্রচারিত। ছেলেটির সুস্পষ্ট, সুসংবদ্ধ প্রস্তাবটির উত্তরে আনপড়, সমাবেশে ভাষণদানে অনভ্যস্ত, শঙ্করা স্বভাবতই ক্লিষ্ট বোধ করে।

তবু শঙ্করা উঠে দাঁড়িয়ে, ধীরে ধীরে পরিষ্কার উচ্চারণে বলে—'এ প্রস্তাবে আমার অমতের কিছু নেই। এ তো ভাল প্রস্তাব। তবে একটা কথা হ'ল, অফিস কারখানার বাবুরা মালিকের বিরুদ্ধে, সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে। আমরা কার বিরুদ্ধে লড়াই করব? আমাদের কাজের ভালমন্দ, আমাদেরই ঠিক ক'রে নিতে হবে। তাছাড়া, আমরা কয়েকজনে মিলে একটা ইউনিয়ন গড়লাম। আবার আর এক দল মিলে আর একটা ইউনিয়ন গড়ল। তারপর হয়ত আর এক দলে আর একটা ইউনিয়ন গড়ল। তখন যদি এক ইউনিয়নের সঙ্গে আর এক ইউনিয়নের ঝগড়া—মারপিট লেগে যায়, তখন কে সামলাবে?'

জনতার একজন বলে—'তাহলে তুমি কি করতে বলো?'

শঙ্করা একটু থেমে, কেশে, কণ্ঠের জড়তা কাটিয়ে বলে—

—'আমি বলি, এখন যেমন চলছে, চলুক। ভবিষ্যতে যদি দরকার হয়, আমাদের অবশ্যই ইউনিয়ন গড়তে হবে। এখন এর কোনো দরকার আছে বলে মনে হয় না। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে। এ লাইনে আমরা নতুন পুরোনো যে যেখানে কাজ করছি, সকলের একটা যোগাযোগ, ঐক্য রাখতে হবে। কারো কোনো অসুবিধে হ'লে, সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার সমাধান করতে হবে। মনে করতে হবে, আমরা সবাই এক পরিবারের মানুষ, আমাদের সবার সুখ-দুঃখ এক।'

জনতার মধ্য থেকে সমবেত কয়েকটি কণ্ঠ—

—'ঠিক ঠিক, শঙ্করা-ভাইই ঠিক কথা কইছে। আমাদের এই কথাই মেনে চলতে হবে।'

প্রস্তাব-দাতা বরুণ এবং তার সহযোগী আর দু'একজন শঙ্করের কথায় ঐকমত্য হ'ল না। কিন্তু গোটা দলটির মধ্যে শঙ্করার অবিসম্বাদিত প্রভাব এবং অকুণ্ঠ সমর্থনের বিরুদ্ধে দ্বিমত পোষণের অবকাশ পেল না।

ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্তী বাজারের তেলেভাজার দোকানের একটি ছেলে, শাল পাতার কয়েকটি স্থূলাকৃতি পেটিকায় বেগুনী আর আলুর চপ নিয়ে এল। সমাবেশের আগেই শঙ্করা সকলের কাছ থেকে, নিজস্ব সাধ্যানুযায়ী চাঁদা সংগ্রহ করেছিল এবং তা জমা দিয়ে এসেছিল তেলেভাজার দোকানে। দোকানী তার বালক-কর্মচারীটির হাতে যথাসময়ে পাঠিয়ে দিয়েছে বেগুনী আর আলুর চপ। সুস্বাদু তেলেভাজার ঘ্রাণ লোলুপ করে সকলের রসনাকে। আগের সেই ছেলেটি, বরুণ, যার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় কিছু বিমর্ষ ছিল, অকস্মাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত প্রসারিত ক'রে দেয় দুদিকে। তারপর বলে—

—'আপনারা আগে কেউ খাবারে হাত দেবেন না। আমি প্রস্তাব রাখছি, যার সম্মানে আজ আমরা এখানে মিলিত হয়েছি, দলে নবাগত আমাদের সেই রতন-ভাইই আজ সবাইকে খাবার পরিবেশন করবে। আমরা সবাই আজ রতন-ভাইয়ের অতিথি। কই রতনভাই, এগিয়ে এসো—তুমি সবাইকে খাবার পরিবেশন ক'রে সকলের সঙ্গে পরিচিত হও।'

সমবেত জনতার উল্লাস ধ্বনি— 'খাঁটি কথা, খাঁটি কথা— এ প্রস্তাব আমরা সবাই সমর্থন করি।'

শঙ্করা রতনকে ধাক্কা দেয়—'এ্যাই রতন, কথা কানে যাচ্ছে না— এগিয়ে যা।'

এসব বিষম কাণ্ডকারখানায় রতন যেন এতক্ষণ ভূত-গ্রস্তের মত উপবিষ্ট হয়ে ছিল। শঙ্করার আকস্মিক ধাক্কায় উঠে দাঁড়ায়, তেলেভাজার চাঙারি নিয়ে সকলকে পরিবেশন করে একে একে, সামান্য সেই তেলেভাজার টুকরোগুলোকে কেন্দ্র ক'রে পরস্পরের মধ্যে গ্রথিত হয় একটি নিবিড় ঐক্যসূত্র।

বিন্তির হাতে দুটো তেলেভাজা ধরিয়ে দিয়ে রতন বলে—'তোমার নাম বিন্তিদি?'

চমক খায় বিন্তি। রতন নামক এই নবাগত ছেলেটি ওর থেকে বয়সে বেশ কয়েক বছরের বড়ো এবং এক ডাকাবুকো যুবক। তার কাছে আকস্মিক দিদি সম্বোধন বিন্তিকে অপ্রস্তুত করে। বলে—

—'হ্যা, আমিই বিন্তি, তা তুমি আমার নাম জানলে কি করে?'

রতনের চোখে মুখে এখন যেন এক রহস্যময় কৌতুক খেলা করে— 'আমি তোমার সব কথা জানি বিন্তিদি, শঙ্করাদা সব কথা বলেছে আমাকে।'

এক মুহূর্তে বিত্তি যেন এক ভার-ভারিক্কি দিদি। কপট ক্রোধে কণ্ঠে তার গাম্ভীর্য—

—'ও, এই হচ্ছে বুঝি দুই বন্ধুতে মিলে।'—

শঙ্করার দিক হাঁক ছাড়ে— 'এই যে শোনো, কি বলেছ সব তোমার এই নতুন শাগরেদটাকে আমার নামে?'

শঙ্করা যেন কত ভয়ে ভীত—'ওরে বাবা, সত্যি বলছি বিত্তি, এই কান ছুঁয়ে বলছি, আমি কোনো কথা বলিনি—। এ্যাই রতনা, আমার নামে মিছেমিছি কি সব কথা বলছিস?'

উপস্থিত সকলে শঙ্করা বিত্তি আর রতনের চাপল্যে কৌতুকের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হাসে।

স্বল্প দূরে, সমাবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন, একাকী, জড়পিণ্ডবৎ বসে ছিল লতা। সমাবেশের আলোচনা, উল্লাস, আনন্দ— সবকিছুরই যেন সে স্পর্শাতীত।

বৃদ্ধা মানদা এগিয়ে যায় শঙ্করার কাছে। কিঞ্চিৎ চাপাস্বর, যেন লতার কানে না পৌঁছায়, বলে— 'তোরা সগোলে লতারে ডা'কে আ'নে এটু বুঝো। মনে বড় ঘা খাইছে মেয়েডা।'

শঙ্করার কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা—'কি হয়েছে মাসি লতাদির?'

একসঙ্গে ট্রেনে চাল-পাচারের সহযোদ্ধা সবাই। কিন্তু সকলের ব্যক্তিগত জীবনের খোঁজখবর রাখার কতটুকু অবকাশই বা আছে এদের জীবনে!

মানদা বলে— 'তোমরা তো জানো, ওর সোয়ামী ওরে নে না। ওর সোয়ামী থাকে জয়-বাংলায়। এট্টা ছেলেও হইল লতার। তা, সে ছেলেডারে কা'ড়ে রা'খে ওর ভাতার আবাগীর ব্যাটা ওরে তাড়ায়ে দেয়। এব দুয়োরে ওর দুয়োরে কতদিন লাথি-ঝাঁটা খাইয়ে মেয়েডা শ্যাষকালে বুড়ো মা-ডারে নিয়ে এই দ্যাশে চলে আসে। সাঝির হাটের কালের কূলে মা আর মেয়ে এট্টা ছাপড়া বান্ধে থাকত। মা-ডা আবার দুই বছর চোখে ছানি প'ড়ে অন্ধ হয়ে গেছে। লতাই এই চালের বেলাক ক'রে মা-মেয়ের প্যাটের ভাত জোটাতো। আর ছেলেডার কথা মনে ক'রে মাঝে মাঝে কি কান্নাডা যে কান্দে। কয়, আমার বাছার মুখখান যদি একবার এট্টু দেখতি পারতাম।'

শঙ্করার কণ্ঠে কিঞ্চিৎ উত্তাপ—'তো সেসব পুরোনো কথা ভেবে কান্নাকাটি ক'রে এখন কোন্ লাভটা হবে?'

মানদার কণ্ঠে আর্তি— 'ওরে বাবা, সেই কথাডাই তো কতি যাচ্ছি তোগের। জয়-বাংলা থেকে খবর আইছে, ওর ছেলেডা নাকি সাপের কামড়ে মারা গেছে।'

শঙ্করা আকস্মিক বিহ্বল—'বলো কি মাসি, কে খবর দিয়ে গেল? ঠিক খবর তো,— না কেউ বানিয়ে গল্প বলে গেলো?'

—'না রে বাবা, খবর ঠিক। জয়-বাংলা থেকে লতার এক ভাসুরপো আ'সে খবর দিয়ে গেছে। খবর শোনার পর থেকেই নাকি পাগলের মতন করতিছে। কখনো হাসতিছে, কখনো কাঁদতিছে, আবার কখনো মারকুটে পাগলের মতো ব্যাভার করতিছে। ওর পাড়ার একটা মেয়ের কাছে শোনলাম, কাল রাত্তিরে নাকি ওর কানা মা-ডারে ধ'রে গোরুর মতো মারিছে। তোরা বল্, পাগল না হলি কেউ এমন কাজ করতি পারে?'

মানদার কথায় ওর পারিপার্শ্বিকে ভিড় জমে। সবাই ওর কথা শোনে উৎকর্ণ। মানদা বলে—

—'সকালে চালের দোকানে ওরে দেখি, চোখ মুখ ফোলা, থম্‌থম্ করতিছে। বোঝলাম, ব্যাপার কিছু ঘটিছে। তা যা কই, কোনো কথার উত্তর দে না। ডা'কে নিয়ে বসালাম শনি ঠাউরের মন্দিরে। গায়-মাথায় হাত বুলোয়ে বাত্তা নিতিই হাউ হাউ ক'রে সে কি কান্না! আমারে জড়ায়ে ধ'রে কান্দে আর কয়, —মাসি, এট্টা প্যাটের কাঁটা ছেলো, চোখে দেখি আর না দেখি, জানতাম, আমার এট্টা ছেলে আছে,— তা, সেও আমারে ছা'ড়ে চলে গেল মাসি। আমারে 'মা' বলে ডাকার আর কেউ থাকল না।— তা তোমরা সগোলে ওরে ডাকে এট্টু বুজোও।'

লতার শোকের অভিঘাত যেন স্পর্শ করে সবাইকে। সবাই দাঁড়িয়ে থাকে বিহ্বল, হতচেতন।

ধীরপায়ে এগিয়ে যায় সেই বৃদ্ধটি, যার সঙ্গে লতার বচসা দিয়ে শুরু হয়েছিল সভার প্রারম্ভিক পর্বটি। পায়ে পায়ে অগ্রসর হয় বৃদ্ধটি, অগ্রসর হয় এবং ধীরে ধীরে গিয়ে উপনীত হয় প্রস্তরমূর্তি-সদৃশ উপবিষ্টা লতার পাশে।

পরম যত্নে এবং স্নেহে ন্যস্ত হয় তার দক্ষিণ হস্তটি লতার মাথার উপর। এবং তার মায়াময় প্রগাঢ় কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়—

—'কাঁদিস্‌নে বুন্‌ডি, কাঁদিস্‌নে! কা'ন্দে কি করবি ক'। ভগোমান যারে নেছে, হাজার কা'ন্দেও তো তারে আর ফিরে পাবিনে।'

মায়াময় এই কণ্ঠস্বরের স্পর্শে লতার শুষ্কপ্রায় চোখ দুটিতে আবার নামে অঝোর বর্ষণ। শঙ্করা বলে— 'লতাদি, তুমি আজ আর কোথাও যেও না। বাড়ী চলে যাও। চলো, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। বাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।'

লতা অঞ্চল-প্রান্তে চোখ মোছে। উঠে দাঁড়ায় বজ্রদগ্ধ নিষ্পত্র বৃক্ষেব মতো। পারিপার্শ্বিক সব কিছুতে যেন অভিমানী ঔদাসীন্য।

রতনকে বলে শঙ্করা— 'তুইও আজ বারাসতে তোর মাসির বাড়ী চলে যা রতন। কাল ভোর-ভোর চলে আসিস দাসমশায়ের দোকানে।'

সভা ভঙ্গ হয়। কেউ ঘরে ফিরতে আগ্রহী। অধিকাংশই ছোটে চালের বাজারে। পয়সা তো পদব্রজে ঘরে আসে না। পরিশ্রমের বিনিময়েই তা সংগ্রহ করতে হয়। চাল নিয়ে দু'এক ট্রিপ্ কলকাতায় যেতে পারলে কিছু পয়সার সংস্থান।

ওদিকে লতাকে অগ্রবর্তী রেখে, শঙ্কবা এবং বিত্তি লতাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে অগ্রসর হয়।

।। নয় ।।

চৈত্রের শুরুতেই এবার আকাশ যেন অগ্নিময়। মেঘ বা বৃষ্টিপাতের ক্ষীণতম সম্ভাবনাও তিরোহিত। সূর্য যতই আকাশের মধ্যপথে গতিশীল, অগ্নিতেজে ততই যেন জগৎ-সংসার দগ্ধায়। সাধারণ্যে এমত ধারণা প্রচারিত হ'ল, বাংলাদেশে খান্ সেনারা নাপাম-জাতীয় যে সব বোমা ব্যবহার করেছিল, এসব তাবই প্রতিক্রিয়া। বেশ কিছুদিন ধরে একটি মারাত্মক চক্ষুরোগ সংক্রামক আকারে এ-দেশে ব্যাপ্ত, এটিও গৌরবে 'জয়বাংলা' নামে আখ্যায়িত হয়েছে। বিগত কয়েকদিন বিত্তি এই জয়বাংলা-র আক্রমণে বড়ই কাবু, উপরন্তু আজ প্রখর রৌদ্রে উপর্যুপরি ছুটোছুটি এবং উদ্বেগ দুশ্চিন্তার পীড়নে জেরবাব।

স্টেশনের অদূরবর্তী ঔষধালযটির সন্মুখবর্তী বেঞ্চটার উপর বিত্তি ছিল উপবিষ্ট। এবং তাকে বাধ্যতামূলক ভাবে ধৈর্যশীল থাকতে হচ্ছিল। কারণ ঔষধালয়টিতে দ্বিপ্রাহরিক বিরতি, ফলে ঝাঁপ বন্ধ। বিরতির পর দোকান না খোলা পর্যন্ত তাকে থাকতে হবে অপেক্ষমাণ।

গতকাল রাত্রে বাড়ী ফিরেই বিত্তি বুঝেছিল, বাবার অবস্থা সঙ্গীন। উমাপতির শারীরিব অবস্থা দিনে দিনে অবনতির দিকে। বযসের জীর্ণতা তো আছেই, তদুপরি নানা রোগের উপসর্গ। বায়ু পিত্ত কফ তিনটিই প্রবল। উপরন্তু গতকাল থেকে মারাত্মক জ্বরের আক্রমণে জীবনী-শক্তি তলানিতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। রাত্রে বাড়ী ফিরে বিত্তি দেখেছিল, বাবা প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন, প্রায় সজ্ঞাহীন। মাঝে মাঝে বিড বিড প্রলাপ বকছেন। প্রতিবেশিনী এক সহৃদয়া বৃদ্ধা দিনভর

যথাসম্ভব সেবা করেছে উমাপতির। রাত্রে বিন্তি ফিরে আসতেই বৃদ্ধা বলেছিল— 'ওনার অবস্থা তো ভালো দেখছি নারে বিন্তি।'

সারাদিনের কর্মক্লান্ত, ক্ষুধার্ত বিন্তি — কী-ই বা জবাব দেবে এ-কথার। শুধু বলেছিল— 'এবার তুমি বাড়ী যাও মাসি। আমি তো এসে গেছি।'

অতঃপর বিন্তি সারারাত বাবার পার্শ্বে বসে ছিল নিদ্রাহীন। মাথায় জলপটি দেওয়া, হাওয়া করা, এসব ছাড়া রোগীর যন্ত্রণা-লাঘবের দ্বিতীয় কোনো উপায় ছিল না অত রাত্রে। ডাক্তার ডাকা, ওষুধ কেনা-ইত্যাদি কাজগুলির জন্য পরবর্তী সকালটির জন্য তার ছিল উৎকণ্ঠিত অপেক্ষা। শুনশান গভীর রাত্রি, মাঝে মাঝে রাত্রিচর পশুপাখির ডাক, মুমূর্ষু পিতার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট বিন্তি। সারা দেহে সীমাহীন ক্লান্তি, কখনো চোখ জুড়ে নেমে আসছিল নিদ্রার ভার। পরমুহূর্তে জ্বরাচ্ছন্ন উমাপতির প্রলাপোক্তিতে ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল তার তন্দ্রার আবেশ। উৎকর্ণ বিন্তি অনুধাবনের চেষ্টা করেছিল বাবার প্রলাপ-বচনের অর্থ-সূত্র। উমাপতির প্রলাপ-বচনগুলির অধিকাংশেরই কেন্দ্রমূলে ছিল বিন্তি। —'বিন্তিরে, তোকে আমি কার কাছে রেখে যাব,'— 'বিন্তিরে, তুই আমার মেয়ে, তুই কোনো খারাপ ছেলের সাথে মিশ্‌বিনা,'— 'বিন্তি, তুই আমার মেয়ে, তুই উপার্জন ক'রে আমাকে খাওয়াচ্ছিস, আমার লজ্জা করে,'— 'দেখিস, ! বিন্তি, এবার আমি ভালো হয়ে উঠেই তোর বিয়ে দেব'— এমনি সব অসংবদ্ধ, অস্ফুট প্রলাপ-বচন।

এসব কথা শুনতে শুনতে সেই নিশুতি রাত্রের নিস্তব্ধতায় বিন্তির কাতর চোখ দুটি আরো যন্ত্রণার্ত হয়ে উঠেছিল। প্রবল এক দাহ যেন দগ্ধ করছিল তার সর্বাঙ্গ। সংসারে তার বাবা তার একমাত্র শেষ আশ্রয়। বাবা তার বৃদ্ধ, রোগজীর্ণ, চলৎ-শক্তি হীন, তবু মাথার পরে বটবৃক্ষের মতো আশ্রয়ের ছায়া মেলে রয়েছেন। বাবা যদি চলে যান আকস্মিক, সে দুর্দিনের দুঃসহতা কল্পনাও করতে পারে না বিন্তি।

সকাল হতেই বিন্তি দ্রুত শেষ করেছিল সাংসারিক গৃহ-কর্মাদি। একবার ভেবেছিল, শঙ্করাকে একটা খবর দেবে। কিন্তু কি ভেবে নিরস্ত হয়েছিল। ছুটে গিয়েছিল নিকটবর্তী ডাক্তারবাবুর চেম্বারে।

ডাক্তার-বাবুটির ডিগ্রি স্বল্প, কিন্তু স্বক্ষেত্রে অভিজ্ঞ। দরিদ্র উদ্বাস্তু এলাকায় ডাক্তারবাবুর ফি এবং ঔষধের মূল্য একসঙ্গে দুটির সংস্থান করা এদের অধিকাংশেরই সাধ্যাতীত। ফলে রোগীদের মতোই ডাক্তারবাবুর আর্থিক অবস্থাও কিঞ্চিৎ নড়বড়ে। তবে ডাক্তাববাবুর চেম্বারে রোগীর খাম্‌তি নেই। কারণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, খাদাভ্যাসে অনাচাব, অপুষ্টি ইতাদি যেখানে নিত্যসঙ্গী, সেখানে রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতা শিথিল হতে বাধ্য। বিন্তি যখন গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, ডাক্তারবাবুর বেড়ার ঘর ভর্তি রোগী, এবং বারান্দাতেও উপচীয়মান। বিন্তিকে দেখে ডাক্তারবাবু চশমার ফাঁকে অপাঙ্গে একবার তাকিয়েছিলেন। হুপিং কাশিতে ক্লিষ্ট একটি ছোট ছেলের বুকে স্টেথিসকোপ লাগাতে লাগাতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বিন্তিকে—'কি ব্যাপাব, তোমার আবার কি হ'ল?'

বিন্তি বলেছিল 'ডাক্তারবাবু, বাবার খুব অসুখ, আপনাকে একবাব যেতে হবে।'

উদ্বাস্তু-জীবনের সমভূমিতা এবং কিঞ্চিৎ শিক্ষা-দীক্ষার সম্পর্কে ডাক্তাববাবু এবং উমাপতি বন্ধুভাবাপন্ন। ডাক্তারবাবু নিজ কাজে ব্যাপৃত থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন—

—'মাস্টার মশায়ের কি হ'ল আবার?'

বিন্তি বলে— 'বাবার শরীব তো এমনিতেই ভালো যাচ্ছে না, তার উপব কাল থেকে বেদম জ্বর। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে 'ছেন।'

ডাক্তারবাবুর কণ্ঠে প্রফেশনাল নিস্পৃহতা— 'তুমি যাও মা, আমি এদের একটা ব্যবস্থা করেই মাস্টারমশাইকে দেখে আসব।'

ডাক্তারবাবুর আসতে দুপুর প্রায় অতিক্রান্ত। যত্ন নিয়ে পরীক্ষা করলেন উমাপতিকে। ডাক্তারবাবুর মুখ ক্রমশঃ গম্ভীরতর হয়। পরীক্ষান্তে ডাক্তারবাবু একটি দীর্ঘাকার প্রেসক্রিপশন লিখলেন এবং সেটা বিন্তির হাতে দিয়ে বললেন— 'এই ওষুধগুলো যে কিনতে হবে বিন্তি। টাইফয়েড বলে মনে হচ্ছে। তবে ভয় নেই। ওষুধগুলো পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বিন্তি সাধ্যানুযায়ী গোটা কয়েক টাকা ফি বাবদ ডাক্তারবাবুর হাতে দিতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু ডাক্তারবাবু উমাপতির প্রাক্তন শিক্ষকতা-বৃত্তি এবং পরিবারটির বর্তমান দুরবস্থা বিবেচনায় যথাক্রমে সমীহ এবং সহৃদয়তায় বললেন—

—'ওটা থাক্ মা, তুমি তাড়াতাড়ি ওষুধটা জোগাড়ের ব্যবস্থা করো।'

বাবাকে পথ্য খাইয়ে এবং নিজে যৎসামান্য মুখে গুঁজে বিন্তি দুপুরের প্রখর রৌদ্রতাপে ছুটেছিল স্টেশন-সংলগ্ন ঔষধালয়টিতে। কিন্তু ওর আশঙ্কা সত্যে পরিণত হ'ল। ঔষধালয়ের কর্মীরা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দ্বিপ্রাহরিক অবসরে বাড়ী চলে গিয়েছে। ঘন্টা তিনেকের কমে তাদের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা নেই। অতএব, দোকানের সামনের বেঞ্চটায় বসে উৎকণ্ঠিত অপেক্ষা ছাড়া বিন্তি এখন উপায়হীন।

এবং কর্মহীন অবসরের অর্থই হ'ল দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা। এই এলাকার জঙ্গুলে মশাগুলোর মতোই তারা যেন ছেঁকে ধরে বিন্তিকে। অমোঘ, অপ্রতিরোধ্য। সামনেই অজগর-সদৃশ সুদীর্ঘ কৃষ্ণ-পিচ-রাস্তাটি। পূর্বে যশোর রোড থেকে বেরিয়ে রেলস্টেশনের প্রান্ত স্পর্শ করে অনতিদূরবর্তী সঙ্কীর্ণ খালটি অতিক্রম করে পশ্চিমে ধাবমান। এখন প্রখর রৌদ্রতাপে ঈষৎ গলিত।

ঐ কৃষ্ণকায় সড়কটি যেন বিন্তির অস্থির ভাবনায় নিজস্ব ভাগ্যের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় দ্যোতিত হয়। স্বপ্নময় অতিক্রান্ত অতীত, বর্ণহীন একঘেয়ে বর্তমান, আর দিকচিহ্নহীন অন্ধকার-লিপ্ত ভবিষ্যৎ। আঠারো বছর বয়সেই জীবনের সব স্বপ্ন-সাধ নিঃশেষিত। শুধু বেঁচে থাকার, টিঁকে থাকার অন্তহীন সংগ্রাম। দীর্ঘ দৃষ্টিপাতেও কোথাও কোনো ছায়ানীড় সুলক্ষ্য নয়, বরং ঈষৎ অসাবধানতার রন্ধ্রপথেই যে আবির্ভাব ঘটতে পারে যে কোনো চূড়ান্ত সর্বনাশের ভয়াবহতা, এ চিন্তা আবিল ক'রে রাখে তার দিন রাত্রি গুলোকে।

বার্ধক্য এবং রোগজীর্ণতা সত্ত্বেও বাবা তার মাথার পরে এখনো এক বনস্পতি-সদৃশ ত্রাতা, কিন্তু আর কতদিনই বা অটুট থাকবে এই ছায়াতরুটি। যুবতী কন্যাকে তিনি পাত্রস্থ করতে পারেননি, বরং তারই উপার্জন ব্যতিরেকে তিনি দেহধারণে অক্ষম, ইত্যাদি চিন্তা বৃদ্ধের দিবারাত্রকে রক্তাক্ত করে। বর্ণ-কৌলিন্য এবং শিক্ষা-কৌলিন্য—এ দুটিকে কেন্দ্র ক'রে আবাল্য গড়ে ওঠা তাঁর জীবনবোধ, যা তাঁর অন্তরে স্বচ্ছ অহমিকার কুয়াশা আস্তীর্ণ করে রাখত, এখন তা সমূলে বিনষ্ট। অর্থ-কৌলিন্যের সর্বনাশী প্রয়োজনীয়তাকে তিনি এখন তীব্রভাবে অনুভব করেন। গত রাত্রে জ্বরের ঘোরে বাবার সেই প্রলাপোক্তিগুলি স্মরণে আসে বিন্তির। বাবার সেই যন্ত্রণা স্পর্শ করে বিন্তিকেও।

দুপুরের ঝাঁঝালো রোদে পথিকের আনাগোনা স্বল্প। মাঝে মাঝে তীব্র গতিময় কোনো বাস বা লরি হর্ন বাজিয়ে রাস্তা অতিক্রম করে। বেঞ্চের উপর কর্মহীন বিন্তির অখণ্ড অবসর। হঠাৎ রাস্তার উপর ভেসে ওঠে সাদা-মেরুন স্কুল-ড্রেসের ছোট বড়ো মেয়ের একটি দল। কলধ্বনিতে মাতোয়ারা তারা ক্রমশঃ দৃষ্টির সীমানা অতিক্রম করে। স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রী ওরা, ছুটির পর ঘরমুখো। আঠারো অতিক্রান্ত, বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাতে সহিষ্ণু এবং বাস্তবের সঙ্গে

একাত্মবোধে অভ্যস্ত বিত্তির সাম্প্রতিক চেতনাতেও, আজও বড় তীব্রভাবে স্কুল ড্রেস-পরা মেয়েদের দল আলোড়ন তোলে। যা সে হতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি, ঐ মেয়েগুলি যেন তারই সচল, প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি।

এ আবিষ্টতা ক্ষণকালের, পরমুহূর্তে বিত্তির চিন্তা ন্যস্ত হয় অন্যত্র। ব্যবসার লাইনে নিত্য নতুন মুখের ঘটছে আমদানি। ফলে জটিলতা এবং প্রতিযোগিতা— উভয়ই বর্তমান। এই প্রতিযোগিতায় কতদিন সে টিকে থাকতে পারবে? অবশ্য অভিজ্ঞতা এবং বয়স দিন দিন তাকে কৌশলী, সতর্ক এবং চতুর হতে সাহায্য করছে। এ লাইনে অনেকটাই সে স্বাবলম্বী এখন। শঙ্করার উপর নির্ভরতার প্রয়োজন এখন সীমিত। কিন্তু এটুকুও বিত্তির অনুভবের জগতে বড়ই স্পষ্ট যে, শঙ্করার সতর্ক দৃষ্টির একটি অদৃশ্য আবরণ তাকে ঘিরে থাকে প্রতিনিয়ত। এমনিতে চুপচাপ, নিঃশব্দ, কিন্তু তার নিরাপত্তার সামান্য ব্যাঘাতেও যে শঙ্করা জঙ্গী, সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে, এতে তো সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ফলে বিত্তির গতিবিধি থাকে সহজ, স্বচ্ছন্দ, অবারিত। সে বিচারে, শঙ্করার উপর সে নির্ভরশীল বইকি! কিন্তু এর বাইরে শঙ্করার ভিন্নতর কোনো অস্তিত্ব তো সে কখনো অনুভব করে না অন্তরের গভীরে। শঙ্করা শুধু তার নিরাপত্তার প্রহরী, হৃদয়ের দোসর বলে তো তাকে কখনো ভাবতে পারে না বিত্তি।

আবার কখনো প্রতিদিনের এই লড়াকু জীবন, হিসেব-নিকেশের ব্যস্ততার জীবন ছাপিয়ে ভিন্ন এক চিন্তা তাকে উদ্বেল করে। এ-কোন্ জীবন সে যাপন করছে? এই জীবনই কি তার বিধি-নির্দিষ্ট? চালের চোরাচালানীর এই জীবন তাকে দেবে কোন্ সার্থকতা? নিদারুণ এক বিদ্রোহ মাঝে মাঝে নির্মম আঘাত হানে তার সারা হৃদয় জুড়ে।

এই সব চিন্তা বিত্তিকে আবিষ্ট রাখে দীর্ঘক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে এই সব কথা, এই সব মানুষ সরে যায় তার দৃষ্টি-পথ থেকে। উজ্জ্বল একটি আলোকিত বৃত্ত হয়ে তার অন্তরে ভাসে অন্য এক মানুষ। অনিমেষ।

দীর্ঘদিন অনিমেষের সঙ্গে দেখা হয় না। না স্টেশনে। না ট্রেনে। ম্যাজিকের মতো যেন সে উধাও। ওকে একটু দেখতে পাবার উদগ্র বাসনা বিত্তিকে যেন পাগল-পাগল করে। রেললাইন পার হয়ে যশোর রোডের কাছাকাছি যে অর্থবান লোকদেব বসতি-স্থান, বিত্তি শুনেছে, ওখানেই নাকি থাকে অনিমেষ। ওটাও উদ্বাস্তু-এলাকা, কিন্তু উচ্চতর ব্যবসা-সুচাকুরি ওখানকার বাসিন্দাদের জীবন-যাত্রার মান সচ্ছল করে রেখেছে। বিত্তির মনে কখনো কখনো এ-জাতীয় দুঃসাহসিক চিন্তাধারা উদ্রিক্ত হয়েছে, একদিন ওখানে গিয়ে সে খোঁজ করবে অনিমেষের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস বজায় রাখতে পারে না। ওটি যেন এক ভিন্ন এলাকা, সুদূরতম স্বপ্নের দ্বীপ। কল্পনা আর স্বপ্নেই ওখানে পৌঁছানো যায়, বাস্তবে তা ধরা-ছোঁয়ার অতীত। ঐ ভদ্র পরিশীলিত জীবন, চিরদিনই তার কাছে থেকে যাবে অগম্য। তবু অনিমেষের সামান্যতম স্মৃতি-চারণায় তার সারা মন উদ্বেল, উচ্ছল হয়ে ওঠে। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির ঊর্ধ্বে সে যেন এক অলৌকিক ভাললাগা, ভালবাসা।

হঠাৎ মনে পড়ে কিছুদিন আগে শোনা কয়েকটি সংলাপ। ফটিক এবং ওর দলের কয়েকটি ছেলে প্রথমদিকে অনিমেষকে কেন্দ্র করে ওকে উত্যক্ত করার চেষ্টা করেছিল। শঙ্করার ধমকে তা নিবৃত্তও হয়েছিল। কিন্তু আড়াল-আবডাল খুঁজে পরিহাসের তীর ছাড়তে দ্বিধা করে না।

স্টেশনে একদিন ট্রেনের জন্য বিত্তি ছিল অপেক্ষমাণ। ওপাশে ফটিক এবং আরো কয়েকজন। তাদের মুখে নানা সংলাপ। বলা বাহুল্য বিত্তিকে শোনানোই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

—'পাখী তো উড়েছে, এবার পাখনীর কি হবে রে?'

— 'পাখী গেছে দিল্লী, এবার কাঁদো বসে বিল্লি।'

—'পাখীর ঘরে আসবে রাঙা তুলতুলে নতুন পোষা পাখনী। এবার বুনো পাখনী যা যা — পালা— ফুড়ুৎ।'

অনুসন্ধানে জেনেছিল বিন্তি, দিল্লীতে বদলী হয়ে গেছে অনিমেষ। দিল্লীতে বদলী-হয়ে-যাওয়া অনিমেষের বিয়ের সম্ভাবনার কথা বলে ফটিক আর তার দলবল তাকে বিদ্রূপে বিদ্ধ করতে চাইছে। এরপর কয়েক দিন এক অস্থির চাঞ্চল্য বিন্তিকে উন্মাদ-প্রায় ক'রে রেখেছিল। কিন্তু প্রতিমুহূর্তের সংগ্রাম-ক্ষুব্ধ জীবনে এই মানসিক বেদনা-বিলাস কতক্ষণ জীবিত রাখা সম্ভব? অনিমেষের বদলী এবং বিবাহ-সম্ভাবনা যে নিদারুণ প্রদাহ সঞ্চারিত করেছিল সারা অন্তরে, দৈনন্দিন জীবনের তীব্র অভিঘাতে তা নিরস্তও হয়েছিল বাধ্যতামূলক ভাবে। শুধু ক্ষতস্থান জুড়ে যেন এক নিঃসাড় অনুভূতি।

দুপুর ক্রমশঃ অতিক্রান্ত হয়। অস্থিরতা বাড়ে বিন্তির। ওষুধ-দোকানের বিক্রেতারা কেন যে এমন দায়িত্বহীন, কেন যে তারা এত দেরি কর, —এসব কথা ভাবে বিন্তি। ভাবতেই থাকে। তার সব ভাবনার অবসানে, এখন যেন একটিই ভাবনা, কতক্ষণে ওষুধ নিয়ে বাড়ী ফিরে যাবে বাবাকে ওষুধ খাওয়াবে। বাবার জ্বর বাড়ল না কমল, এ ভাবনা এখন তাকে অপরিসীম ক্লিষ্ট করে।

আর সেই মুহূর্তে বিন্তি, অকস্মাৎ, মনোরম এক চিত্র দেখে। বা দেখতে বাধ্য হয়। রেল লাইন দিয়ে ট্রেন যাবে। ফলে লেভেল ক্রসিংয়ের গেট বন্ধ। রেললাইনের দু'পার্শ্বে পিচের রাস্তায় গাড়ী চলা বন্ধ। গেট ওঠার অপেক্ষায় তারা সারিবদ্ধ দণ্ডায়মান। রেললাইনের এপাশে, বিন্তির সামনে পিচের রাস্তায় লরি ভ্যান, বাস গাড়ী অপেক্ষারত। সেই গাড়িগুলোর পিছনে হঠাৎ ব্রেক কষে থামে একটি ট্যাক্সি। বিন্তির চোখে অকস্মাৎ কিশোরীর চঞ্চলতা। চপল কৌতুকে তার দৃষ্টি ছুটে যায় ট্যাক্সির যাত্রীদের দিকে। ট্যাক্সিতে সুবেশ যাত্রীদের সন্নিবেশ।

রাস্তার ওপাশে ছিল কয়েকটি পথ-চলতি বালক। তাদের কণ্ঠে হঠাৎ উল্লাস 'ওরে দেখে যা, দেখে যা, বর যাচ্ছে, বউ যাচ্ছে।'

ট্যাক্সির ওপাশে, সন্নিকটে, ছোট ছেলেমেয়েদের একটা জটলা জমে।

বর-বউয়ের সন্ধানে বিন্তির দৃষ্টি ট্যাক্সির অভ্যন্তরে দ্রুত সঞ্চালিত হয়।

ব্যাপারটি খুবই নাটকীয়, একথা স্বীকারে দ্বিধা নেই। কিন্তু জীবন যে সম্পূর্ণ নাট্য বর্জিত, এ জাতীয় ঘোষণাও তো আহাম্মুকি। অতএব, বিন্তি সেই নাটকীয় দৃশ্যটি দেখল। ট্যাক্সির সুবেশ নরনারীদের মধ্যে বরবেশী, সুভদ্র এক যুবক, নাম তার অনিমেষ। আর তার পাশে, অতীব সুন্দরী, সালঙ্কারা এক যুবতী রমণী, নিঃসন্দেহে সে অনিমেষের নববিবাহিতা স্ত্রী।

একান্ত লৌকিক এই দৃশ্যটি প্রাণভরে দেখতে থাকল বিন্তি। আর তখনই, রেল লাইনের বন্ধ গেট মুক্ত হ'ল। গাড়ীগুলো গতিশীল হ'ল একে একে, এবং অনিমেষদের ট্যাক্সিটাও দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করল। আর তখন বিন্তির কাছে সমগ্র দৃশ্যটা একটা মরীচিকা বা বিভ্রমবৎ মনে হল। যেন এক ঘোর, এক আচ্ছন্নতা।

তারপরেই এক তীব্র শাসনের চাবুকে নিজেকে ক্ষত বিক্ষত করেছিল বিন্তি। জেদ হিংস্র একরোখা বিন্তির নির্মম উপস্থিতি সে লক্ষ করেছিল নিজের মধ্যে। তারপর একসময় ঔষধালয়ের কর্মীরা এসেছিল, বিন্তি ওষুধ কিনেছিল, এবং বাড়ী ফিরেছিল। নির্বাক, নিস্তব্ধ।

প্রবল জ্বরের প্রাথমিক ধাকাটা সামলে উমাপতি এখন কিছুটা সুস্থির। জ্বর এবং জ্বরজনিত সমস্ত উপসর্গই বর্তমান। তবে গতকালের আচ্ছন্নভাব নেই।

বিন্তির সাড়া পেয়ে ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন — 'বিন্তি এলি?'

বিপ্তি নিরুত্তর। শুধু ওষুধের প্যাকেটগুলো সন্তর্পণে নামিয়ে রাখল বাবার মাথার কাছে বালিশের উপর।

বিপ্তির উত্তরহীনতা হঠাৎ যেন অসহিষ্ণু করে উমাপতিকে। উপার্জনের তাগিদে বিপ্তিকে বাধ্যতামূলক ভাবে প্রতিদিন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হয়, অর্থের ধান্দায় অস্থানে কুস্থানে যেতে হয়, নানা চরিত্রের সঙ্গীদের সঙ্গে মিশতে হয়, বাড়ী ফিরতে হয় গভীর রাত্রির অন্ধকারে। উমাপতির পিতৃত্বের অভিভাবকত্ব নিরাপত্তা দিতে সেখানে একান্ত অক্ষম। স্বশাসন, স্বঅভিভাবকত্বে নিয়ন্ত্রিত রাখতে হয় নিজেকে সেখানে বিপ্তির। এসব কথা অজানা নয় উমাপতির। কিন্তু রোগভোগ যেন এ-মুহূর্তে তাঁকে অসহিষ্ণু করে। বলেন—'কথার জবাব দিচ্ছিস না কেন?'

বিপ্তি যেন ততোধিক অসহিষ্ণু—'কি আবার জবাব দেবো, বাড়ী যে এসেছি, সে তো দেখতেই পাচ্ছো।'

উমাপতির কণ্ঠেও উত্তাপ—'ওষুধ আনতে গিয়েছিস্ সেই কোন্ সময়। এতক্ষণ ছিলি কোথায় তুই?'

অন্তর্গত চণ্ডাল ক্রোধ যেন এবার ফেটে পড়ে বিপ্তির—'বেশ করেছি দেরি করেছি,—তোমার তাতে কি? আমার যেখানে খুশী সেখানে যাব—তুমি বাধা দেবার কে? সারা দিন হন্যের মতো ঘুরে বেড়াই, কত রাত্রে বাড়ী ফিরি, কই, তখন তো একবারও জিজ্ঞাসা করো না, কোথায় যাস্, কেন্ যাস্, কার সাথে অত রাত্রে বাড়ী আসিস্? না, তখন বুঝি টাকা আয় ক'রে নিয়ে আসি! টাকা পেলেই সব ভুলে যাও তুমি!'

উমাপতি স্তম্ভিত। জ্বরের কষ্ট ছাপিয়ে ভিন্ন এক তীব্র যন্ত্রণা দংশন করে তাঁর মর্মমূলে। সমস্ত অভাব-অনটন, জীবন-সংগ্রামের রূঢ়তার মধ্যেও বিপ্তি তাঁর শান্ত, মৃদুভাষী। কিন্তু এ কোন্ বিপ্তি? এ কি তাঁর মেয়ে? বিপ্তির এ মূর্তি তাঁর একান্ত অজ্ঞাত। অনুশোচনা তাঁকে বিদ্ধ করে। পিতৃত্বের কোনো কর্তব্যই তো তিনি পালন করতে পারেন নি। তাহলে মেয়েকে শাসন করবেন তিনি কোন্ অধিকারে? অক্ষম, অচল তিনি। উপার্জনশীল কন্যার এ রূঢ় বচন তো তিনি শুনতে বাধ্য।

নিঃশব্দে পাশ ফিরে শোন উমাপতি। চোখের কোণে অশ্রু জমে। এবং তা অবিরল গড়িয়ে পড়ে। দেহের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে প্রবল মাত্রায়।

স্তব্ধ প্রস্তরমূর্তির মতো উপবিষ্ট থাকে বিপ্তি দীর্ঘক্ষণ। তারপর উঠে দাঁড়ায়। কলসী থেকে গ্লাসে জল ভরে সন্তর্পণে। প্রেস্‌ক্রিপশনের নির্দেশ অনুযায়ী ওষুধের পাতা থেকে খোলে একটি ক্যাপসুল। নিঃশব্দে হেঁটে যায় উমাপতির মাথার কাছে। কণ্ঠস্বর এখন ধীর, কোমল। বলে—

—'বাবা, উঠে ওষুধটা খেয়ে নাও।'

কিন্তু উমাপতি যেন এখন এক অভিমানী শিশু, বেড়ার দিকে মুখ ঘুরিয়ে, হাঁটু ভাঁজ ক'রে, ঘাড় গুঁজে শুয়ে থাকেন অবিচল।

বিপ্তির কণ্ঠে এবার যেন অনুনয়, কিম্বা অভিমান—'ওষুধটা খেয়ে নাও বাবা!'

কিন্তু উমাপতি সংকল্পে স্থির। অনড় শরীরে শুধু ডান হাতটি তুলে বিপ্তিকে চলে যাবার, প্রত্যাখ্যানের ভঙ্গী করেন।

বিপ্তির পূর্বেকার চণ্ডাল ক্রোধ এবার অনুতাপে বিগলিত হয়।

ওষুধ, গ্লাস নামিয়ে রেখে বিপ্তি ডান হাতখানি ন্যস্ত করে উমাপতির জ্বরতপ্ত পায়ের উপর। নির্বাক বসে থাকে স্তব্ধ হয়ে।

আর তখনই বিপ্তি অনুভব করে, উমাপতির সর্বাঙ্গ জুড়ে এক প্রবল থরথর কম্পন। এটি জ্বরের প্রতিক্রিয়া কিম্বা অন্য কিছু, তা তার গোচর হয় না। বলে—

—'বাবা ওঠো, উঠে ওষুধ খাও। আর কোনোদিন আমি ওভাবে কথা বলব না।'— নিরুদ্ধ অভিমান তার কণ্ঠকে রুদ্ধ করে।

উমাপতি উঠে বসেন। বিন্তি জল আর ওষুধ এগিয়ে দেয়। ওষুধ খেয়ে আবার শুয়ে পড়েন উমাপতি।

তারপর ধীরে ধীরে তার কম্পিত হাতখানি এগিয়ে আসে। বিন্তির করতল টেনে নেন নিজের হাতের মধ্যে। জ্বরের প্রবল আক্রমণ যেন তাঁকে ক্রমেই নির্জীব, নিস্তেজ করে।

ক্ষণপরে, শোনা যায় তাঁর জ্বর-ক্লিষ্ট কণ্ঠস্বর—'আমাকে তুই ক্ষমা কর্ বিন্তি। আমি তোর অক্ষম বাবা, তোর খাওয়া পরা, দেখাশোনার দায়িত্ব আমি পালন করতে পারি না। এ তো আমারই অপরাধ।'

বিন্তির কণ্ঠ দীর্ণ এক হাহাকারে বাজে—

'এসব কথা থাক বাবা। তুমি শান্ত হও। তোমার জ্বর বাড়বে।'

ক্ষণকালের বিরতি। উমাপতির কণ্ঠে আবার সেই উচ্চারণ—

—'আমার বাবা গণপতি ঘোষালের পাঁচশো ঘর যজমান ছিল। পূজা পার্বণে তাঁর বাড়ীতে কত লোকের পাত পড়েছে। আর আমি বংশের কুলাঙ্গার, ভিটেমাটি ছেড়ে পথের ভিখিরী। হায়রে স্বাধীনতা! আমার মেয়ের সময়কালে বিয়ে হয় না, আমি তাকে খেতে পরতে দিতে পারিনে, দুমুঠো পেটের ভাতের জন্য সে আজ চালের ব্ল্যাক করে।'

—এ জাতীয় বাক্যাবলী ঘুরে ফিরে উচ্চারিত হতে থাকে উমাপতির কণ্ঠে।

এবং বিন্তি এখন শ্রোতা। শুধুই নির্বাক শ্রোতা। ক্ষণপরে স্তব্ধতা ছাড়া তাদের মধ্যে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না।

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রগাঢ় অন্ধকার এক নিশ্ছিদ্র বাতাবরণ নির্মাণ ক'রে পিতা আর কন্যাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে সেই আর্ত স্তব্ধতায়।

।। দশ ।।

সংবাদটি দাবানলের মতো অতি দ্রুত বিস্ফারিত হয়।

ডাউন ট্রেনের চালের চালানদারদের কাছ থেকে কথা যায় আপ-এর চালানদারদের কাছে। আবার খবর পাঠায় ডাউন আপ-এর ভিন্ন গাড়ীর চালানদারদের কাছে। এবং ক্রমশঃ প্রচারিত সংবাদটি ওদের মধ্যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

রটিত সংবাদের শাখা-প্রশাখার মূল কথা হল— চাল নিয়ে যাবার সময় এক চালওয়ালী চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়েছে। এবং সংবাদে আরো প্রকাশ থাকে যে, চালওয়ালীটির এই পতন ইচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা-সৃষ্টির পরিণাম। যাত্রীদের সঙ্গে নাকি তার বচসা হয়, তার চালের বস্তা নিয়ে টানা-হ্যাচড়া এবং ধাক্কাধাক্কি করে সংঘবদ্ধ যাত্রীরা, এবং সেই সমবেত প্রতিরোধে আত্মরক্ষায় অসমর্থ চালওয়ালীটি তার চালের বস্তা সমেত চলন্ত ট্রেন থেকে গড়িয়ে পড়ে নিচে।

এই দুর্ঘটনার সংবাদটি বিভিন্ন ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে, বলা বাহুল্য, মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তবে অধিকাংশের মনেই যেন প্রতিহিংসা চরিতার্থতার এক হিংস্র অনুভূতি। তাদের কথোপকথনের কিঞ্চিৎ নমুনা নিম্নরূপ।

'—বেশ হয়েছে, উপযুক্ত শিক্ষা হয়েছে। ব্যাটাদের বড়ো বাড় বেড়েছিল।'

—'বলছেন কি মশায়। ওরাও তো পেটের ধান্দায় এসব করতে বাধ্য হচ্ছে। আর যত যাই হোক, একজন মেয়ে—ছেলেকে সবাই মিলে ঠেলে ফেলে দিতে হবে গাড়ী থেকে? একি মগের মুলুক নাকি?'

ওপাশের একদল যাত্রীর সমবেত মদতে একটি রুক্ষকণ্ঠ বড়ই সোচ্চার হয় — 'আরে মশায়, থামুন থামুন। আপনাকে আর ওদের হয়ে দালালি করতে হবে না। হারামজাদাদের জ্বালায় গাড়ীতে ওঠাই আজকাল দায় হয়েছে। আপনি আবার এসেছেন ওদের হয়ে দালালি করতে!'

তাকে সমর্থন করে আর একজন — 'আজকাল কিভাবে চালের বস্তা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে দেখেছেন। দরজার দুই পাশই পেল্লায় চালের বস্তা দিয়ে ব্লক করে রাখে। কিছু বলতে গেলে উল্টে চোখ রাঙায়।'

আর একজন বলে — 'খুব তো দরদ দেখাচ্ছেন। প্যাসেনজারদের কথা তো একবার ও ভাবছেন না। জানেন, কয়েক দিন আগে এক ব্যাটা চাল-ওয়ালা এমনভাবে চালের বস্তা ছুঁড়ে মেরেছিল, তার ধাক্কায় হাবড়া কলেজের এক প্রফেসর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান। পড়ে গিয়ে ভদ্রলোকের হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙ্গে যায়।'

যাত্রীদের এ অভিযোগ প্রত্যেকটিই অবশ্য বর্ণে বর্ণে সত্য। চালের চালানদাররা ক্রমশঃই উদ্ধত, বেপরোয়া এবং দুঃসাহসী হয়ে উঠছিল। প্যাসেঞ্জারদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি প্রায়শঃই তারা ভ্রূক্ষেপহীন। নিজেদের ব্যবসার ঊর্ধ্বগতির জন্য যে কোনো পন্থা অবলম্বনেই তারা সক্রিয়। কুলির মাথায় চালবোঝাই বস্তা চাপিয়ে এনে জমা করে স্টেশন-প্লাটফর্মে, গাড়ী-থামতেই সেগুলো বেপরোয়া ছুঁড়ে মারে কামরার অভ্যন্তরে। যাতায়াতের পথ প্রায়ই সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর হয় এবং যে কোনো সময়ে দুর্ঘটনা ঘটার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। গার্ডসাহেব, ড্রাইভাররাও ওদের ভয়ে ভীত। সব বস্তা ট্রেনে তোলা হয়েছে এ-বিষয়ক নিশ্চিত সিগন্যাল পেলেই তবে ওঁরা ট্রেন ছাড়তে ভরসা পান। আগে অফিস-টাইমের ট্রেনগুলো কিছু-কঞ্চিৎ এড়িয়ে চলত, এখন সব ট্রেনেই ওদের ব্যাপক রাজত্ব। মাঝেমাঝেই স্পেশাল-চেকিং-এর ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু সর্ষের মধ্যেই যে ভূত অবস্থান করে, এই প্রবাদ অনুযায়ী কবে স্পেশাল-চেকিং বসবে, আগে ভাগেই ওরা খবর পায় এবং সেই অনুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করে। ফলে এ লাইনে চালের চোরাচালানদাররা একটা বিভীষিকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিত্যদিনের নিয়ম অনুযায়ী সেদিন সকালে কাজে বের হতে অপারগ হয় লতা। মাথার উপর বেলা চড়েছিল অনেকখানি। কদিন থেকেই সর্বদা জ্বরের অনুমূতি, হাত পা কাঁপে, মাথা ঘোরে। আগে শরীরের ছোটখাটো রোগ-ভোগাদিকে সে পাত্তা দিত না। দুর্জয় একটা সংকল্পের বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ রাখত। শরীর মনের রোগ-ভোগ অবসাদকে ঠাট্টা তামাশা রঙ্গ-রসিকতার আড়ালে আবৃত রাখতে চাইত। মনের মধ্যে সর্বদা লালন করত একটি সংগোপন দুর্মর বাসনা। স্টেশন ছাড়িয়ে মাইল দুয়েক দূরত্বে পিচ রাস্তার পাশেই সরকারী জায়গায় ওর নিবাস। পি.ডব্লু ডি.র এলাকাধীন জায়গায় অন্য অনেকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জবর-দখল কয়েক হাত জায়গায় বাঁশ-টালির অস্থায়ী আচ্ছাদন নির্মাণ ক'রে বাস করে লতা আর তার বৃদ্ধা অন্ধ মা। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মা মেয়ের একমাত্র ভরসা লতার চালের কারবার।

লতার একটা বড়ই প্রিয় স্বপ্ন, তিল তিল অর্থ-সঞ্চয়ে একদিন সে কিঞ্চিৎ অর্থবান হবে, এবং সে অর্থের বিনিময়ে কোনো ভদ্রপল্লীতে দু'এক কাঠা জায়গা কিনবে স্বনামে। অসহায় অন্ধ মাকে নিয়ে সেখানে নির্মাণ করবে একটি স্থায়ী বাসগৃহ। সেই সঙ্গে আরো সে এমত স্বপ্ন দেখে, তার ছেলেটি বড় হয়ে মায়ের দরদ বুঝবে, এবং তখন নিঃশ্চতই সে বাবার আশ্রয় ত্যাগ ক'রে

হতভাগিনী মায়ের সন্ধান করবে। লতা তার সেই পুত্রের জন্য একটি উপযুক্ত বাসস্থান নির্মাণ ক'রে রাখতে চায় আগে ভাগেই।

এই কারণে সে ছিল কঠোর পরিশ্রমী, এবং যথার্থই, কোনো কঠিন সংকল্প ব্যতিরেকে মানুষ এতখানি শ্রমশীল হতে পারে না।

কিন্তু 'জয়বাংলা' থেকে আসা তার বালক পুত্রটির আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ যেন লতাকে উন্মূলিত করে। হতাশা তাকে গ্রাস করে এবং শোক তাকে দিশেহারা করে। কিন্তু কোনো শোকই যেহেতু চিরস্থায়ী হয়না, জীবধর্মের স্বাভাবিক নিয়মেই জীবকে প্রাণধারণের জন্য সক্রিয় হতে হয়, এবং সেই অনুযায়ী দুদিন বিরতির পর লতাও আবার ট্রেনে চালের বস্তা নিয়ে শুরু করে যাতায়াত। কিন্তু জ্বরের অনুভূতি, অবসাদ, আর ক্লান্তি তাকে বড়ই পর্যুদস্ত রাখে।

শারীরিক আর মানসিক এ-জাতীয় উদ্যমহীনতায়, আজ যথেষ্ট দেরি করেই কাজে বেরিয়েছিল। সকালের অফিস টাইম তখন প্রায় অতিক্রান্ত লতা এবং সঙ্গত ভাবেই আশা করেছিল, ট্রেনে ভিড়ের চাপ শিথিল হবে কিঞ্চিৎ, কিন্তু চালেব বস্তা নিয়ে স্টেশনে হাজির হয়েই বুঝেছিল, অবস্থা স্বাভাবিক নয়। কয়েক স্টেশন আগে কোথায় ওভারহেডের তার চুরি করেছে কে বা কারা, ফলে সকাল থেকেই ট্রেনের যাতায়াত অনিয়মিত। ফলে এই বেশ খানিকটা বেলাতেও স্টেশন-এলাকা লোকে লোকারণ্য। একটা ট্রেন আসার অপেক্ষা এবং আসামাত্র শরীটাকে নিপুণ কৌশলে ট্রেনের কামরায় নিক্ষেপের সার্বিক প্রস্তুতি। সেই ভিড়ের ট্রেনে চালের ভারি বস্তা নিয়ে উপায়-বিহীন উঠে পড়েছিল লতাও। কাঠের পার্টিশনের গায়ে বস্তাটাকে সজোরে ঠেসে হেলান দিয়ে দম নিচ্ছিল।

ট্রেন তখন ক্রমশঃ গতিশীল এবং গতিবেগ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কামরার মধ্যে তিলমাত্র স্থান-সঙ্কুলানের উপায় তখন ছিল না। এবং সেই অকুলান ভিড়ে ছোট্ট ফুট ফুটে একটি মেয়ে, পাশ ফিরতে গিয়ে লতার চালের বস্তায় ধাক্কা খায় এবং পড়ে যায় হুমড়ি খেয়ে। অবিলম্বে বস্তার মালিককে শনাক্ত করা হয়, এবং উত্তেজিত যাত্রীরা চড়াও হয় লতার উপর।

এ-রকম পরিস্থিতিতে লতার পক্ষে বিনয়ী এবং ক্ষমাপ্রার্থী হওয়াই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু সেও মেজাজ হারিয়ে প্রতিপক্ষকে গালাগালি দেয় এবং 'ট্রেন কারো বাপের সম্পত্তি নয়' — এজাতীয় ভাষা প্রয়োগ করে। যাত্রীদের মধ্যে ছিল কয়েকজন উগ্র তরুণ। এই উদ্ধত ঝগড়াটে চালওয়ালীর আচরণে বড়ই উত্তেজিত এবং ক্ষিপ্ত বোধ করে তারা। বীররস প্রকাশের এমন একটি উপযুক্ত ক্ষেত্রের সদ্ব্যবহারে তারা কার্পণ্য করে না। একজন হুঙ্কার ছাড়ে —

—'দে তো, ঠেলে ফেলে দে বস্তাটাকে নিচে।'

ওদিকে পরবর্তী স্টেশন সন্নিকটবর্তী হচ্ছে ক্রমশঃ। কামরায় তিলধারণের জায়গা নেই। কিন্তু ওরই মধ্যে পরবর্তী স্টেশনের কিছু যাত্রীকে অবশ্যই জায়গা দিতে হবে। দরজার কাছটিতে তাই হুড়োহুড়ি, ব্যস্ততা।

পূর্বোক্ত যুবাটির লতার বস্তাটাকে নিচে ফেলে দেবার প্রস্তাবে লতা হিতাহিত এবং স্থান কালের জ্ঞান হারায় তীব্র ক্রোধে। সপাটে জবাব দেয় সে —

—'কোন্ খান্‌কির বাচ্চার এ্যাতো ক্ষ্যাম্‌তা হয়েছে, ফেলুক দেখি আমার বস্তা।'

প্রতিপক্ষ যুবাটিও কাঁচা খিস্তিতে যথেষ্ট দক্ষ—'যতো বড়ো মুখ না, তোর তত বড় কথা। দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোকে মাগী।'

এবং এরপর যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া আত্মসম্মান বজায় থাকে না। যুবাটি প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবল তাগিদে হামলে পড়ে লতার চালের বস্তাটির উপর। বিস্মিত, বিহ্বল

অন্য যাত্রীদের মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে বস্তাটাকে ঠেলে সরিয়ে নেয় দরজার প্রান্তবর্তী সীমানায়।

যুবাটির এমন উদ্দীপ্ত আচরণে অন্য যাত্রীদের মনে ঘনায় ত্রাস-জনিত নির্লিপ্ততা, কারণ সাম্প্রতিক ক্রমবর্ধমান নকশালপন্থী নামক জুজুর ভয় মানুষকে বড়ই কাবু করে, এবং এ-যুবাটির আচরণ নিশ্চিতই তাকে ঐ দলের সক্রিয় সদস্য বলে যাত্রীদের মনে ধারণা জন্মাতে সাহায্য করে। ফলে ঘটনা-গতি সম্পর্কে তারা যথাসম্ভব উদাসীন এবং নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করে।

ঘটনার পরিণতি যে সত্যই এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়াতে পারে, এটা লতারও ছিল অনুমানের বাইরে। কিন্তু অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবার সে পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে—

'—ও দাদারা দেখেন — দেখেন, আমার বস্তাডারে ফেলে দিচ্ছে—'

কিন্তু সেই বোবা জনসমুদয়ের কেউই লতার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে না। পরবর্তী স্টেশন আসার অনেক আগেই লতার চালের বস্তাটি গড়িয়ে পড়ে নিচে। বস্তাটিকে বাঁচানোর প্রাণপণ চেষ্টায় লতা সেটিকে চার হাত পায়ে জড়িয়ে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু সবল যুবাটির প্রবল ধাক্কা এবং গাড়ীর ঝাঁকুনিতে বেসামাল লতাও দ্রুত ধাবমান ট্রেন থেকে আছড়ে পড়ে রেল লাইনে।

ট্রেনটি যথারীতি পরবর্তী স্টেশনে প্রবেশ করে। আরেক প্রস্থ যাত্রীদের ধাক্কাধাক্কি। ওঠানামা। তারপর ট্রেনটি নিজস্ব নিয়মে গতিশীল হয় তৎ-পরবর্তী স্টেশনের উদ্দেশে।

কলকাতায় চালের খেপ নামিয়ে আপ্ ট্রেনে ওরা ছিল ফিরতিমুখো একটা দল। শঙ্করা বিন্তি রতন এবং আরো কয়েকজন। জংশন স্টেশনে এসেই ওরা সংবাদটির মুখোমুখি হ'ল। চাল আনবার সময় ওদের দলের কে একজন ট্রেন থেকে পড়ে গেছে— এটি নিশ্চিত সংবাদ। কিন্তু ব্যক্তিটি কে, এ-বিষয়ে তারা স্থির-নিশ্চয় হতে পারল না। ফলে উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে অকুস্থলের স্টেশনটির জন্য অপেক্ষারত রইল ওরা। স্টেশনটিতে পৌঁছেই ওরা দ্রুত ধাবিত হ'ল।

ঘটনা-স্থলটি তখন জনারণ্য। রেল লাইনের দুপাশেই ছড়ানো বিস্তীর্ণ উদ্বাস্তু উপনিবেশ। রেললাইনের পাশ ঘেঁষে-ও বিস্তর জবর-দখল অধিবাসী। ফলে যে কোনো ঘটনার দর্শক হিসেবে অন্ততঃ জনসমাগমের ঘাটতি ঘটে না। তবে এখানে যারা দর্শক, সকলেই নিষ্ক্রিয়। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বিনা কড়িতে কিঞ্চিৎ উত্তেজনা উপভোগ। ট্রেন থেকে পড়ে গিয়েছে — দুর্ঘটনা, না আত্মহত্যা, — জীবিত না মৃত, কোনো কিছুই নিশ্চিত নয়। ফলে, এসব ক্ষেত্রে মৃতদেহের বেশি কাছে ঘেঁষা বিচক্ষণতার পরিচয় নয়। এর পরে পুলিশ আসবে, লাশ সম্পর্কে পুলিশ নানাবিধ জেরা করবে, এবং কে না জানে, পুলিশ ব্যাঘ্ররূপী এবং বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।

রেললাইনের উপর দিয়ে দ্রুত ছুটে, ভিড়-ভাড় সরিয়ে, দুর্ঘটনার মূল জায়গাটিতে হাজির হ'ল শঙ্করা এবং ওর দলটি। এই ট্রেনেই চালপার্টির আরো অনেকে সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছে। মূল ঘটনাস্থলটির সিংহভাগ এখন ওদের দখলে। শঙ্করা ছুটে গিয়ে নিবিষ্ট চোখে দেখল সেই নিস্পন্দ রমণী দেহটিকে। উপুড় হয়ে পড়েআছে, — পৃষ্ঠদেশের অর্ধাংশ অনাবৃত, প্রসারিত ডান হাতখানি চালের বস্তাটিকে আঁকড়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টায় এখনো যেন গতিময়। কপালের কাছে দীর্ঘ একটি গভীর ক্ষত — তা থেকে এখনো ক্ষরিত হচ্ছে ক্ষীণ রক্তধারা। অদূরেই বিদীর্ণ বিস্রস্ত চালের বস্তাটি— প্রাণ-ধারণের মূলীভূত শুভ্র অন্ন-দানাগুলি চতুষ্পার্শ্বে ছড়ানো। ইতস্ততঃ কোথাও তাতে রক্তের মিশ্রণ।

শঙ্করার খর দৃষ্টি ঐ নিস্পন্দ নারী-দেহটিকে শনাক্ত করতে সচেষ্ট হয়। এবং বলা বাহুল্য, পলকপাতেই তার চেষ্টা ফলবতী হয়। তীব্র এক আর্তনাদ পারিপার্শ্বিক জনতাকে সচকিত ক'রে রণিত হয় তার কণ্ঠে—

—'লতা-দি—'

পরমুহূর্তেই শঙ্করা তীব্রভাবে অনুভব করে, ঐ নারীটি এখন তার হাজার আকুল কণ্ঠের ডাকেও সাড়া দেবে না। কারণ, হয় সে মৃত, অথবা গভীরভাবে সংজ্ঞাহীন। অবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় শঙ্করা। পরিপার্শ্বস্থ দর্শক বৃন্দকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এবং সজোরে হাঁক দেয়— —'এ্যাই, কেউ একজন এগিয়ে আয় তো!'

চালপার্টির একটি বলশালী যুবক এগিয়ে আসে। শঙ্করা, রতন এবং যুবকটি সম্মিলিতভাবে তুলে নেয় লতার অচেতন দেহটি এবং দ্রুত ছুটতে থাকে স্টেশনের দিকে। চাল-পার্টির অন্য নরনারীরাও সঙ্গ নেয় তাদের। ভাগ্যক্রমে কিছুক্ষণের মধ্যেই আসে একটি ডাউন ট্রেন। লতাকে নিয়ে সবাই কলকাতা অভিমুখী হয়।

একসময় ওরা উপনীত হয় শিয়ালদহ স্টেশনে। সেখান থেকে রওনা হয় নিকটবর্তী হাসপাতালটিতে। বর্তমানে শিয়ালদহ স্টেশনের চত্বর পেরিয়েই চোখে পড়ে একটি সুলভ শৌচাগার। সেখান থেকে কিছু অগ্রসর হয়েই হাসপাতালটির অবস্থান। কোনো কোনো রসিক ব্যক্তি 'সুলভ শৌচাগারের' সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হাসপাতালটিকে 'সুলভ মরণাগার' নামে অভিহিত করে। জন্ম এবং মৃত্যু — দুইই যে দেশে বড়ো সুলভ, এবং দুটি কর্মই যেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন বলে বিবেচিত, সে দেশের হাসপাতাল এর চেয়ে উন্নততর হওয়া বোধকরি সম্ভব নয়। রোগীর প্রবল সংখ্যাধিক্যের তুলনায় হাসপাতালটিতে স্থানাভাব, ডাক্তারের সংখ্যাও অপ্রতুল, ব্যবস্থাপনায় নানাবিধ গলতি, ফলে হাসপাতালটি একটি ব্যাপক এবং সার্বিক অব্যবস্থার শিকার। তবু রোগের তাড়নায় তাড়িত অথবা মৃত্যুভয়ে ভীত জনসাধারণ বিকল্প কোনো ব্যবস্থা আয়ত্তাধীন নয় জেনেই ভর্তি হয় এখানে।

শঙ্করার দলটি দ্রুত ছুটে আসে হাসপাতালের ইমার্জেন্সী বিভাগে। লতার সঙ্কটাপন্ন অবস্থাটি কর্তব্যরত ডাক্তারবাবুরা দেখামাত্রই অনুমান করতে পারেন। কিন্তু 'বেড' সুলভ নয়। কয়েকদিন আগে 'চিকিৎসকের গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যু' —এই অভিযোগে জনৈক রোগীর বলবান আত্মীয়-বর্গ তরুণ ডাক্তারবাবুদের উপর হামলা চালায়। ফলে হাসপাতালটিতে এখানে চাপা উত্তেজনা, সন্ত্রস্ত আবহাওয়া। সদ্য-আগত এই দুর্ঘটনা-গ্রস্থ রোগিনীটির উত্তেজিত, খ্যাপাটে অনুগামী দলটির গতিবিধি বিপজ্জনক। ফলে অচিরেই একটি 'বেড' যোগাড় হয় এবং সেখানে স্থানলাভ ঘটে লতার।

অতঃপর ওদের উৎ কণ্ঠিত প্রতীক্ষা। লতা জীবিত, না মৃত, এ-প্রশ্নের উত্তরই এখন সর্বাপেক্ষা জরুরি ওদের কাছে।

কিছু বিরতিতে বেরিয়ে এলেন এক তরুণ ডাক্তার। ওরা তাঁকে ঘিরে ধরল সাগ্রহ জিজ্ঞাসায়।

ডাক্তারবাবু ঘোষণা করলেন — 'আপনাদের রোগী এখনো বেঁচে আছেন। তবে অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। আপনারা চলে যাবেন না। রোগীকে রক্ত দেবার দরকার হতে পারে।'

লতা এখনো জীবিত, এ সংবাদ ওদের কাছে স্বস্তির বার্তা আনল। চোখে চোখে সে আনন্দ-বার্তার হিল্লোল সংক্রামিত হ'ল পরস্পরের মধ্যে।

স্বভাবতঃই, শঙ্করাও উল্লসিত। কিন্তু কর্তব্যপালনের দায়িত্বে সে সচেতন। সকলের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে। তারপর বলে—

—'লতাদির জন্য কে কে রক্ত দিতে রাজী আছো?'

এটা হাসপাতাল। এখানে চীৎকার-চেঁচামেচি শোভন নয়, এ বিষয়ে তারা সচেতন হ'ল। ফলে কেউই চীৎকার ক'রে নিজস্ব সম্মতি প্রকাশ করল না। শুধু শব্দহীন হাত উত্তোলিত করল সবাই। অর্থাৎ লতার প্রাণ-বাঁচানোর প্রয়োজনে রক্তদানে সবাই প্রস্তুত।

কিন্তু এই ভালবাসার টানটুকুকে সার্বিক অস্বীকৃতি জানাল লতা। মধ্যরাত্তির গভীরে তার প্রাণবায়ু স্নেহের বন্ধন অতিক্রম করল।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু। ফলে 'ডেডবডি' ছাড়বার আগে নানাবিধ প্রয়োজনীয় আইনানুগ কর্তব্যাদি সম্পন্ন করা জরুরি। সেগুলি যথাবিধি পালিত হ'ল। এগুলো শেষ করতে দিন প্রায় অতিক্রান্ত। কিন্তু ওরা কেউই হাসপাতাল পরিত্যাগ করল না। অস্নাত, অভুক্ত, অপেক্ষা করে রইল সবাই। দুপুরের দিকে আরো অনেকে এসে পড়ায় ওদের দলটির অধিকতর আয়তন বৃদ্ধি ঘটল।

দিনের স্বল্প আলো অবশিষ্ট থাকতে ওরা টেম্পো ভাড়া ক'রে লতার মৃতদেহ নিয়ে ফিরে এল নিজেদের এলাকায়। সহানুভূতি এবং কর্তব্যবোধেব তাগিদে চালপার্টির লোকদের সমাগমে শবানুগামীদের দলটি তখন আরো বর্ধিতাকার।

লতার দেহটি প্রথমেই নামানো হ'ল স্টেশন-সংলগ্ন শনি-মন্দির প্রাঙ্গণে।

গ্রহ-রাজের এই মন্দিরটি এ-স্থানে নিতান্তই অর্বাচীন। কিন্তু মন্দিরটি নিজস্ব মাহাত্ম্য-গৌরবে এতদঞ্চলে অচিরেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। লোকায়ত জীবনে কালীমন্দিরের যে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এবং আকর্ষণ ছিল, গ্রহরাজের প্রবল দাপটে তা সম্প্রতি কিছু ম্লান। গ্রহরাজ-সংক্রান্ত ব্যবসাটি বর্তমানে বড়ই লাভজনক। রাস্তার মোড়ে মোড়ে তাই সুলভ-দৃষ্ট গ্রহরাজের যেন-তেন একটি মূর্তি, কিম্বা তাঁর নামাঙ্কিত কোনো প্রতীক-চিহ্ন এবং তার পাদদেশে অবস্থিত একখানি বৃহদাকার কাষ্ঠ-থালা। প্রতি শনিবারে সেখানে পূজার্চনার আয়োজন চলে, এবং ভক্তবৃন্দ সারাদিন সেখানে টাকাটা সিকেটা নিবেদন ক'রে গ্রহরাজের কোপদৃষ্টি প্রশমিত করতে সচেষ্ট থাকেন। ভয় কিম্বা ভক্তি—কোন্‌টি সেখানে মুখ্য — সেটি আবিষ্কারের জন্য বিস্তর গবেষণার প্রয়োজন হয় না।

এখানকার এই শনি-মন্দিরটিরও উদ্ভব ঘটেছে এ-জাতীয় প্রয়োজন থেকেই। মন্দিরটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক স্থানীয় ভ্যান-রিক্সা-চালকবৃন্দ এবং চালের চোরা চালানদারেরা। প্রতি শনিবার সাড়ম্বরে গ্রহরাজের পুজা অনুষ্ঠিত হয়। চালের চালানদারেরা চাল নিয়ে প্রতি খেপের যাত্রাপথে দশ বিশ বা আরো বেশি পয়সায় প্রণামী নিবেদন করে। সম্প্রতি কয়েকটি অভাবী মুসলমান রমণীও চালের চালানদারীর এই বৃত্তিটাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারাও চাল নিয়ে যাবার পথে হিন্দুদের এই দেবতাটিকে প্রণামী দিয়ে যায় যথারীতি। তাদের মুসলমানী ধর্মভাবের এই অনাচারের প্রতি কেউ কটাক্ষ বা পরিহাস করলে, তারাও পবিহাস-তরল জবাব দেয় — 'রাম-রহিমের ভাগাভাগি দিয়ে কি করব? যে পীর-দেবতা আমাদেব চাল পার করে দেবে, সেই আমাদের রাম রহিম। সিন্নি চড়াই তার পায়ে।'

এই সব চালের চালানদার ছাড়াও অন্যান্য ভক্তের প্রণামীর অর্থমূল্যও যথেষ্ট ওজনদার। ফলে মন্দিরটির সমৃদ্ধি, গৌরব এবং মাহাত্ম্য ক্রম-বর্ধমান।

শ্বেত-বস্ত্রে আবৃত লতার শব-দেহটিকে ওরা প্রথম এনে নামাল গ্রহরাজের এই মন্দির-প্রাঙ্গণে। একটি ভক্ত যে নিঃশব্দে উধাও হয়ে গেল, অগণিত ভক্তের মালিকানায় অভ্যস্ত গ্রহরাজ সেটি জানতে পারলেন কিনা, বোঝা গেল না।

ওদের দলটি লতার দেহকে ঘিরে এখানে কিছুকল উপবিষ্ট থাকল নিঃশব্দ।

রাত্রির অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসছে ক্রমশঃ। গ্রীষ্মের নৈশাকাশে তারকার দল এখন সবিশেষ উজ্জ্বল। সেই উজ্জ্বলতার আলোয় ওরা লতার মৃতদেহ নিয়ে একসময় পৌঁছাল লতাদের জীর্ণ কুটিরে। লতার মা, অন্ধ বৃদ্ধা, ঘটনার সাত-সতেরো কিছুই ছিল না অবগত। লতার দীর্ঘ অনুপস্থিতি প্রথমে তাকে ক্রুদ্ধ, পরে চিন্তিত, এবং সবশেষে শোকে আকুল করে তুলেছে। অকস্মাৎ তার ভাঙা

ঘরে এতগুলো লোকের আগমন, তাদের অস্ফুট কথাবার্তা — ইত্যাদিতে বৃদ্ধা তার দৃষ্টিহীনতা সত্ত্বেও কোনো গভীর অমঙ্গলের সম্ভাবনা অনুমান করে এবং —'ওরে আমার লতা কোথায় রে'— ব'লে আর্তনাদ ক'রে চারিপার্শ্বে হাতড়ায়। বৃদ্ধার এই শোক স্পর্শ করে সকলকে এবং ওদের চোখেও অশ্রু ঘনায়।

সবশেষে ওরা লতার দেহটিকে নিয়ে যায় খালপাড়ের শ্মশান-ভূমিতে। এতদঞ্চলের বৃহত্তর উদ্বাস্তু-উপনিবেশের হিন্দু শব-সৎকারের একমাত্র পীঠস্থান। নিজস্ব প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছে শ্মশানভূমিটি। জন্ম, মৃত্যু স্থান নির্বিশেষেই হতে পারে। কিন্তু সৎকার কর্মটি একটি বিশেষ স্থানেই সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

একসময় চিতা প্রজ্বলিত হ'ল। এবার অগ্নির স্পর্শ করাতে হবে মৃতার মুখে। একটি অকারণ, নিষ্ঠুর সংস্কার। তবু নিয়ম যখন বর্তমান, এক্ষেত্রেও তা অবশ্য পালনীয়। কিন্তু লতার মুখাগ্নি করার অধিকার ন্যস্ত হবে কার উপর? কে হবে তার সেই একান্ত আত্মজন? দ্বিধা, সংশয় এবং পারস্পরিক মুখ-চাওয়া-চায়ি ওদের বিভ্রান্ত রাখে ক্ষণকাল।

তারপর জড়তা কাটিয়ে এগিয়ে আসে লতার শ্মশান-বন্ধুদের কয়েকজন। তারা একটু ক'রে আগুনের স্পর্শ লাগায় লতার মুখে। সে আলোক-ধারায় লতার মুখ যেন উজ্জ্বল এবং আলোকিত দেখায়। যারা তার নিত্যদিনের জীবিকার সংগ্রামে ঘনিষ্ঠ সাথী, এখন তারা তার শ্মশান-বন্ধু, এবং তাদের চেয়ে আত্মজন কে-ইবা আছে লতার।

দাউ দাউ প্রজ্বলিত হ'ল চিতা। লতার সেই প্রজ্জ্বলিত চিতা-পার্শ্বের ভিন্ন ভিন্ন বয়সী নরনারীগুলি কেউই রক্ত-সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত নয়, কিন্তু এই মুহূর্তে সকলেই যেন তাকে কেন্দ্র ক'রে এক অচ্ছেদ্য, নিবিড় বন্ধনে যুক্ত হ'ল।

।। এগারো ।।

পরদিন এ-অঞ্চলের তাবৎ মনুষ্যকূল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল রেল-স্টেশনে।

সত্তরের দশককে মুক্তির দশক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু দশকটি শেষ পর্যন্ত মুক্তির নয়, মৃত্যুর দশকে পরিণত হয়েছিল। অসংখ্য কৃতী উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় তরুণ-তরুণী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নানাবিধ মুক্তির দাবিতে। কিন্তু কি মহৎ বিনষ্টি, কি বিশাল অপচয়। কোথায় যে সে সব হারিয়ে গেল। ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাওয়ার গৌরবটুকুও তারা পায়নি, সেরেফ চোরাগোপ্তা পেঁদিয়েই তাদের শেষ করেছে পুলিশ। বারাসতে, বরানগরে, পশ্চিমবাংলার ইত্যাকার নানা শহর বা বন-বাদাড়ে অসংখ্য তরুণের লাশ — ইতিহাস তার নীরব সাক্ষী। জরুরি অবস্থা, বিনাবিচারে আটক, জেলে বন্দী-হত্যা, দমন-পীড়ন — দেউলে শাসন-ব্যবস্থার এক সার্বিক চিত্র। পুলিশি ব্যবস্থার এক চণ্ড রূপ।

অবশ্য, সরকারের পিছনে হিড়িক লাগালে, কোনো সরকার ছেড়ে কথা কয়, এর নজির বিশ্ব-ইতিহাসে সুলভ নয়। ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবাংলার কায়েমী শাসন-ব্যবস্থার পশ্চাদ্দেশে কাঠি-দেনে-ওয়ালা নকশালী-বাতিকগ্রস্ত ছেলেগুলোকে স্বাভাবিক কারণেই, ইতিহাসের নিয়মকানুন মেনেই, বরদাস্ত করতে পারেনি তৎকালীন সরকার। শাসন-যন্ত্রের পুলিশ-নামক সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্রটিকে দেওয়া হয়েছিল ক্ষমতা-প্রদর্শনের সর্বোচ্চ অধিকার। শাসন-যন্ত্রের এটাই তো আসল স্বরূপ। মুক্তির নামে আন্দোলনাদি সেখানে পাগলামিরই নামান্তর। অতএব, অপরিহার্যভাবেই হত্যা, প্রতিহত্যা, রক্তপাত, সন্ত্রাস — এ শতকের পশ্চিমবঙ্গবাসীর এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা।

কিন্তু সত্তরের দশকের তিয়াত্তর সালের এক গ্রীষ্মের সকালে এতদঞ্চলের রেল-স্টেশন-ভূমিতে যে ঘটনাটি ঘটল, তার পিছনে বৃহত্তর কোনো রাজনৈতিক চেতনা, বা মুক্তির চেতনা-টেতনা-জাতীয় ব্যাপার ছিল না। নিতান্তই তাৎক্ষণিক শোক এবং উত্তেজনার বশে প্রতিশোধ গ্রহণের অক্ষম প্রচেষ্টা থেকেই এর উদ্ভব।

সকাল আটটা পর্যন্ত আপ এবং ডাউন — উভয় ট্রেনই চলাচল করেছিল বাধাহীন। কিন্তু কোনো চালের চোরা চালানদার এদিন ট্রেনে চড়েনি। একজন দু'জন ক'রে সমবেত হয়েছিল স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে। তারপর যখন দলটি হাজার-খানেক মানুষের সম্মিলিত শক্তিতে পরিণত হ'ল, তখনই শুরু হ'ল ওদের অ্যাক্‌শন। ডাউনের একটি ভিড়াক্রান্ত ট্রেন এসে দাঁড়াল এক নম্বর প্লাটফর্মে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই সঙ্ঘবদ্ধ, এক কাট্টা মানুষগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ল ট্রেনের সামনে। কেউ শুয়ে, কেউ ব'সে, কেউ বা দাঁড়িয়ে। পুরুষ, নারী, বালক, যুবক, বৃদ্ধ—নির্বিশেষে। প্রত্যেকের হাতে এক একটি শূন্য, প্রসারিত বস্তা। সেগুলি শূন্যে, বাতাসে প্রবলবেগে আন্দোলিত হতে লাগল, এবং এমত প্রতীত হ'ল, যেন সেগুলি তাদের নিজস্ব কোনো দলীয় পতাকা। ওরা রাজনৈতিক চেতনা-শূন্য, কিন্তু সংহতি-বোধ ওদের উদ্দীপ্ত রাখল যে-কোনো সমর্পিত-প্রাণ রাজনৈতিক কর্মীদলের মতোই। ঘটনার এই আকস্মিকতায় ট্রেনের গার্ডসাহেব, চালক এবং যাত্রীরা হতবাক, বিভ্রান্ত।

এই উত্তেজিত পরিস্থিতির ভাবাবেগকে রূপ দেবার জন্যই যেন শঙ্করা, অনভ্যস্ত কিন্তু সুদৃঢ় উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করল—

—'ভাইসব, তোমরা সবাই জানো, লতাদিকে কিভাবে মেরে ফেলা হয়েছে। আজ লতাদি মরেছে, কাল আমরা যে কেউ মরতে পারি। আমরা চাল-পার্টি। কিন্তু আমরা চোর না। এই কাজ ক'রেই আমাদের পেটের ভাত জোগাড় করতে হয়। লতাদির মৃত্যু যেন ব্যর্থ না হয়। সবাই প্রতিজ্ঞা করো, লতাদির মৃত্যুর প্রতিকার না হলে আমরা কেউ রেল লাইন ছেড়ে উঠব না।'

গার্ডসাহেব নেমে এসেছিলেন তার কেবিন ছেড়ে। এই চালপার্টির লোকদের জন্য স্টেশনে মাঝে-মধ্যে এক আধ মিনিট ট্রেন বেশি অপেক্ষা করাতে হয়। সেটি কর্তব্যচ্যুতির অন্তর্গত হয় না ব'লে ধর্তব্য ব'লে বিবেচিত হয় না। কিন্তু সঙঘবদ্ধ ভাবে ট্রেন আটকে দেওয়া যে মারাত্মক আইনভঙ্গের অপরাধ ব'লেই বিবেচিত, এটা ওদের বোঝানোর সম্যক প্রয়োজনেই তিনি নেমে এসেছিলেন কেবিন থেকে।

তাকে দেখেই শ্লোগান তুলল শঙ্করা — 'চাল-ব্যবসায়ী লতার মৃত্যু হ'ল কেন' — সমবেত জনতা যোগ করে — 'জবাব দাও, জবাব দাও।'

নতুন শ্লোগান ধ্বনিত হয় শঙ্করার কণ্ঠে — 'চাল ব্যবসায়ী লতার মৃত্যুর বদ্‌লা চাই' — জনতার কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি— 'বদলা চাই, বদ্‌লা চাই।'

এ-জাতীয় বক্তব্য-জ্ঞাপক শ্লোগান চলল মুহূর্মুহূঃ।

বিভিন্ন রাজনৈতিক শ্লোগানে অভ্যস্ত এতদঞ্চলের বায়ুস্তর ইত্যাকার ভিন্নধর্মী শ্লোগানের অভিঘাতে যেন নতুন মাত্রা পেলো।

ইতিমধ্যে তিন নম্বর প্লাটফর্মে হাজির হল একটি আপ ট্রেন। বলা বাহুল্য, আপ ট্রেনের সামনেও ওদের সঙ্ঘবদ্ধ উপস্থিতি নৈরাজ্য সৃষ্টি করল। আপ এবং ডাউন উভয় ট্রেনেরই আগমন এবং নির্গমন-পথ রুদ্ধ হ'ল এক যোগে। ওদের পূর্ব-ঘোষিত সব শ্লোগান ধ্বনিত হতে থাকে ক্রমশঃ উচ্চগ্রামে। আপ এবং ডাউন ট্রেনের অভ্যন্তরস্থ যাত্রিবৃন্দ, ওদিকে প্লাটফর্মের অপেক্ষমাণ যাত্রীদল — সব মিলিয়ে চূড়ান্ত জন-সংঘট্ট। প্যাসেঞ্জাররা ক্রুদ্ধ, বিরক্ত। কিন্তু উপায়হীন।

ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার বা ক্ষমতা তাদের এক্তিয়ার-বহির্ভূত। একটি চালওয়ালী-মেয়েকে গত পরশুদিন এক হঠকারী যাত্রী ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে, এবং তজ্জনিত কারণে মৃত্যু ঘটেছে মেয়েটির — এ সংবাদটি সবিস্তারে রটিত হ'ল যাত্রীদের মধ্যে। ফলে সন্ত্রাস ছড়াল অবধারিত ভাবে। রেললাইনের উপরে অবস্থানরত ঐ শয়ে শয়ে চাল-চালানদার প্রয়োজনে যে রেললাইনের খোয়া তুলে যাত্রীদের উপর নিক্ষেপ করতে পিছপা হবে না, সেটা অবশ্যই অনুমান করা যায় ওদের মারমুখী হিংস্র মনোভাব দেখে। এবং এর প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই যাত্রীদের মধ্যে বর্তায়।

ওদিকে এই স্টেশন মাস্টারের কাছ থেকে তার-যোগে বার্তা পেয়ে আপ ডাউনের স্টেশন-মাস্টাররা স্টেশনের লাউড স্পীকারে ঘোষণা রাখেন—'অমুক স্টেশনে যাত্রী বিক্ষোভের জন্য আপ ডাউন কোনো লাইনেই ট্রেন চালানো সম্ভব হচ্ছে না।'

এমতাবস্থা নিয়ন্ত্রণের প্রকৃষ্টতম উপায় — রেল পুলিশের শরণাপন্ন হওয়া। কিন্তু তাতে সংঘর্ষ অনিবার্য। লাঠি, টিয়ার গ্যাস ব্যহৃত হতে পারে, কিন্তু তা কতখানি কার্যকরী হবে, তা অনিশ্চিত। গুলি চালানোই তখন অবিকল্প সমাধানের পথ। কিন্তু এই বিশাল এককাট্টা জনতা। গুলি চালনায় হতাহতের সম্ভাবনা প্রচুর। বিশেষতঃ, ঘটনার মুলে রয়েছে একটি মৃত্যু, এবং মৃত্যুর ঘটনামাত্রই স্পর্শকাতর, এবং স্পর্শকাতর এই বিষয়টি যে কোনো মুহূর্তেই বিপত্তির কারণ ঘটাতে পারে।

কিন্তু সমাধানের পথ তো একটা কিছু নির্ধারণ করতেই হবে। যাত্রীরা ক্রমশঃ উত্তেজিত, অসহিষ্ণু। বিনা নোটিশে এই আকস্মিক ট্রেন-বন্ধের বিরোধী নানা যুক্তি প্রদর্শিত হতে 'থাকে পারস্পরিক আলোচনায়। সময়মতো অফিসে হাজিরার ব্যাপার তো আছেই। তাছাড়া, হাসপাতালগামী মুমূর্ষু রোগী, চাকরীর ইন্টারভিউ-প্রার্থী, পরীক্ষার্থী — বিভিন্ন জরুরি কার্যাদির হরেক যাত্রী। সুতরাং, পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়া আকস্মিক এই ট্রেন-বন্ধের ঘটনাটি যে সমালোচনা-যাগ্য, এতে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

কিন্তু ট্রেনের গতিরোধকারী ঐ হাজারখানেক মানুষ আজ যেন মরিয়া। অন্তর্গত, অবরুদ্ধ শোক ওদের এখন প্রজ্জ্বলন্ত ক্রোধে পরিণত। সে ক্রোধ ওদের দান করে হিংস্রতা।

অতিক্রান্ত হয় কয়েক ঘন্টা।· সমাধানের পথ খোঁজাও চলে অব্যাহত। স্থানীয় রাজনৈতিক দলের একজন নেতাকে আহ্বান করা গেল। শিয়ালদহ থেকে এলেন রেলের পদস্থ কর্মকর্তা। সম্মিলিত জরুরি বৈঠক বসল স্টেশন-মাস্টারের কামরায়।

অতঃপর মাইকে ঘোষিত হ'ল, — 'তোমরা যারা ট্রেনের সামনে অবরোধ ক'রে বসে আছো, এখনই অবরোধ তুলে নাও। নাহলে আমরা পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব।'

এর উত্তর এল শ্লোগানে শ্লোগানে। অধিকতর সোচ্চার, বলিষ্ঠ এবং সম্মিলিত। এবং স্থির প্রতিজ্ঞায় অবিচল ওরা ট্রেনের সম্মুখবর্তী ইঞ্চি-পরিমিত ভূমিও বেদখল হবার সম্ভাবনা অবশিষ্ট রাখল না।

মাইকে পুনর্বার ঘোষণা — 'তোমরা অবরোধ তুলে নাও। তোমাদের দাবি বিবেচনা করা হবে। তোমরা কয়েকজন স্টেশন মাস্টারের ঘরে চলে এসো — আলোচনায় বসতে হবে।'

নতুন পরিস্থিতি। এটা একটা চাল হবারও সম্ভাবনা। আলোচনার নামে রেললাইন থেকে ওদের সরিয়ে দেওয়া এবং একবার অবরোধ তুলে ফেলাটা কার্যকরী করতে পারলেই ট্রেন চলাচল অসাধ্য হবে না। এজাতীয় চিন্তায় ওরা দ্বিধাগ্রস্ত। শঙ্করাও যেন কিছু বিভ্রান্ত। তবু বলল —'ওদের মনের ভাবটা কি, বুঝতে পারছি না। আমার সঙ্গে চলো কয়েকজন। কিন্তু কেউ রেললাইনের দখল ছাড়বে না। মিটমাট না হলে আমরা কেউ রেললাইন থেকে উঠব না।'

শঙ্করার কথায় সবাই একবাক্যে স্বীকৃত। আরেক প্রস্থ শ্লোগান কম্পিত করে বায়ুস্তরকে।

অতঃপর বৈঠক বসে। কামরায় অপেক্ষমাণ ছিলেন রেলের পদস্থ ভদ্রলোক, দুজন গার্ডসাহেব, স্টেশন মাস্টার এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা। শঙ্করা, রতন, বরুণ, বিন্তি, অনুভা, মালতী, মানদা এবং বিভিন্ন গ্রুপের আরো কয়েকজন বর্ষীয়ান ব্যক্তি — এদের সম্মিলিত দলটি প্রবেশ করে স্টেশন মাস্টারের কামরায়। কামরাটি স্বল্প পরিসর। এতগুলি মানুষের স্থান-সঙ্কুলানের পক্ষে অনুকূল নয়। বলা বাহুল্য, ওদের বসার জন্য কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব হল না।

দৃষ্টি ঘুরিয়ে দলটিকে একবার পরিমাপ করে নিলেন রেলের পদস্থ ভদ্রলোক। তারপর যথোচিত গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললেন,— 'তোমরা এভাবে ট্রেন অবরোধ করেছ কেন? এটা বেআইনী কাজ। তোমাদের আমি এ্যারেস্ট করতে পারি তা জানো?'

শঙ্করার অকূটনৈতিক বুদ্ধিতেও এটা অগম্য থাকল না যে, এখন পশ্চাদপসরণ আত্মহত্যার সামিল। অবস্থার পরিণতি যাই দাঁড়াক, এখন দৃঢ় বাক্যালাপ এবং ঋজু মেরুদণ্ড বজায় রাখতে হবে — এটা সে সম্যক উপলব্ধি করল। সুতরাং তার কাছ থেকেও জবাব এলো সপাট — 'আমরা তো সকাল থেকেই ট্রেন আটকে বসে আছি। এ্যারেস্ট করলেই তো পারতেন।'

পদস্থর উক্তি — 'তোমরা তো ট্রেনে চালের চোরা চালানদার। অবৈধ কাজ। তোমাদের জেল হওযাই উচিত।'

শঙ্করার কণ্ঠে এবার শীতল ধাতব অভিব্যক্তি — 'সেব তো আমরা জানি। কিন্তু এই কথা শোনানোব জন্যই কি আপনারা আমাদের ডেকেছেন?'

—'অবশ্যই।'

—'ঠিক আছে। আমাদের সবাইকেই তাহলে জেলে নিয়ে চলুন। কাউকে বাদ দিতে পারবেন না।'

পদস্থ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ। তারপর বলেন —'তোমাদের দাবিটা কি?'

ওদের দলের মধ্যবয়সী একজন এবার বলে — 'আমাদের দলের একটি মেয়েকে ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সে মারা গেছে। এর প্রতিকার চাই আমরা।'

স্টেশন মাস্টার বলেন — 'যে মারা গেছে, সে তো আর ফিরবে না। এখন আর ট্রেন আটকে লাভ কি?'

শঙ্করা বলে — 'লাভ কিছু নেই, সে আমরা জানি। কিন্তু যে মারা গেছে, তার পরিবারের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

পদস্থ গম্ভীব। — 'তার মানে তোমরা ক্ষতিপূরণ চাইছো।'

ওদের সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হয় —

—'অবশ্যই। যে মারা গেছে, তার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

পদস্থ এবার গার্ডসাহেবদ্বয় এবং স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে জনান্তিকে আলোচনা করেন। রাজনৈতিক নেতা থাকেন মন্তব্যহীন, শুধু অন্যদের কথাবার্তা শুনে যান মনোযোগী শ্রোতার নিষ্ঠায়।

পদস্থ প্রশ্ন করেন — 'যে মেয়েটি মারা গেছে, তার পরিবারে আর কে কে আছে?'

মালতী বলে — 'ওর মা আছে। চলতে ফিরতে পারে না — বুড়োমানুষ, অন্ধ।'

ডট্‌পেনটি বারকয়েক ধীরে ধীরে টেবিলে ঠুকলেন পদস্থ। চিন্তাগ্রস্ত। তারপর বললেন—

—'ঠিক আছে, তোমরা অবরোধ তুলে নাও। আমি চেষ্টা করব, রেল কোম্পানী যাতে ঐ বৃদ্ধা মহিলাকে তার মেয়ের মৃত্যুর জন্য এককালীন দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়।'

ওরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলল স্বল্পকাল। ঐকমত্যে সকলেই দ্বিধাহীন। শঙ্করা বলল — 'আপনার প্রস্তাবে আমরা রাজী।'

ওরা অবরোধ স্থানে, প্রতীক্ষারত স্বদলের মধ্যে পৌঁছাতেই সংবাদটি রাষ্ট্র হয়ে গেল দ্রুত। আজকে যে তাদের সংঘবদ্ধতা জয়ী হয়েছে, এটা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। কণ্ঠে কণ্ঠে জন্ম নিল নতুন শ্লোগান— 'লতাদি, তোমায় আমরা ভুলছি না, ভুলব না।'

প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যূথবদ্ধ হয়েছিল একদা আদিম মানুষ। তারপর সভ্যতার উদ্ভব, অগ্রগতি এবং বিবর্তনের ধারাপথে গঠিত হয়েছিল সমাজ, সৃষ্টি হয়েছিল নিত্য নতুন গোষ্ঠী। কিন্তু কাহিনী-বর্ণিত এই মানুষগুলি যেন ধারাবাহিক কোনো সমাজ ব্যবস্থা বা গোষ্ঠীর অঙ্গীভূত নয়। এরা বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, সমাজ-বন্ধনহীন। কিম্বা বলা যায়, এরা আর এক ভিন্ন সমাজ, ভিন্ন প্রজাতির দ্যোতক। চিরাচরিত সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্ম, বর্ণ বা সুবিধাবাদী মনুষ্য-সৃষ্ট বিভিন্ন এক্তিয়ারের অর্ন্তভুক্ত নয় এরা। রুজি-রোজগারের সমস্যা, এবং সেই সমস্যাকে অতিক্রম ক'রে নিজেদের অধিকার —বৈধ কিম্বা অবৈধ সে প্রশ্ন অবান্তর — প্রতিষ্ঠা-কল্পে সমভূমিক স্তরে দাঁড়িয়ে এই যে সঙঘবদ্ধ কঠিন সংগ্রাম, মনুষ্য-সভ্যতার ইতিহাসে এ চেতনাটিকেও চিহ্নিত-করণ জরুরি।

চালের চোরাচালানদারদের এই বিজয়বার্তাটি এ-লাইনের রেল-স্টেশন-সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে প্রচার লাভ করল ব্যাপকভাবে। এবং এই পল্লবিত প্রচারের কেন্দ্রমূলে নায়ক হিসেবে সবিশেষ গুরুত্ব পেল শঙ্করার নামটি। সব অঞ্চলেই কমবেশি দু'একজন সমাজবিরোধীর অবস্থান বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থারই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, এবং ভালো মন্দ মিশিয়ে তাদের একটা নিজস্ব ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে নিজ নিজ এলাকায়। শঙ্করাকে ঘিরেও ওর সীমাবদ্ধ এলাকায় এ-রকম একটি ভাব-বলয় প্রতিষ্টিত ছিল। উক্ত ঘটনার পর থেকে তার এ জাতীয় ইমেজটিতে নতুন একটি পালক যুক্ত হ'ল — তা তার নেতৃত্বদানের দুর্লভ ক্ষমতা। কিছু বলতে কইতে পারা, বেপরোয়া মনোভাব, চেহারায় এবং মানসিকতায় আপাতরুক্ষ কাঠিন্য এবং তজ্জনিত লড়াকু আদল — এ গুণগুলি ছিল শঙ্করার এবং যেহেতু এগুলি বর্তমানে এদেশে নেতৃত্বের ইমেজ তৈরীতে বিশেষভাবে সহায়ক, ফলে একটি গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হিসেবে বিবেচিত হ'ল শঙ্করা।

এর প্রকাশ পাওয়া গেল বিশেষ একটি ঘটনায়। স্থানীয় একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের অফিসে সাদর ডাক পড়ল শঙ্করার।

পূর্বোক্ত রাজনৈতিক নেতা, স্টেশনের ঘটনার দিনটিতে যিনি ছিলেন উপস্থিত, সারাক্ষণ প্রায় নির্বাক থাকলেও ঘটনা-গতি লক্ষ রেখেছিলেন এবং পরিশেষে শঙ্করা সম্পর্কে একটি বিশেষ চিন্তা আসে তার মনে। এ ধরনের একটি জঙ্গী ছেলেকে ঠিকমত ট্রেনিং দিতে পারলে সে যে অবিলম্বে দলের একটি স্তম্ভ-বিশেষে পরিণত হতে পারে, ওদিনের ঘটনাবলীর চাক্ষুষ প্রমাণ তাঁকে এ-বিষয়ে সুনিশ্চিত করল।

এ-বিষয়ে তিনি প্রাথমিক কথাবার্তা চালালেন পলাশের সঙ্গে। নিবারণের এই অকাল-পক্ক বৎসটি প্রথমদিকে বল্‌গাহীন কাপ্তানি করে বেড়াত। পরে বিবেচনা করে দেখল, কোনো একটি রাজনৈতিক দলের আশ্রয়-পুষ্ট হওয়াটা জরুরি। কারণ, তাতে যে কোনো অপকর্মকেই রাজনৈতিক রঙে ছুপিয়ে চালিয়ে দেওয়া যায়, এবং নিতান্তই কোথাও ফেঁসে গেলে রাজনৈতিক দাদাদের মদত-পুষ্ট হয়ে পরিত্রাণের সম্ভাবনা থাকে। এতদঞ্চলের উঠতি ব্যবসায়ী নিবারণ দাসের পুত্রটির রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়া পেতে বিলম্ব ঘটল না অতএব।

এই রাজনৈতিক দলটির উক্ত বিশিষ্ট নেতা, এতদঞ্চলে যিনি 'হীরুদা' নামে খ্যাত, একান্তে জিজ্ঞাসা করলেন পলাশকে—

—'ছেলেটিকে তুমি চেনো পলাশ?'

—'কার কথা বলছেন, হীরুদা?'

—'আরে, ঐ যে, স্টেশনে সেদিন চাল-পার্টির লোকজন ক্ষেপিয়ে যে ছোঁড়াটা গাড়ী আটকে ছিল।'

— 'বুঝেছি, শঙ্করার কথা বলছেন।'

—'তুমি চেনো ওকে?'

—'চিনব না কেন? ওর নাম শঙ্করা। মা-বাপের পরিচয় নেই। আগে তো আমাদের বাড়ীতেই থাকত। বাড়ীর আর দোকানের কাজকর্ম করত। চাকরই বলতে পারেন। বাবা ওকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর নাকি দমদমের কালু গুণ্ডার শাগ্‌রেদি করত। এখন তো দেখছি চালপার্টির নেতা। উমাপতি মাস্টারের মেয়েটার সাথে খুব ভাব-সাব।'

একটু ভাবেন হীরুবাবু। তারপর বলেন —

—'ওকে একবার আসতে বলতে পারো পার্টি অফিসে? আমার নাম ক'রে আসতে বলবে।'

—'শঙ্করাকে পার্টি অফিসে আসতে বলছেন? কেন, ওকে দিয়ে কি হবে?'

—'দ্যাখো পলাশ, ছেলেটাকে আমাদের পার্টির মেম্বার করে নিতে পারলে, পার্টির জোর বাড়ত। যতদূর দেখেছি, এলেম আছে ছেলেটার। সেদিন অত বড় আন্দোলনটা প্রায় একাই চালাল। রেলের বড় অফিসারের সঙ্গে কতাবার্তাও চলালো বেশ কৌশল করে। শেষ পর্যন্ত ওদের দাবি কিন্তু মানতে বাধ্য হয়েছে রেল কোম্পানী। সব ব্যাপারটা ঘটালো ঐ ছেলেটাই। ওকে যেমন করে হোক, আমাদের দলে আনা চাই।'

ব্যাপারটা ঠিক মনঃপূত হল না পলাশের। শঙ্করাকে এতখানি গুরুত্ব দেবার কারণ কি, সে বুঝতে পারল না। বিশেষত, শঙ্করার উপর আছে তার একটা ভিন্ন ধরনের আক্রোশ। একটি অজ্ঞাত কুলশীল রাস্তার ভ্যাগাব্যাগু ছেলেকে বাবা বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিল; এবং তার প্রতি বাবার ছিল একটা সস্নেহ প্রশ্রয়, এ-কারণে শঙ্করার প্রতি ছিল তার বিষম বিদ্বেষ।

আক্রোশের দ্বিতীয়, কারণটির শিকড় ছিল অধিকতর জটিল। উমাপতি মাস্টারের বিন্তি নামক মেয়েটির প্রতি তার বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে, এবং সে দুর্বলতা চরিতার্থ করবার জন্য পলাশ সর্বদা সুযোগের সন্ধানে ব্যাপৃত থেকেছে। কিন্তু সুফল লাভ কিছু হয়নি। বরং একবার উমাপতি মাস্টারের হাতে আকস্মিক ধরা প'ড়ে, হেনস্তার চূড়ান্ত হয়েছিল। অবশ্য তার পরেও সৃষ্টি করা যেত যথাযথ সুযোগ। কিন্তু ঐ শঙ্করা হতভাগাটার জন্যই বরবাদ হয়ে যাচ্ছে সব প্ল্যান। সর্বদাই আড়াল করে রাখে বিন্তিকে। আর তলে তলে পিরিত চালিয়ে যাচ্ছে বিন্তির সঙ্গে। একটা বেওয়ারিশ রাস্তার ছেলের এই আস্পর্ধা পলাশকে বড়ই ক্ষিপ্ত এবং উত্তেজিত করে। কিন্তু নিজস্ব বাহুবল এবং লোকবল, দুটিতেই শঙ্করা বড় প্রবল। সুতরাং তার সঙ্গে সরাসরি লড়াইতে নেমে জেতার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এবং এই অক্ষমতার গ্লানি পলাশকে সর্বদা বিদ্বিষ্ট করে রাখে শঙ্করার প্রতি।

সেই শঙ্করাকে নিজেদের রাজনৈতিক দলে আনার প্রস্তাবে স্বাভাবিকভাবেই পলাশ ক্ষুণ্ণ। কিন্তু হীরুদা বড় নেতা, তার কথা অমান্য করা ধৃষ্টতা। অতএব পলাশ বলে—

—'আমি শঙ্করাকে খবর দেবো আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য।'

শঙ্করাকে খবরটা দেয়-ও পলাশ। স্টেশন-প্লাটফর্মে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই শঙ্করার দেখা পাওয়া সহজ-সাধ্য। সারাদিনই তো চালের বস্তা নিয়ে খেপ্ মারছে।

চালের বস্তা নিয়ে স্টেশনে অপেক্ষমাণ ছিল শঙ্করা। সদলে সেখানে হাজির হ'ল পলাশ।

—'তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল শঙ্করাদা।'

অকারণেই একটু খাতির দেখায় পলাশ শঙ্করাকে। শঙ্করার চেয়ে সে বয়ঃকনিষ্ঠ, শঙ্করাকে 'দাদা' ডাকা সহবত-সম্মত। কিন্তু যাকে বাড়ীর চাকর-জাতীয় প্রাণীর উর্ধ্বে স্থান দিতে নারাজ পলাশ, তাকে 'দাদা' ডাকা তার পক্ষে কষ্টকর। তবু হীরুদার কথা স্মরণ করেই এখন সে কিছু নমনীয়।

— 'হীরুদা তোমাকে একবার দেখা করতে বলেছেন। চেনো তো হীরুদাকে?'

শঙ্করা কিছু বিস্মিত। পলাশ তার সঙ্গে যেচে আলপ করছে এবং তা যথেষ্ট মার্জিত ভাষায়, এটা বিস্ময়ের কারণ বইকি! সে নিজে যথেষ্ট সামাজিক জীবন যাপন করে, এ বিশ্বাস কখনই পোষণ করে না। কিন্তু দাসমশায়ের এই একমাত্র পুত্রটির আচর-আচরণ, কার্যকলাপ যেন কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না শঙ্করা। কিছুদিন তো ওদের বাড়ীতেই আশ্রিত ছিল। সম্প্রতি যোগাযোগহীন, উভয়েই ভিন্ন জগতের পথিক এবং স্বাভাবিক দেখা-সাক্ষাতের সম্ভাবনা স্বল্প। সেই পলাশের কাছ থেকে এবম্বিধ সাদর-সম্ভাষণ! কিন্তু অযাচিত কলহও তো শোভন নয়। ফলে পলাশের ভদ্রতার জবাবে শঙ্করাকেও ভদ্র হতে হয়।

শঙ্করা বলে — 'হীরুদাকে চিনব না কেন? নেতা মানুষ, ওঁকে এখানে কে না চেনে! তা আমাকে দিয়ে ওনার কি দরকার?'

—'সে আমি জানিনা। পার্টি অফিসে গিয়ে একবার দেখা ক'রো। আমাকে খবর দিতে বলেছেন, দিয়ে গেলাম।'

দলবলসহ দ্রুত স্থান ত্যাগ করে পলাশ।

প্রাথমিক সিদ্ধান্তে শঙ্করা দেখা করার প্রস্তাবটি নাকচ ক'রে দেয়। হীরুবাবু স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মান্যগণ্য ব্যক্তি। এবং সে নিতান্তই একজন চালেব চোরাচালনদার, ভদ্রজনের দৃষ্টিতে সমাজ বিরোধী। সুতরাং হীরুবাবুর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারটা সন্তর্পণে এড়িয়ে যাওয়াই সঙ্গত মনে করল। কিন্তু ক্রমশঃ বলবতী হয় কৌতূহল। এক সন্ধ্যায় হাজির হ'ল হীরুবাবুর পার্টি অফিসে। ওকে দেখেই হীরুবাবু উচ্ছ্বসিত। সাদর আহ্বান—

—'আরে এসো এসো। বসো।' — হীরুবাবু চেয়ার নির্দেশ করেন।

আপ্যায়নের মাত্রাধিক্যে কিঞ্চিৎ ভড়কে যায় শঙ্করা। তবু চেয়ারে উপবিষ্ট হয়।

হীরুবাবু কিছু লিখছিলেন। হাতের কাজ এখন বন্ধ।

—'তোমার কথাই ভাবছিলাম। তা কি যেন তোমার নামটা ভাই, ভুলে গেলাম।'

—'আজ্ঞে, আমার নাম শঙ্করা।'

—'শঙ্করা আবার কি রকম ভাঙাচোরা নাম! বলো—শঙ্কর।' — উদ্ভাসিত প্রশান্ত হাসি বিকীর্ণ করে বলেন হীরুবাবু।

—'আজ্ঞে আমার নাম শঙ্করা — আমাকে শঙ্করা বলেই ডাকবেন। তা, কি জন্যে আমাকে আসতে বলেছেন, সেটা বলেন।'

শঙ্করার তৈলহীন বাক্যাবলী হীরুবাবুকে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ করে। কিন্তু মুখের বিচক্ষণ হাসির বিভাটি ধ'রে রেখেই বলেন—

—'আরে, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এই তো এলে! ওরে, কে আছিস, শঙ্করার জন্য এক কাপ চা নিয়ে আয় তো।'

—'আমি চা খাবো না হীরুদা। আমি কাজ ফেলে এসেছি। আপনার যা বলার তাড়াতাড়ি বলেন।'

হীরুবাবু এবার স্বাভাব-গাম্ভীর্যে মণ্ডিত করেন নিজেকে। শঙ্করাকে অপলক লক্ষ করেন কয়েকবার।

—'দ্যাখো শঙ্করা, তোমার মতো ছেলে আমাদের দেশ এবং জাতির সম্পদ। তোমার জন্য আমি গর্ব অনুভব করি।'

হীরুবাবুর এই মহৎ বাক্যাবলীর ভারে আবার ভড়কি খায় শঙ্করা। কিন্তু হীরুবাবুর কথার প্রকৃত জবাব খুঁজে না পেয়ে নিরুত্তর থাকে।

হীরুবাবু কথার সূত্র ধরে আবার বলেন—

—'কিন্তু শঙ্করা, তোমার মতো একটি উজ্জ্বল ছেলে চুরি-চামারি, চালের ব্লাক ক'রে বেড়াবে — না, না, এটা মোটেই ভালো দেখায় না।'

— 'তা, দেন না হীরুদা, আমাকে একটা ভাল কাজ দেখে—'

শঙ্করা এবার যথেষ্ট আগ্রহ নিয়েই কথাগুলো উচ্চারণ করে।

হীরুবাবু বলেন — 'আরে, প্রথমেই এতো কাজ কাজ ক'রে ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন। আর, কাজ তো সবাই করে। ওটা কিছু বড় কথা নয়। তোমাকে অন্য কিছু করতে হবে।'

—'আমাকে কি করতে বলেন?'

—'তুমি আমাদের পার্টিতে চলে এসো। তোমাকে মেম্বার করে নেবো। তোমার মতো একজন জঙ্গী ছেলেকে সঙ্গে পেলে আমাদের ছেলেদের মনোবল বাড়বে। এ্যাকশন স্কোয়াডে তোমার মতো ছেলের খুব দরকার আমাদের।'

—উঠে দাঁড়ায় শঙ্করা।

— 'কি হে, উঠে পড়লে যে?'

—'আমি যাই হীরুদা, আমার কাজ রয়েছে।'

—'কিন্তু আমার প্রস্তাবটার কোনো জবাব দিলে না যে।'

—'না হীরুদা, আমি যেখানে আছি, সেখানেই থাকতে চাই।'

— 'কাজটা তুমি ভালো করলে না শঙ্করা। আমি যেচে কাউকে পার্টির মেম্বারশিপ দেই না। এবং যাকে দি, যথেষ্ট বাজিয়েই দি। তোমাকে আমি সরাসরি পার্টির মেম্বারশিপ দিতে চেয়েছিলাম। তুমি তা রিফিউজ করলে। কাজটা ভালো করলে না, মনে থাকে যেন।'

শঙ্করা বেরিয়ে আসে। রাস্তায় হাঁটে এবং বারবার হীরুবাবুর সতর্কবাণী কানে বাজে। হীরুবাবু যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী, ক্ষমতাবান রাজনৈতিক নেতা। যথার্থই ক্ষতিসাধনের ইচ্ছা জাগলে চুনোপুঁটি প্রায় শঙ্করার অস্তিত্বে টান পড়বে। শঙ্করার স্বল্প বুদ্ধিতেও এটা অস্ফুট থাকে না, হীরুবাবুর মতো নেতাদের কাছে শঙ্করার মতো ছেলেরা উদ্দেশ্য সাধনের এক একটি ঘুঁটি মাত্র। ঘুঁটির প্রয়োজন কখনই তার ঘুঁটিত্বকে অতিক্রম করে না। এবং এ জাতীয় ঘুঁটি-সংগ্রহে বাধাপ্রাপ্ত হ'লে হীরুবাবুদের ক্রুদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক।

তবু আবাল্য এই স্বজনহীন প্রতিকূল জগৎ-সংসারে একক সংগ্রামে অভ্যস্ত শঙ্করার কঠিন ঋজু ঘাড়টি কিছুতেই নমনীয় হ'ল না হীরুবাবুর সদম্ভ হুমকির পদতলে।

।। বারো ।।

রেল স্টেশন অতিক্রম ক'রে মাইল দুয়েক উত্তরের জলা-জংলা অঞ্চলটি, উদ্বাস্তুদের জবর-দখল অধিকারাধীন হয়ে যা এখন একটি উদ্বাস্তু উপনিবেশে পরিণত, তারই প্রত্যন্ত-সীমায় টালি আর মুলিবাঁশের একটি কুঁড়ে ঘর। ঘরটি এতদঞ্চলের অন্যান্য উদ্বাস্তু পরিবারের ঘরগুলির মতোই বৈশিষ্ট্যহীন, নড়বড়ে। বিভিন্ন ঋতুতে, বিশেষতঃ শীত এবং বর্ষায়, ঘরটি বসবাসকারীর স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তার পক্ষে অনুকূল নয়। উদ্বাস্তু উপনিবেশটির বাসগৃহগুলির সার্বিক দারিদ্রের তুলনায়ও এ ঘরটি অধিকতর জীর্ণ এবং শ্রীহীন। এটা প্রমাণ করে, ঘরটিতে বাসিন্দার স্বল্প-অবস্থান এবং আগোছালো স্বভাব।

ঘরটির একক বাসিন্দাটির নাম শঙ্করা। অবশ্য মাঝে মাঝে একটি নেড়ি কুকুরকে তার সঙ্গী হিসেবে বিচরণ করতে দেখা যায়। ঘরটিতে শঙ্করার স্বল্পকালীন অবস্থানের সময়টুকু ছাড়াও তার দীর্ঘকালীন অনুপস্থিতিতেও কুকুরটা বশ্যতায় এখানে বিচরণশীল থাকে। এতে সাধারণ্যে প্রকাশিত তাকে, গৃহটি বাসিন্দাশূন্য বা বেওয়ারিশ নয়।

নিবারণ দাস তাকে হাবড়া স্টেশন থেকে কুড়িয়ে আনার পর তাকে বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়ায় শঙ্করা গৃহবাসের স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছিল কিছুদিন। কিন্তু নিবারণের স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা, বিশেষতঃ পলাশের আচরণ তাকে কখনই স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। সে যে ওবাড়ীতে আশ্রিত, অনধিকারে তাদের অন্নের ভাগীদার, এ-খোঁটা প্রতিদিনই জুটত তার ভাগ্যে। পরিশ্রমী স্বভাব সত্ত্বেও সে অলস এবং অকর্মণ্য বলে চিহ্নিত হ'ত। নিজস্ব ব্যবসাপত্র কাজকর্মাদিতে মগ্ন-চিত্ত নিবারণের পক্ষে সবসময় এ-জাতীয় আক্রমণ থেকে রক্ষা করা সম্ভব হ'ত না হতভাগ্য বালকটিকে।

ফলে, স্থায়ী বাসস্থানের লোভ ত্যাগ ক'রে আবার অনিশ্চয়ের পথে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শঙ্করা। তারপর আবার সেই নানাঘাটের জলপান। নাকানি-চোবানি। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পেয়েছে বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কালুগুণ্ডার আশ্রয়। সেখানকার বেপরোয়া জীবন। ওয়াগন ভাঙা, ছিনতাই, গুণ্ডামি, মারামারি— এক উত্তেজক জীবন। তারপর এক অন্তর্দলীয় ঝগড়ার পরিণামে কালুগুণ্ডার শোচনীয় মৃত্যু। কর্মটি করেছিল কালুরই এক বশম্বদ শাগরেদ। বিপক্ষের টাকা খেয়ে অতর্কিতে ছোরা মেরেছিল কালুকে। এবং তারপর এক প্রবল ঘৃণা অনুভব করেছিল শঙ্করা এই জীবনযাত্রায়। বিভিন্ন স্থানে উদ্দেশ্যহীন বিচরণের পর একদিন হাজির হয়েছিল এই রিফিউজি-কলোনীটিতে। হয়ত উদ্বাস্তু-জীবনের প্রতি তার জন্ম-লগ্নের অন্তর্গূঢ় যোগের মমত্ববোধ থেকেই ভাল লেগেছিল এই উদ্বাস্তু উপনিবেশটি। আবাস-অযোগ্য এই প্রত্যন্ত অঞ্চলটিতে তখন যে কোনো আগন্তুকই বসবাসের জন্য ছিল স্বাগত, কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে তখন এখানে নিরাপত্তার সূচক বলে মনে করা হ'ত।

ফলে কলোনীটির প্রত্যন্ত অংশে জঙ্গল কেটে কাঠা দুয়েক জায়গা দেখল ক'রে একটি কুঁড়েঘর নির্মন করা কঠিন হয়নি শঙ্করার পক্ষে। নতুনতর কোনো জীবিকার চিন্তাও তখন সক্রিয় ছিল তার মনে। কোনো চাকরী-বাকরীর চেষ্টা তার পক্ষে হাস্যকর। বিদ্যালয়ের নিম্নতম কোনো সার্টিফিকেট অর্জন করার সৌভাগ্যও আসেনি তার জীবনে। বেকার সমস্যায় জর্জরিত পশ্চিমবাংলায় আনপড় অশিক্ষিত শঙ্করার চাকরী চাওয়া যে বাতুলতার নামান্তর, এটা বোঝে শঙ্করা। সুতরাং ও রাস্তাটি বাধ্যতামূলক ভাবেই বন্ধ ছিল তার কাছে। হকারি-জাতীয় ছোটখাটো ব্যবসার চেষ্টায় রত ছিল কিছু দিন। কিন্তু সেটাতেও পারল না নিবিষ্ট থাকতে। এদিকে স্বল্প সঞ্চয়ের পুঁজিতে তখন টান ধরেছে। কালু গুণ্ডার কাছে শেখা দুর্লভ বিদ্যাগুলিতে আবার শান দেবার কথাও চিন্তা করেছিল। কিন্তু ঐ অন্ধকার জগতের আকর্ষণ সে কাটিয়ে উঠেছিল।

চাল-চালানদারীর এই ব্যবসাটি হঠাৎ বড় মনঃপূত হয়। এবং গত বছর-চার পাঁচ ধরে এ-লাইনে সে এখন স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব।

নিজস্ব জীবিকার্জনের খুঁটিটাকে তো যথেষ্টই মজবুত করেছে, শঙ্করার নিরাপত্তায় আরো কিছু অভাবী মানুষের রুজি-রোজগারের পথটিও নিশ্চিত হয়েছে। যদিও সবাই বোঝে, জীবিকার্জনের এ রাস্তাটি নিতান্তই সাময়িক ও ভঙ্গুর, কিন্তু এই সাময়িক নিশ্চয়তাই বা তাদের কে দিচ্ছে? সুতরাং শঙ্করা তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে ব্যবসাটি চালিয়ে যাচ্ছে বহাল-তবিয়তে এবং ভবিষ্যৎ-সংক্রান্ত কোনো চিন্তা ভাবনাকে নিতান্তই আবশ্যক মনে করে।

কিন্তু মাঝে মাঝেই এক দুর্মর শৈথিল্য যেন বড় আগ্রাসী হয়ে ওঠে। কোনো কিছুই ভালো-না-লাগা এক হতাশা, এক অকূল জাড্য তার সমগ্র সত্তা, অবয়বকে আচ্ছন্ন করে।

আজও যথারীতি দিনের আলোকিত প্রকাশের আগেই শয্যাত্যাগ করেছিল সে। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে স্টোভ ধরিয়েছিল। দুজনের রান্না। এক, সে নিজে। দ্বিতীয়, পোষ্য কুকুরটি। নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তির পর কুকুরকে খাওয়ায়। অবশিষ্ট ভাত তরকারি তুলে রাখে তাকের উপর। গভীর রাতে বাড়ী ফিরে বাসী ভাত তরকারিতেই দুজনের দ্বিতীয় পর্বের ভোজনাদি। মাঝে মাঝেই রাতের ভোজন পর্বটা সেরে আসে। শঙ্করা কলকাতার কোনো সস্তা হোটেলে। কুকরটি সেদিন দু'জনের অন্নে স্ফীতোদর।

প্রাত্যহিক রুটিন অনুযায়ী কাজগুলি চুকিয়ে বের হবার মুখেই শঙ্করা মত পালটাল আকস্মিক। নিত্য দিনের অভ্যস্ত কর্মধারার প্রতি বিরাগ তাকে আচ্ছন্ন করল। মাঝে মধ্যেই এর শিকার হয় সে। এসব দিনগুলিতে সব কর্ম-প্রচেষ্টা মনে হয় অর্থহীন, দাঁতে দাঁত দিয়ে জীবনের এই সব সংগ্রামকে মনে হয় একান্ত আসার। সুতরাং আজ তার কাজে যাওয়া হল না। একবার ভেবেছিল, অনেকদিন যাওয়া হয়না, এ লাইনের সীমান্তবর্তী ঐ স্টেশনটিতে একবার ঘুরে আসবে। কিন্তু সে চিন্তাও তাকে উৎসাহী করল না। জীর্ণ বাঁশের মাচাটিতে সটান শয়ান হয়ে রইল। ভক্ত সারমেয়টি প্রভুর এই গৃহে অবস্থিতিতে যেন সবিশেষ পুলকিত। শঙ্করার মাচাটিকে ঘিরে বারবার প্রদক্ষিণ ক'রে নিজ জাতি-সুলভ বৈশিষ্ট্যে পুলক প্রকাশ করে চলল।

কর্মহীন অলসতায় হিজিবিজি চিন্তাজাল। কালু গুণ্ডার মুখখানি সেখানে হঠাৎ বড়ই উদ্ভাসিত হয়। জীবনের ছয়টি বছর শঙ্করা অতিক্রম করেছে কালুর সান্নিধ্যে। এবং আজ সে নিশ্চিত মানে, একটি যথার্থ মনুষ্য ছিল কালু। কালুর অনুগতদের মতো সেও তাকে সম্বোধন করত 'কালুজী' বলে। একদা বিহার মুলুকে ঘর ছিল কালুর। কিন্তু পরবর্তীকালে দমদমের বস্তি অঞ্চলে বসবাসের সুবাদে বাঙালী খানাপিনা এবং ভাষা-ব্যবহারে অনেকখানি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল সে। উঁচু গলায় কথা বলত এবং হা হা ক'রে হাসত। শঙ্করাকে বলত — 'দ্যাখ, ব্যাটা, জীবন তো একটাই। একবারই আসে, একবারই যায়। তো, সেই জীবনটার জন্য ডরপুক হবি কেন? থাকলে থাকবে, গেলে যাবে। কিন্তু যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ কামাল করে দিবি।'

—শঙ্করা ভাবে, জীবনটাকে কালুজী হাসতে হাসতেই উড়িয়ে দিল।

কালুর দলে স্থান পাবার দিনটিও শঙ্করার এক উজ্জ্বল স্মৃতি। প্রায় বছর তিনেক নিবারণের বাড়ীতে আশ্রিত থাকার পর সে আশ্রয় দুঃসহ বোধ হ'ল। প্রাক-প্রস্তুতিহীন হঠকারিতায় শঙ্করা বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়, অন্ন এবং বাসস্থান দুটিই যেখানে অনিশ্চিত। বিভিন্ন স্টেশন এলাকায় অতিবাহিত হয় কয়েকটি উদ্‌ভ্রান্ত দিনরাত্রি। একদিন এ-রকমই একটি স্টেশনের শেডের তলায় সে পড়েছিল অভুক্ত। গভীর রাতে এল প্রচণ্ড দমকা হাওয়া, আর অঝোর বর্ষাপাত। স্টেশনের অদূরেই দাঁড়িয়ে ছিল মাল-খালাস হওয়া দীর্ঘাকৃতি এক মালগাড়ি। কামরার পর কামরা তার

ফাঁকা। খানিকটা ছুটে পিছনের একটি পরিচ্ছন্ন কামরা দেখে সলম্ফে এতে আরোহণ করেছিল শঙ্করা। ক্লান্তি এবং ক্ষুধা তাকে অচিরেই আচ্ছন্ন করেছিল গভীর ঘুমে।

মধ্যরাত্রির শেষে তার ঘুম ভেঙেছিল আকস্মিক। মালগাড়ির আবডালে কাদের সম্মিলিত ফিস্‌ফাস্ কথাবার্তা। জোলো হাওয়া শঙ্করাকে আর্ত করছিল। নাসিকায় শীতল সুড়সুড়িতে সে সজোরে হেঁচে ফেলে বারকয়েক। এই আকস্মিক শব্দ ধ্বনিতে চমকিত হয় সেই অস্ফুট ফিস্‌ফাস্। সতর্কতা নামে পরিবেশে।

একটি চাপা হুঁশিয়ারী কণ্ঠ — 'কালুজী, আশেপাশে কোথাও লোক আছে মনে হচ্ছে।'

অন্য একটি ভারী কণ্ঠস্বর তার জবাব দেয়,— 'তাই তো মনে হচ্ছে। ঢুঁড়ে দেখ্‌তো সবাই।'

ওদের দলটি পার্শ্ববর্তী একটি মালগাড়ীর কামরার দরজা ভেঙে ঝড় জল আর রাত্রির নির্জনতার সুযোগে অনেকগুলি মূল্যবান যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করেছিল। দ্রুত সেগুলির হিসেব-নিকেশ করছিল এখানে বসে। কালুর নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই দলটি ক্ষিপ্র সতর্কতায় চারিদিকে সন্ধানে ব্যাপৃত হয়। এবং অবিলম্বে আবিষ্কৃত হয় শঙ্করা।

শঙ্করার তখন ঘুম-ঘুম চোখ, এবং ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুটা বা ভীত। কিন্তু কৈশোব-অতিক্রান্ত তার বছর চৌদ্দ-পনেরোর সদ্য-যুবা দেহটিতে অনাহারের ক্লিষ্টতার মধ্যেও এক ধরনের বলিষ্ঠতার দ্যোতনা ছিল। অন্ধকারের মধ্যেও কালুর দৃষ্টিতে বাঘের খরতা। শঙ্করার মলিন বেশবাস, ক্ষুধাকাতর দৃষ্টি আর বলিষ্ঠ অবয়বটিকে জরিপ করল একবার। তারপর সঙ্গীদের নির্দেশ দেয় — 'এটাকে সঙ্গে নিয়ে চল্।'

শঙ্করা ঘটনা-গতির মধ্যে তখন আত্ম-সমর্পিত। ওদের কোনো কাজেই বাধা দিল না। চীৎকার করতে পারে ভেবে, যদিও সে চিন্তা ছিল অমূলক, ওরা সজোরে ওর মুখটা বেঁধে দেয়। তারপর নানা গলি-ঘুঁজি ঘুরিয়ে শঙ্করাকে ওরা নিয়ে আসে কালুর নিজস্ব ডেরায়। কালু স্বয়ং খুলে দিয়েছিল শঙ্করার মুখের বাঁধন। আজকের অভিযানটি যথেষ্ট লাভজনক হয়েছে, ফলে স্বভাব-উচ্ছল কালু ছিল আরো উচ্ছ্বসিত। মেজাজ বড়ই শরিফ। হুকুম দেয় — 'রুটি আর গোশ্ লিয়ে আয়। পেট্ ভরে খানাপিনা কর্। আর, এই পুঁচকেটো আজ থেকে আমাদের নতুন দোস্ত। একেও পেটভরে রুটি গোশ্ খিলা।'

শঙ্করা তার স্বল্প বুদ্ধিতেও এটা প্রথমেই অনুমান করতে পেরেছিল, একটি বিপজ্জনক দলের খপ্পরে পড়েছে সে। ডেরায় নিয়ে ওরা যে তাকে বড়ো রকমের কোনো শাস্তি, অন্ততঃ পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ মারধোর দেবে, এটা অবধারিত, সে ভেবে নিয়েছিল। কিন্তু পরিত্রাণের কোনো পন্থা তার অজ্ঞাত, সুতরাং আত্ম-সমর্পিত থাকা ছাড়া তার কোনো বিকল্প ছিল না। কিন্তু কালু, নিশ্চিত সেই দলপতি, শঙ্করাকে দোস্ত বলে আপ্যায়িত করায় সে বিহ্বল হ'ল।

কালুর এক শাগরেদ নিচু গলায় বলল— 'কিন্তু কালুজী, এই অপরিচিত ছোঁড়াটাকে প্রথমেই এতটা বিশ্বাস করা কি ঠিক হবে? পুলিশের টিকটিকিও তো হতে পারে। একটু খোঁজ খবর না নিয়ে —'

সশব্দে একটি চাপড় কষিয়েছিল কালুজী শাগরেদের পিঠে, 'আরে, উল্লু, তুই মানুষ চিনিস্ না? ছোঁড়াটার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ। ওই চোখ কি বেইমানী করতে পারে? মানুষকে বিশ্বাস করতে শেখ্ রে্ উল্লু।'

—হ্যাঁ, কালু তাকে বিশ্বাস ক'রে দলভুক্ত করেছিল। হাতে ধ'রে এ-লাইনের যাবতীয় অন্ধি-

সন্ধিতে রপ্ত করিয়েছিল। ছয় ছয়টা বছর তার অতিবাহিত হয়েছে কালুর দলে। শেষ পর্যায়ে কালুর দলের এক অপরিহার্য সদস্য ছিল সে। আর শুধু শঙ্করা নয়, দলের প্রত্যেকের প্রতিই ছিল কালুর অখণ্ড বিশ্বাস। কালুজী বলত — 'দ্যাখ্, এ লাইনটা বেইমানীর। কিন্তু তোরা কেউ বেইমান হবি না। বিশ্বাসটা সবচেয়ে বড় কথা।'

একা ঘরে, এই নির্জনে শুয়ে, কালুজীর এই কথাগুলি ভাবতে ভাবতে শঙ্করার মনে এক বিষাদের হাসি জাগে। এত যে বিশ্বাসের কথা বলত কালুজী, সেই কিনা একদিন চোরাগোপ্তা খুন হয়ে গেল তারই এক অনুগত বিশ্বাসী শাগরেদের হাতে। মানিকতলার খ্যাত-কীর্তি গুন্ডা বসির মিঞার পরোক্ষ মদত ছিল ঘটনাটায়। কালুজীর অপসাণের পর দলের অনেকেই ভিড় জমিয়েছিল বসির মিঞার পাশে। বসিরের দলবৃদ্ধির প্রয়োজনে তারও সাদর আহ্বান এসেছিল। কিন্তু নিজেকে বিরত রেখেছিল শঙ্করা ও-পথ থেকে।

এইমুহূর্তে কালুজী, তার দলবলের মুখগুলি, প্রতিভাত হতে থাকে শঙ্করার মনের পর্দায়।

তার পরের দিনগুলিও স্মৃতিতে আজও অম্লান। সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে ভিন্নতর জীবন-যাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে সে এসে ঘর বেঁধেছিল এই রিফিউজী কলোনীটিতে।

কিন্তু মানুষের দুর্নাম, তার সুনামের থেকে অধিক বলশালী, ফলে শঙ্করার দুর্নাম তার পিছু ত্যাগ করেনি। বরং কলোনীটিতে যা রটিত হল, তা শঙ্করার বাস্তব-ভিত্তিক জীবন-কথার থেকে অধিক রোমাঞ্চকর। এই পূর্ব পরিচয়হীন একা-বসবাসকারী যুবকটি দমদমের কুখ্যাত কালুগুণ্ডার একদা-শাগরেদ, অজস্র খুন-জখম-ডাকাতি-রাহাজানির নায়ক, এবং এই কলোনীটিতে একা বাস করার অবশ্যই কোনো গুপ্ত কারণ বর্তমান—ইত্যাকার প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক রটনাদিতে শঙ্করার চতুস্পার্শে একটি রহস্যময় বলয় নির্মিত হয়। এবং সে বলয়টির সিংহভাগ উপাদানই যে ভয়ের, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিলনা। আশপাশের লোকজন, নিকট দূরের প্রতিবেশী তাকে এড়িয়ে চলত সভয়ে, এবং সেও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়নি অবজ্ঞায়।

তারপরে শুরু হয় তার এই নতুন জীবন, জীবিকার্জনের নতুন পদক্ষেপ। স্নেহপ্রবণ দাস মশায়ের কথা মনে এসেছিল। দোকানে গেলে নিবারণ তাকে জানিয়েছিল সাদর আপ্যায়ন। ট্রেনে চালের চোরা চালানের ব্যবসাটিতে আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে তার হাতটি প্রসারিত ক'রে দিয়েছিল উদার ভাবে।

ধীরে ধীরে তার কুখ্যাত ভীতিপ্রদ পরিচয়টির পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল ভিন্ন এক ভাবমূর্তি। এ ব্যবসার লাইনে নরনারী নির্বিশেষে সকলের কাছে শঙ্করা তখন এক নিরাপত্তার প্রতীক। যত্র তত্র বিপদের ফাঁদ পাতা এ লাইনটিতে শঙ্করা যেন এক পরম নির্ভরতা, পরিত্রাতা। লতার মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনাগুলি শঙ্করার এই ভাবমূর্তিটিকে উজ্জ্বল করেছে অধিকতর। এ কলোনীটির অনেক নারীপুরুষই এখন রেলে চালের চালানদারীতে উপার্জনশীল, এবং তারা সকলেই এখন শঙ্করার প্রতি নির্ভরতা, সমীহ এবং বন্ধুতা পোষণ করে।

এ সবের সমাহারে এই যে এক উত্তেজক জীবন, এতে আবিষ্ট থাকে শঙ্করার দিন এবং রাত্রি। তবু কেন যে মাঝে মাঝে মনের এই পাগল-পাগল ভাব, কেন যে মাঝে মাঝে তার নিজেকে এত শূন্য, রিক্ত আর দেউলে মনে হয়। কে সে, কোথায় তার জন্মের উৎস, কি তার পিতৃমাতৃ পরিচয়? এ-সব প্রশ্নের উত্তর তার কাছে অতলান্ত রহস্য। সব প্রশ্ন এক বোধহীন নিরুত্তর জিজ্ঞাসা। বাবার কোনো স্মৃতির ক্ষীণ সূত্রও সে চেতনলোকে খুঁজে পায়না। এক আবছা নারীমূর্তি শুধু তার

চেতনায় অস্বচ্ছ প্রতিফলিত হয়। সীমান্তবর্তী সেই স্টেশন, বাল্যের প্রায়-বিস্মৃত কিছু মানুষ জন, আর মা নামক সেই রমণীটি তার সত্তার গভীরে এক মায়াবী পরিমণ্ডল নির্মাণ করে।

সেই রমণীটি কোথায় যে লীন হয়ে গেল, আজও তার হদিশ পেলো না শঙ্করা। অথচ 'বাবা' নামক সেই আজন্ম অপরিচিত মানুষটি, কিম্বা 'মা' নামক সেই অস্ফুট স্মৃতি-সম্বল রমণীটির জন্য কী যে এক আর্তি অনুভব করে শঙ্করা! মা এবং বাবা ডাকটি তার কাছে বড়ই সুদুর এবং অপরিচিত, কিন্তু ঐ দুটি ডাকের মেদুর মমতার জন্য সত্তার গভীরে বড়ই তোলপাড় খায়। কিন্তু ঐ দুটি মানুষ এক রহস্যময় দ্বীপ-খণ্ডের মতোই যেন সন্নিকটবর্তী হওয়ার পরিবর্তে ক্রমশঃ বিলীন হয়ে যেতে থাকে দূরান্তরে।

এই সব ভাবনা ক্রমশঃ তার স্মৃতিতে উজাড় হতে থাকে। পাশে বেড়ার গায়ে ঝোলানো ছোট একটি হাত-আয়না। তাতে প্রতিফলিত হয় শঙ্করার মুখ এবং ঘাড়ের একাংশ। কানের পাশে শ্যামল গাত্র-ত্বকের মাঝখানে বেশ বড়ো একটি সাদা দাগ। সাদা জন্ম জড়ুল। আয়নাটা নামিয়ে আরো নিকটবর্তী করে শঙ্করা। মনোযোগে দেখে — দে'খে যেতে থাকে দাগটাকে। ডানহাতের তালু দিয়ে চিহ্নটাকে ঘষতে থাকে সজোরে। জ্বালা ধরে ত্বকে।

হঠাৎ মনে পড়ে বনগাঁ স্টেশনের সমীপবর্তী সেই চায়ের দোকানীটির কথা। দোকানে চা খেতে গেলে ওর ঘাড়ের ঐ সাদা চিহ্নটাকে দেখেছিল গভীর মনোযোগে। এবং অস্ফুটে কি যেন বিড়বিড় করেছিল। দোকানী কি তার পরিচিত কেউ? কিম্বা কোনো আত্মজন?

বাইরে রৌদ্রতাপ ঘনীভূত হচ্ছে। বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঘরের অভ্যন্তরেও তার উদ্ভাস। কিন্তু ব্যাপ্ত কর্মজগতের মুখরতা, কিম্বা এই রৌদ্রতাপ — কোনো কিছুই এখন শঙ্করাকে সচেতন বা তপ্ত করতে সমর্থ হ'ল না। ময়লাটে শয্যায় তার অলসতা ঘনীভূত হ'ল আরো।

শঙ্করার চিন্তায় এখন এক ভিন্নমুখী প্রবাহ। এবং সে এমত বোধ করে, সে এক একক মানুষ। এবং এই নিঃসঙ্গতা, এই একাকীত্ব, তার কাছে দুঃসহ পীড়াদায়ক। নিত্যকার কর্মসূত্রে সহস্র মানুষের সঙ্গে সান্নিধ্য, কিন্তু কেউই তার আপনত্বে স্বীকৃত নয়। কিন্তু কাকে সে আপনত্বে চিহ্নিত করবে? মা-বাবার স্নেহ-সান্নিধ্য, যতই তা কাঙ্খিত হোক, চিরকালই তা থাকবে স্বপ্নের মতো মিথ্যা, অলীক। অন্য কোনো মানুষ, যে হবে তার আপন! এবং অন্তরঙ্গ। এবং সে মানুষটি যদি হয় একটি নারী। কিন্তু কে সে? কে হবে সেই মায়াবী মানবী?

চকিতে মনে ভাসে একটি নারীর মুখ এবং তার সর্ব অবয়ব। বড়ই মমতাময়ী রহস্যময়ী সেই নারী। এবং সে নারীটি বিন্তি।

আকস্মিক এক চমকে যেন সজাগ সচেতন হয় সে। এবং সবেগে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে —'না না, — তা কি ক'রে হবে — তা কি ক'রে হবে?'

বিষণ্ণ এক ঘোর কিম্বা আচ্ছন্নতায় অতিক্রান্ত হয় দীর্ঘ দুপুর।

শঙ্করার বিশ্রাম কিংবা অলসতা নির্বাধ হয় না। দগ্ধ আকাশের এক প্রান্তে ঈষৎ মেঘ-সঞ্চারে বিকেলের পড়ন্ত রৌদ্রে যখন কিঞ্চিৎ শীতলতার আভাস, তখন ওরা এল। বিন্তি এবং রতন। চাল-চালানদারীর রোজকার কর্মধারায় সকলেই এখন স্বাধীন, স্বাবলম্বী, — কিন্তু পারস্পরিক সান্নিধ্য এবং সাক্ষাতাদি উজ্জীবিত রাখে সকলকে। বিশেষতঃ শঙ্করার আকস্মিক কোনো অনুপস্থিতি ঘনিষ্ঠদের কাছে জিজ্ঞাসা এবং উদ্বেগের কারণ হয়। আজও অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়

শঙ্করার অনুপস্থিতিতে।

বিকেলের ট্রেনে শেয়ালদা থেকে ফেরার পথে একই কামরায় সহযাত্রী ছিল বিন্তি আর রতন। সারাদিনে শঙ্করার অদর্শন ভাবিত রেখেছিল বিন্তিকে। শরীর খারাপ — কিম্বা অন্য কোনো বিপত্তি? রতনকে দেখেই ভাবনাটা তার ভাষা পায়। রতনের কাছে শঙ্করার কথা জিজ্ঞাসা করতে প্রাথমিক সঙ্কোচ অবশ্যই ছিল, কারণ রতন ইদানীং অধিকতর মুখফোঁড়, হয়ত শঙ্করাকে জড়িয়ে কোনো রসিকতা করে বসবে। কিন্তু সে দ্বিধাটা সে কাটায় অবিলম্বে এবং বলে —

—'শঙ্করাদা আজ আসেনি রতন? দেখেছো ওকে?'

বিন্তির উদ্বেগ যেন সঞ্চারিত হয় রতনের মধ্যেও—

—'নাতো বিন্তিদি, শঙ্করাদার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আমি ভাবছিলাম, তোমাকে জিজ্ঞাসা করব, তুমি জানো কিনা।'

ক্ষণিক বিরতিতে রতন বলে — 'আচ্ছা বিন্তিদি, শঙ্করাদা তো শুনেছি তোমাদের ওদিকেই থাকে। ওর বাড়ীটা চেনো?'

—'আমাদের বাড়ী থেকে আরো অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে নাকি শঙ্করাদার বাড়ী। আমি কোনোদিন যাইনি। তা, তুমি যাবে নাকি ওর বাড়ী?'

—'ভাবছি একবার যাবো। আজ কাজে এলো না কেন বুঝতে পারছি না। একবার খোঁজ নেওয়া দরকার।'

কিঞ্চিৎ দ্বিধা, তারপর তা অতিক্রম করে রতন, বলে — 'তুমিও চলো না বিন্তিদি— আজ আর কাজ করতে হবে না, ওর বাড়ী গিয়ে একবার খোঁজ নিয়ে আসি।'

বিন্তির দু'চোখে আলোর উদ্ভাস, মুখমণ্ডলে আকস্মিক রক্তোচ্ছ্বাস — 'তুমি বলছ যখন, চলো তোমার সঙ্গে যাই।'

কলোনীটির শেষ প্রান্তে, খুঁজে খুঁজে ওরা বের করেছিল শঙ্করার বাসস্থানটি। সম্মুখবর্তী ঝোপঝাড় আর জঙ্গলাকীর্ণ একটেরে মেঠো রাস্তাটিতে দাঁড়িয়েই সুউচ্চ হাঁক পেয়ে ছিল রতন— 'শঙ্করাদা, বাড়ী আছো নাকি?'

ত্বরিতে আলস্য আর আচ্ছন্নতাটুকু ঠেলে সরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল শঙ্করা। বিন্তি আর রতনের আকস্মিক আগমন তাকে বিস্মিত করে — 'আরে বিন্তি — রতন — কি ব্যাপার? হঠাৎ দুজনে?'

শঙ্করার শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয় বিন্তি। কণ্ঠস্বরে আসে তরলতা — 'কেন, আসতে নেই বুঝি তোমার বাড়ী? এ্যাই রতন, বলছ না কেন, আমরা কিন্তু আজ তোমার অতিথি শঙ্করাদা।'

হঠাৎ শঙ্করা যেন গৃহকর্তার দায়িত্ববোধে সচেতন হয় — 'আরে, সে তো ঠিক কথাই! এসো বিন্তি, আয় রতন, ঘরে আয়।'

শঙ্করার জীর্ণ ঘর, স্বল্প পরিসর, তার মধ্যে তিন অকৃত্রিম সুহৃদের আনন্দ, কলোচ্ছ্বাস মুখরতা পায়।

খোঁজাখুঁজিতে কৌটাদির মধ্যে কিছু চা চিনি এবং মুড়ি আবিষ্কৃত হয়। স্টোভটা ধরাতে ধরাতে শঙ্করা বলে, —

—'দাঁড়াও — আগে একটু চায়ের ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখি।' —

বাঁশের মাচানটির একপাশে উপবিষ্ট ছিল বিস্তি। ত্বরিতে উঠে দাড়ায় — 'ও কাজটা আমাকে দাও শঙ্করাদা, ওটা আমি তোমার থেকে ভাল পারব।'

শঙ্করার প্রবল অনীহা — 'আরে না, না — তাই হয় নাকি? তোমরা হ'লে গিয়ে আজ আমার অতিথি। আমি যা পারি — ক'রে দিচ্ছি।'

বিস্তির কণ্ঠে কপট ক্রোধ — 'দ্যাখো শঙ্করাদা, ভালো হবে না বলছি! ওঠো আগে ওখান থেকে! খুব তো অতিথি অতিথি করছো! চা খাওয়ালেই বুঝি অতিথি-সৎকার হয়ে যায়? একদিন এসে পেট পুরে মাংস-ভাত খেয়ে যাবো। কি বলো রতন?'

শঙ্করা এবং বিস্তির প্রণয়-কলহটুকু যেন তারিয়ে উপভোগ করে রতন। শঙ্করার বাড়ীতে এই আকস্মিক আগমন বিস্তিকে যে প্রগল্‌ভ করেছে, সেটা উপলব্ধি করে সে। সহাস্যে বলে —

—'তুমি কিন্তু আমাকে একবারও ভালো বললে না বিস্তিদি—'

—'কেন, তোমাকে আবার ভালো বলতে যাবো কেন? কি ভালোর কাজ করেছো তুমি?'

—'এই যে তোমাকে শঙ্করাদার বাড়ী নিয়ে এলাম! এতো তো আসার ইচ্ছে, কিন্তু কোনোদিন তো সাহস ক'রে আসতে পারোনি। আজ কেমন তোমাকে নিয়ে এলাম!'

বিস্তির কণ্ঠে আবার কপট ক্রোধ—

—'দ্যাখো রতন, বাজে কথা বললে ভালো হবে না বলছি! আমি কারো বাড়ীতে আসার জন্য পা বাড়িয়ে বসে ছিলাম না।'

ত্বরিতে উঠে দাঁড়ায় রতন। সাষ্টাঙ্গে উপুড় শুয়ে পড়ে এবং নাক ঘষে মাটিতে— 'এই ঘাট মানছি বিস্তিদি, অমন ফোঁস-মনসার মতো ফোঁস ফোঁস করে শাপমন্যি দিও না।'

শঙ্করা হা হা করে হাসে।

বিস্তির চা পর্ব সমাপ্ত হয়। এক গাল ক'রে মুড়ি চিবিয়ে চা পান সমাধা হয়।

রতন বলে — 'এবার বলো দেখি গুরু, শরীর-গতিক তো ভালই দেখছি, তা এমন কাজকম্মো কামাই ক'রে, ঘরে মটকা মেরে প'ড়ে আছো কেন?'

হঠাৎ শঙ্করা যেন কিছু উত্তেজিত — 'কেন, রোজই কি কাজ করতে হবে নাকি? আর কেন কাজ কামাই ক'রে শুয়ে আছি, সে কৈফিয়ৎ কি তোকে দিতে হবে নাকি?'

শঙ্করার আকস্মিক দাবড়ানিতে রতন কিঞ্চিৎ ভ্যাবাচ্যাকা — 'না না, আমি এমনিই বলছিলাম। বিনা কারণে তুমি তো বড়ো একটা কামাই করো না, তাই বলছিলাম।'

পূর্বেকার আকস্মিক ক্রোধ স্তিমিত, অন্যমনস্ক শঙ্করা চুপচাপ বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ধীর এক আত্মগত উচ্চারণে বলে — 'আমার কিছু ভালো লাগে নারে রতন!'

শঙ্করার এ উচ্চারণ যেন কিছু সাহসী করে রতনকে — 'তোমারও ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা আছে নাকি শঙ্করাদা! দিনরাত তো দেখছি ল'ড়ে যাচ্ছো। এর বাইরে তোমার আর কোনো ভাবনা আছে, তা তো মনে হয়না।'

শঙ্করা নিরুত্তর। বিষণ্ণতা মাখামাখি হয় তার চোখে মুখে। ওদিকে নির্নিমেষ প্রগাঢ় চোখে বিস্তি তাকিয়ে থাকে শঙ্করার মুখমণ্ডলে। কি যেন এক মায়া তাকে আমূল দ্রব করে।

ক্রমশঃ ঘনীভূত হতে থাকে দিনান্তের অন্ধকার। শঙ্করা যেন ফিরে পায় তার স্বতঃস্ফূর্তি— 'নে, ওঠ্ এবারে, চল্ তোদের একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।'

ওরা বাইরে এসে দাঁড়ায়। গ্রীষ্মের আকাশে উজ্জ্বল আলোকিত তারাদের অবস্থান। পারিপার্শ্বিকে ঝিল্লি আর মশকদের ঐকতান। সুদূরে উত্তর-পশ্চিমে কৃষ্ণাভ দিগন্তে নৈহাটি খড়দহের শিল্পাঞ্চলের বৈদ্যুতিক আলোর অস্বচ্ছ বিভা।

পারিপার্শ্বিক অন্ধকারের অঙ্গীভূত হয়ে পথহীন পথে ওরা ক্রমিক অনুবর্তিতায় অগ্রসর হয়।

।। তেরো ।।

সময় বড়ই নির্মম এক ঘাতক এখন। তার অভিঘাতে তাবৎ দেশের যুবশক্তি অস্থির, টালমাটাল। মুক্তির দশকের উন্মাদনায় দলীয় রাজনীতি এবং দলবাজির ভেদরেখা নিশ্চিহ্ন। নিজস্ব দলীয় রাজনীতিকে সাচ্চা প্রতিপন্ন করার জন্য পারস্পারক হানাহানির তীব্র ন্যক্কারজনক এক বীভৎস রূপ। একদিন আগে যে ছিল হত্যাকারী, পরদিন হয়ত তারই লাশ ফালাফালা হচ্ছে বিরুদ্ধবাদীব বদলা নেবাব ছোরার হিংস্রতায়। অবিশ্বাস, হিংসা, খুন, রক্তপাত —শুধু পারস্পারিক বদলা নেবার উগ্র উন্মাদনা। এবং এরই নাম এখন রাজনীতি। যুবশক্তির এই মারণ-যজ্ঞের সমান্তরালে পুলিশি-শক্তিও মারমুখী, হিংস্র। দমন-নীতির নতুনতর কৌশল আবিষ্কারে তাদের তৎপরতা তুলনা বহিত। এ শতকটি নিদারুণ সব অভিজ্ঞতার অংশীদার করেছে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে।

স্টেশনের অদূরে রেললাইনের পাশ্ববর্তী অপেক্ষাকৃত নির্জন মাঠটিতে সন্ধ্যার অন্ধকারে মর্মান্তিক একটি ঘটনা সংঘটিত হ'ল। কয়েক দিন আগে দলীয় রাজনীতির যুযুধান দুইপক্ষ বিস্তর বোমা পটকা সহযোগে পরস্পরের সম্মুখীন হয় এখানে। কিন্তু উভয় পক্ষেরই সামর্থ্যের পাল্লাটা যেহেতু ছিল মোটামুটি সম পরিমাণ, ফলে কেউ কাউকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি। তবে বেপাড়ার ছেলেগুলি প্রচুর পটকা ফাটিয়ে পাড়ার জনগণ এবং এ-পক্ষকে নিশ্চিত হতচকিত করে এবং নিশ্চিত নিরাপত্তায় অন্তর্ধান করে নিজস্ব এলাকায়। আচমকা আজ ওপক্ষের একটি ছেলে সন্ধ্যার অন্ধকারের সুযোগে এখানে একা আসে ব্যক্তিগত অথবা দলীয় প্রয়োজনে, এবং চিহ্নিত হতে বিলম্ব ঘটে না। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এপক্ষের কয়েকটি ছেলে তাকে ঘিরে ফেলে দ্রুত-পলায়নের কোনো রকম সুযোগ না দিয়েই বাঁশ, রেল লাইনের খোয়া ইত্যাদি সুলভ অস্ত্র-সহযোগে ক্ষত বিক্ষত করে ছেলেটিকে। তার মৃত্যু-যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদেও স্থানীয় বাসিন্দারা স্বেচ্ছাকৃত কুলুপবন্দী থাকল ঘরে। ঘন্টাখানেক বাদে আগমন ঘটে পুলিশের। শূন্য রণস্থল থেকে তারা আঠারো বছরের ছেলেটির রক্তাক্ত মৃত অথবা অর্ধ মৃত দেহটিকে তুলে নিয়ে যায় হাসপাতালে। অতঃপর তল্লাটটিতে সন্ত্রাসের নানা গুজব এবং উত্তেজনা ঘনীভূত হয়। কারণ ঘটনাটি বদলা-গ্রহণের ব্যাপক ভূমিকায় সবিশেষ কার্যকরী। সব মিলিয়ে উত্তেজক পরিস্থিতি।

চালের বাজারে ঢোকার পথে বরুণের সঙ্গে মুখোমুখি হয় শঙ্করার। সম-ব্যবসায়ী, সহযাত্রী, — সুতরাং পারস্পরিক সাক্ষাতাদি অপরিহার্য। কিন্তু শঙ্করা যথাসাধ্য এড়িয়ে চলতে সচেষ্ট থাকে বরুণকে। বরুণের তুখোড় আচরণ, স্কুলে শিক্ষালাভ, একটি রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য — ইত্যাদি কারণে নিজস্ব সঙ্কোচ-হেতুই শঙ্করা বরুণ সম্পর্কে বর্জনাত্মক রক্ষণশীল মনোভাবে স্থিত থাকে। আজও যথারীতি বরুণকে পাশ কাটাতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু বরুণ ডাকল তাকে —

— 'একটা কথা ছিল।'

— 'বল্।'

— 'হীরুদার সঙ্গে তোমার কোনো কথাবার্তা হয়েছে?'

সচকিত হয় শঙ্করা। হীরুবাবুদের পার্টি অফিসে সাক্ষাৎকারের সেই দৃশ্যদি মনে ভাসে।

— 'কেন বল্‌ত?'

— 'সবাই বলছে, হীরুদাকে নাকি তুমি খুব গরম দেখিয়ে এসেছো। তোমার উপর দারুণ খচেছে হীরুদা। একটু সাবধানে থেকো শঙ্করাদা।'

—'ঠিক আছে, যা। তোর নিজের চরকায় তেল দে গিয়ে।'

— 'আমি কিন্তু তোমার ভালর জন্যই বলছি শঙ্করদা। হীরুদার অনেক ক্ষমতা। ওনার দলেও অনেক রকমের ছেলে আছে। ওরা সব করতে পারে।'

শঙ্করার কণ্ঠস্বর নমনীয় হয়। পিঠে হাত রাখে বরুণের।

—'আমি তো কারো কোনো ক্ষতি করিনি বরুণ। শুধু শুধু হীরুদা আমার ক্ষতি করতে যাবে কেন?'

— 'সে আমি জানিনা শঙ্করাদা, যা শুনেছি, তাই তোমাকে বললাম।'

একদিন ওরা দলবদ্ধভাবে শিয়ালদহ রেল অফিসে সন্ধান নিল। লতার মৃত্যুর ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন রেলের পদস্থ অফিসার। কোনো সরকারী প্রতিশ্রুতিই পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার কার্যকারীতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকাটা এদেশের প্রচলিত রেওয়াজ। কিন্তু ওরা সানন্দে জানল, মৃতা লতার নামের টাকাটা দ্রুত পাবার সম্ভাবনা। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সেই ভাবেই আনাগোনা করছে উধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে, এসব ওদের জানানো হ'ল। লতার বাক্স-পেঁটরা হাতড়ে তার কায়-ক্লেশে সঞ্চিত কিছু অর্থের সন্ধান মিলেছে। সাময়িক একটা ব্যবস্থা তা দিয়ে সম্পন্ন হচ্ছে লতার মার। সরকারী টাকাটা পাওয়া গেলে লতার মার একটা নিশ্চিন্ত ব্যবস্থাকে স্থায়ীত্ব দেওয়া যাবে।

ঘন বর্ষার সমারোহে প্রকৃতি এখন আশ্চর্য সজীব। বাতাসে স্নিগ্ধতা, আর্দ্রতা। নাগাড়ে দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টিপাত, কিম্বা বর্ষণের আকস্মিকতা জনজীবনে অবশ্যই বিভ্রাটকারী অথবা কর্দমাক্ত রাস্তাঘাট, পিচ্ছিলতা বিরক্তিজনক। এতৎ সত্ত্বেও, এবর্ষার সজীবতা প্রাণীকুলকে সতেজ, উজ্জীবিত করে। এক ধরনের ব্যাপ্তির সঞ্চার হয় জীবনে।

অঝোর বর্ষণ-মুখর এক অপরাহ্নে ওরা স্টেশনে সমবেত থাকে। আপ ট্রেনে স্টেশনে নামতেই প্রবল বর্ষণের এই আকস্মিক বিপত্তি, এবং বৃষ্টির বিরতি না ঘটা পর্যন্ত অবস্থানে বাধ্য থাকে ওরা। স্টেশনের টিনের শেডের তলাটুকু ভিড়াক্রান্ত, বৃষ্টিধারার প্রবল ছাঁট থেকে আত্মরক্ষার জন্য জন-কুণ্ডলী ক্রমশঃ ভিতরমুখী চাপে সংলগ্ন, পিণ্ডাকৃতি। সেই বাধ্যতামূলক সহাবস্থানে ওরাও সংলগ্ন থাকল। শঙ্করা, রতন, বিপ্তি, অনুভা এবং আরো কয়েকজন। বর্ষণের বিরতির জন্য ওরা থাকে অপেক্ষামাণ এবং সেই অপেক্ষার মধ্যে ওরা একটি দৃশ্য দেখল।

সংবদ্ধ জন-সমাবেশটির প্রান্তদেশে ভিড়ের চেহারা কিছু ভিন্ন প্রকৃতির। জীর্ণ ময়লাটে দুর্গন্ধ-যুক্ত কাঁথা কাপড়ের কষ্টকর স্থান-সঙ্কুলানে একটি বিছানার আয়োজন, আর তার মধ্যে পুঁটুলি -সদৃশ একটি শীর্ণ মনুষ্য-অবয়ব। কোটরগত চোখ, শণের মতো দড়ি পাকানো চুল এবং এক সার্বিক অসহায়তা। সারা মুখে মলিন অমসৃণ ত্বকে রেখার আঁকিবুকি। পাণ্ডুর অধরোষ্ঠে মাঝে মাঝে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি।

সেই জরদ্গব ভিড়ের মধ্যে গা বাঁচিয়ে ওরা সন্তর্পণে সমীপবর্তী হয়। ওরা বোঝে, এ এক নারী-মনুষ্য, প্রৌঢ়া, অনাহারজনিত শীর্ণতার সঙ্গে প্রবল জ্বরের প্রকোপে এখন হত-চেতন। মমতার তাড়নায় ওরা রমণীটির চারপাশে সন্নিবিষ্ট হয়।

রমনীটির নিজস্ব কিছু ইতিহাস আছে।

১৯৪৭-এ দেশ ভাগের পর ওপার বাংলা ত্যাগ করে এপার বাংলায় যারা আশ্রয় নেয়, তারা ক্রমশঃ থিতু হয়ে এ-দেশের মাটিতে কিছু না কিছু জমির অবলম্বন পায় এবং সেখানে শিকড়-বাকড় মেলে বসবাসকারীর নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা অর্জন করে। কিন্তু এদের মধ্যে কিছু হতভাগ্য, অধিকাংশই চাষ-আবাদের মানুষ, পশ্চিমবাংলায় স্থানাভাবের অজুহাতে পুনর্বাসনের নামে প্রেরিত হয় দণ্ডকারণ্যের অনিশ্চয়তায়।

যেসব আকর্ষণ বাসস্থানের মাটিকে বাস্তুভিটার মর্যাদায় মণ্ডিত করে, সেই স্বস্তি নিরাপত্তা এবং নিশ্চিন্ততা অনেকেই তারা খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয় সেখানে। ফলে সত্তার কোনো শিকড় সেই বিভুঁই মাটিতে তাদের প্রোথিত হয়না, প্রবাসের যন্ত্রণা তাদের নিয়ত বিদ্ধ করে এবং ছেড়ে-আসা বাস্তুভিটা ঘরবাড়ী নদীনালার জন্য দীর্ঘশ্বাস মোচন করে সতত। স্মৃতি এবং স্বপ্নের দেশ পূব-বাংলায় ফিরে যাওয়ার আকাঙ্খা আর করে না, কিন্তু নিদেনপক্ষে স্বভূমি পশ্চিমবাংলার প্রত্যন্ত অংশেও একটু বাসভূমির অংশীদার হতে পারাটাই এখন চরম প্রার্থিত বলে মনে হয়। এই সব সাধ, স্বপ্ন, বুকের মধ্যে অনির্বাণ লালন করে ওদের অতিবাহিত হয়েছে দীর্ঘ দিন, মাস, বছর।

এমত সময়ে পূব-বাংলায় খান-সেনাদের বিরুদ্ধে ঘটে সেই অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক জন-জাগরণ। অতঃপর, অত্যাচার, হত্যা, দেশত্যাগ। সংঘর্ষ, সংগ্রাম পেরিয়ে অবশেষে পূর্ববঙ্গে বাঙালীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা।

এসব রোমাঞ্চকর সংবাদাদি নানাবিধ পল্লবিত আকার নিয়ে দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু-জনবসতিতেও প্রচারিত হয়। এবং এমত ধারণা জন্মে যে, বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান তাদের জন্য এক অলৌকিক স্বর্ণ-প্রতিমা-সদৃশ 'জয়-বাংলা' প্রতিষ্ঠা করেছেন, এবং সেখানে গেলেই তাদের সাদর আসনটি প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই সব মায়া-মমতার মরীচিকা-বিভ্রম একদিন দণ্ডকারণ্যের কিছু উদ্বাস্তু মানুষকে পুনরায় টেনে আনে পশ্চিমবঙ্গে। বিভিন্ন বয়সের, রোগজীর্ণ, শিকড়হীন ভিখারী-সদৃশ কিছু মানুষ। পূব-বাংলায় তখন 'জয়-বাংলা' কায়েম হয়েছে, সাময়িক শরণার্থীরা ক্ষয়ক্ষতি পেরিয়ে আবার ফিরে গিয়েছে স্বগৃহে। দণ্ডকারণ্যের ঐ উদ্বাস্তু দলটি যদি পূব-বাংলার ঐ বৃহত্তর শরণার্থী-স্রোতের সঙ্গে মিলিত হতে পারত, তাহলে হয়ত বহুদিন বাদে আবার তারা পূব-বাংলায় স্বভূমিতে ফিরে যেতে পারত। কিন্তু যখন ওরা পশ্চিম-বাংলায় এসে পৌঁছায়, তখন রাষ্ট্র-নিরাপত্তার স্বাভাবিক সুবাদে উভয়-বাংলার সীমান্ত অঞ্চল সুরক্ষিত হয়েছে সীমান্ত-রক্ষীদের দ্বারা। ফলে, ভাসমান শ্যাওলার মতো দণ্ডক-অরণ্যবাসী এই উদ্বাস্তু দলটি সীমান্তে পৌঁছালে বিতাড়িত হয় অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে।

তারপর সেই নিরাশ্রয় মানুষগুলি, আজ এখানে কাল ওখানে, বিভিন্ন রেলস্টেশনের প্লাটফর্মে ঠেক্ খেতে খেতে এসে হাজির হয় এই স্টেশনটিতে। বর্ষা বাদলায়, অনশনে বা অর্ধাশনে এখানে প্লাটফর্মের তলায় তারা কাটিয়ে দেয় কয়েকটি দিন। কিন্তু এই সাময়িক আস্তানাটুকুও দীর্ঘস্থায়ী হ'ল না, কারণ রেল-পুলিশ তাতে বাদ সাধল। স্টেশন ত্যাগ করবার জন্য জারি হ'ল তাদের উপর কড়া নির্দেশ। এবং তারা নিশ্চিত অবহিত হ'ল, পূব-বাংলা বা পশ্চিম বাংলা-কোনোটাই আর তাদের স্বভূমি, স্বদেশভূমি নয়। তারা এখানে বহিরাগত, অনুপ্রবেশকারী মাত্র।

অতঃপর বাংলার শ্রাবণের অঝোর বারিধারার সঙ্গে নিজেদের অশ্রু একীভূত ক'রে দিয়ে বাংলার মাটি ত্যাগ ক'রে চিরতরে তারা পা বাড়ায় দণ্ডকারণ্যের পথে।

এই উদ্বাস্তু দলটির আগমন-প্রত্যাগমনের ইতিকথার সঙ্গে সংযোগ আছে ঐ রমণীটির।

এই দলটির মধ্যে ছিল ঐ প্রৌঢ়া নারীটিও। পুলিশের তাড়নায় যখন ওরা স্টেশন ত্যাগ ক'রে রেলগাড়িতে চড়ে, তখন সকলেই নিজস্ব জিনিসপত্র এবং নিকটজনের হিসেব নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আলা ভালা নারীটি তাদের সঙ্গী হ'ল কিনা, বা হতে পারল কিনা, এ-বিষয়টিতে কারোপক্ষে মনোনিবেশ করা সম্ভব হ'ল না।

বস্তুত এই প্রৌঢ়াটি দলের পক্ষে একটি বোঝা-স্বরূপ। যেহেতু সে একা এক মানুষ, নিজস্ব

আত্মজনহীনা, অন্যের করুণা এবং অন্নের উপর নির্ভরশীল, এবং এভাবেই সে এতদিন দলে থেকে যায়, ফলে কেউ তাকে রাখেও না, আবার কেউ তাকে বিতাড়িতও করে না। থাকলে থাকবে, না থাকলে থাকবে না।

দণ্ডকারণ্যে বাসকালীন তার জীবন-চরিতও অনুরূপ। কিছুটা বিকৃত-মস্তিষ্ক। যখন সে সুস্থ মস্তিষ্কে থাকে, তখন সে স্থির শান্ত স্বল্পভাষী। কিন্তু যখনই বিকৃতি আসে, কথা বলে নিরন্তর। কবে নাকি তার একটি ছেলে ছিল, তার জন্য বিলাপ, আবার কখনও বা 'বাঁচাও বাঁচাও'বলে পরিত্রাহি আর্তনাদ, ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ। তরুণ তরুণীদের কাছে সেগুলি অর্থহীন প্রলাপের নামান্তর, কারণ সমস্ত প্রসঙ্গ-সূত্রই তাদের কাছে ধোঁয়াময়, অস্বচ্ছ। ফলে বয়সের তরলতায় বৃদ্ধার প্রলাপ-বচনকে তারা বিদ্রূপে ব্যঙ্গে বিদ্ধ করে কখনও বা। কিন্তু দলের প্রবীণ মানুষেরা, যারা জানে ওর ইতিবৃত্ত, এমত পরিস্থিতিতে দুঃখ অনুভব করে, তরুণদের শাসিত রাখে এবং বলে— 'বুড়িটা বড়ো হতভাগিনীরে — ওকে তোরা জ্বালাস্‌নে।' — পরান্নে এবং পরের করুণায় নির্ভরশীল অসুস্থ মস্তিষ্কের এই নারীটি যে এখনো জীবিত থাকতে পেরেছে, এটাই সবিশেষ আশ্চর্যের।

বিনা প্রস্তুতিতে দলটি যখন দ্রুত স্টেশন ত্যাগ করবার জন্য কলকাতামুখো ট্রেনে চাপে, রমণীটি তখন ট্রেনে আরোহণ বা অবতরণে একান্তই অক্ষম এবং দলটি থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়। অনাহার, উপর্যুপরি যত্রতত্র ভেসে বেড়ানো, বৃষ্টিতে ভেজা, এসব কারণে বৃদ্ধাটি তখন সবিশেষ অসুস্থ, প্রবল জ্বরে হতচেতন। দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, একা অসহায়, যেন বা মৃত্যুর জন্য সে ছিল প্রতীক্ষারত।

এমত সময়ে শঙ্করা, বিন্তি, রতন, অনুভাদের দলটির গোচরে এল বৃদ্ধা। ইতিমধ্যে বর্ষণে ক্ষান্তি আসে। অপেক্ষমাণ যাত্রী-সাধারণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় প্লাটফর্মে এবং ভিড়ের ঘনত্ব হালকা হয়।

সেই ভিড়ের মধ্য থেকে মন্তব্য আসে — 'এই শালা রিফিউজিগুলোর জ্বালায় দেখছি ভদ্রভাবে বাস করাই দায় হয়ে উঠল।'

— 'বুড়িটাকে দেখছেন, এখনই মরবে। মরবার আর জায়গা পেলো না।'

—'ঠিকই বলেছেন। আর রেলের লোকদেরও বলিহারি। প্রশাসন বলে তো কিছু নেই। যাত্রীদের কথা কে আর ভাবছে।'

যাত্রী-সাধারণের যারা এসব মন্তব্যের উৎস, তারা এখন পশ্চিমবাংলার সমৃদ্ধ, সম্পন্ন নাগরিক। কিন্তু তারাও যে একদা উদ্বাস্তু হয়েই এদেশে এসেছিল, এখন অবস্থাগুণে, সেটা তাদের এক মহৎ বিস্মরণ।

পারিপার্শ্বিকে লোকজনের সমাবেশ এখন কিছু হালকা, ফলে শঙ্করা এবং ওর দলটি অসুস্থ মহিলাটির যথাসম্ভব নিকট-স্থানে পৌঁছাতে পারে, এবং ওকে পর্যবেক্ষণ করে।

শঙ্করা বলে — 'মানুষটা কোথা থেকে এখানে এলো বল্ দেখি? আগে তো চোখে পড়েনি।'

দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুরা স্টেশন-প্লাটফর্মের যে দিকটায় সাময়িক বসতি নির্মাণ করেছিল, এখন তা শূন্য। শুধু কয়েক টুকরো পোড়া কাঠ, ভাঙা মাটির হাড়ি ইতস্ততঃ ছড়ানো। সেদিকটা নির্দেশ ক'রে রতন বলে—'দেখতে পাচ্ছো না, ওদিকটা খালি, ওই দলেরই কেউ হবে বোধ হয়।'

অনুভা মহিলাটির কপালে হাত দেয়, চমক খায় এবং ত্রস্তে বলে —'ওমা, এ যে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। একটা কিছু করা দরকার যে শঙ্করাদা।'

শঙ্করার কণ্ঠে বিরক্তি, রূঢ়তা — 'নে, ভালো ঝামেলা বাধালি। কাজকর্ম বন্ধ ক'রে এখন এইসব কর।'

অনুভা ব — 'তা কি করা যাবে। তাই বলে তো মানুষটা চোখের সামনে মরে যেতে পারে না।'

শঙ্করা এক পলক মহিলাটির মুখের দিকে তাকায়, কিছু ভাবে বলে —'তোরা ব'স এখানে, আমি একটু আসছি।'

পলক দৃষ্টিপাতে শঙ্করা বোঝে, মহিলাটা প্রবল জ্বরাক্রান্ত, কিন্তু নিরাময়ের জন্য প্রাথমিক ভাবে পেটে পুষ্টিকর কিছু পড়াটা জরুরি। নিকটবর্তী চায়ের দোকানটিতে সে চলে যায় দ্রুত, এবং সেখান থেকে এক গ্লাস গরম দুধ সংগ্রহ করে নগদমূল্যে।

দুধের গ্লাস নিয়ে ফিরে আসতেই দ্রুত উঠে আসে বিন্তি, হাত বাড়িয়ে বলে — 'গ্লাসটা আমাকে দাও।'

বিন্তি তখন ধীরে ধীরে, পক্ষীমাতা যেমন মমতায় তার শাবককে খাওয়ায়, মহিলাটির দুই ঠোঁট ঈষৎ মুক্ত ক'রে, ফোঁটা ফোঁটা দুধ ঢালতে লাগল ওর মুখে। কিছুটা কষ বেয়ে গড়ায়, কিছু পেটে যায়। বিন্তির এই ধৈর্যশীল সেবায়, কিম্বা পাকস্থলীতে ঈষদুষ্ণ দুধের প্রাণময় উত্তাপ সঞ্চারে, কিঞ্চিৎ সম্বিৎ পেরে রমণীটির। চোখ মেলে বিহ্বল তাকায়, কিন্তু পার্শ্ববর্তী আগ্রহী, ঝুঁকে-থাকা মুখগুলির কোনোটিই যেহেতু তার পরিচিত নয়, সে হতাশ হয় এবং আবার চোখ বোজে।

প্লাটফর্মে অপেক্ষমাণ, অথবা ভ্রাম্যমাণ জনগণ এসব দৃশ্য দেখে—এবং কৌতূহল বোধ করে। চালপার্টির এইসব আচবণে কেউ বা রগড়-ওথলানো কণ্ঠে মন্তব্য করে—'বজ্জাতগুলো কত নক্‌শা যে জানে মাইরি।'

আবার কেউ কেউ, অনাত্মীয় অচেনা এক মুমূর্ষুর সেবায় ওদের তন্ময়তা দেখে, মুগ্ধ হয়।

শঙ্করা যেন রতন বিন্তিকে ধমক দেয় — 'নে, এবার ওঠ সব, বাজারে চল্।'

বিন্তি ওঠে না, বলে — 'একটু দুধ খাওয়ালেই কি মানুষটা বেঁচে যাবে?'

শঙ্করার কণ্ঠে ধমকের সুরটুকু ধরা থাকে — 'কেন, আর কি করতে হবে শুনি? কাজকর্ম বন্ধ ক'রে রাত জেগে সবাই সেবা করতে হবে নাকি?'

রতন বলে — 'মানুষটাকে বাঁচাতে গেলে তা তো করতেই হবে। কিন্তু তার আগে ওকে এখান থেকে সরানো দরকার।

—'আচ্ছা বাই চাপল দেখছি তোদের মাথায়! মানুষটাকে সরানো দরকার! কিন্তু সরাবি কোথায় শুনি? কোথায় এতো লম্বা-চওড়া জায়গা আছে?

শঙ্করার কণ্ঠস্বর গরগর করে।

মাথা নিচু করে রতন। ধীরে বলে — 'আমি বারাসতে মাসির ঘরে উটকো থাকি। মাসি থাকতে দেবে না। নাহলে আমিই নিয়ে যেতাম।'

অনুভা বিন্তি একযোগে, অপলকে তাকায় শঙ্করার দিকে। ওদের দৃষ্টিতে থাকে কাতরতা এবং তা স্পর্শ করে শঙ্করাকে। বিচলিত হয় সে। কিন্তু তবু অসম্মতি আর দ্বিধা জড়ানো থাকে তার কণ্ঠে—

—'কি বলতে চাইছ তোমরা সব? আমার ঘরেই খুব বেশী জায়গা দেখেছ নাকি? কিন্তু নিয়ে গেলেই তো হ'ল না। এই রোগা বুড়োমানুষটাকে কে দেখবে, কে এর সেবা যত্ন করবে?'

অনুভা বিন্তি সাগ্রহে সোচ্চার—'আমরা দেখাশোনা করব, তোমার কিছু ভাবতে হবে না শঙ্করাদা। তোমার তো কেউ নেই, মানুষটা যদি বেঁচে যায়, মা-মাসির মতো থাকবে তোমার কাছে বুড়ো মানুষটা।'

জ্বরতপ্ত, বেঁহুশ রমণীটির ভাঙাচোরা মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে শঙ্করা। অন্তর্গত এক মমতার স্রোত যেন ওকেও আপ্লুত করে। আত্মগত উচ্চারণে বলে — 'নে, তোরা যা ভালো বুঝিস্ ক'র। মানুষ তো আর ফেলা যায় না। মানুষই তো মানুষকে দেখে। নিয়ে চল, এক ব্যবস্থা হবেই।'

দ্রুত একটা রিকসা ডেকে আনে রতন। বৃদ্ধার যৎসামান্য বস্ত্রাদি, তেলচিট্‌চিটে জীর্ণ কাঁথা এবং বৃদ্ধাকে ধরাধরি ক'রে তোলা হ'ল রিকসায়। পিচের পাকা রাস্তাটুকু পার হবার পরই কর্দমাক্ত দীর্ঘ কাঁচা রাস্তা। নানাবিধ কৌশলে, সেই দুর্গম রাস্তা ওরা রিকসা নিয়ে অতিক্রান্ত হয়।

আসন্ন সন্ধ্যার সমাগম-লগ্নটি ঘিরে, শঙ্করার একক মনুষ্যের নিস্তব্ধ বাসগৃহটি নানা কণ্ঠস্বরে মন্দ্রিত থাকে। অসময়ে রিক্সারোহী আগন্তুক, সঙ্গে চালপার্টির লোকজন ইত্যাদি বিষয়গুলি কৌতূহলী করে আশ-পাশের কলোনী অঞ্চলের মানুষগুলিকে। তারাও এদের সহযাত্রী হয় কেউ কেউ এবং যাত্রাশেষে সমবেত হয় শঙ্করার বাড়ীতে। রিক্সা থেকে 'ভি আই পি'র মর্যাদায় বৃদ্ধাকে নামায় ওরা, বিছানা পেতে শোওয়ায় ঘরের মধ্যে।

পাড়ার একটি ছেলে সোৎসাহে কলোনীর একমেবাদ্বিতীয়ম্ ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে এলো। ডাক্তারবাবু এবং শঙ্করা, পারস্পরিক নামে পরিচিত। প্রত্যক্ষ-পরিচয়াদির কোনো পূর্ব-সুযোগ এতাবৎ ঘটেনি। তবে ডাক্তারবাবু কলোনী অঞ্চলের গরীব মানুষদের একমাত্র চিকিৎসক, সদাশয় পরোপকারী—এসব বৃত্তান্ত শঙ্করা সবিশেষ অবগত, ফ'লে ডাক্তারবাবু সম্পর্কে সমীহবোধ তাকে বিনম্র রাখে।

ডাক্তারবাবু সব বৃত্তান্ত শুনলেন এবং গম্ভীর মুখে, চশমার ফাঁকে তাকিয়ে রইলেন শঙ্করার দিকে। তির্যক দৃষ্টিটা ধরে রেখেই বললেন।

—'তা, হঠাৎ এভাবে রাস্তা থেকে রোগী কুড়িয়ে বাড়ীতে নিয়ে আসার অর্থ?'

শঙ্করা ডাক্তারবাবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মুখোমুখি নিরুত্তর থাকে বা এ-প্রশ্নের উত্তর-দান বাহুল্য মনে করে।

ডাক্তারবাবুর ওষ্ঠে বুঝি খেলে একটু স্মিত হাসি —

—'ও, বুঝেছি! সেবাধর্ম। তা'এসব সেবাধর্মের হ্যাপা সামলাতে পারবে তো বাপু শেষ পর্যন্ত?'

এবারও নিরুত্তর থাকে শঙ্করা।

অতঃপর ডাক্তারবাবু ভিড় সরিয়ে রোগীর কাছে যান। প্রয়োজনীয় পরীক্ষাদি সারেন সযত্নে। প্রেসক্রিপশন লেখেন। কাগজটা শঙ্করার হাতে দিয়ে বলেন — 'ওষুধগুলো এনে খাওয়াও। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর এসেছে। তবে ওষুধের সঙ্গে পথ্যটাও জরুরি মনে রেখো।'

শঙ্করা নিঃশব্দে ডাক্তারবাবুর ফি-এর টাকাটা বাড়িয়ে ধরে। পুনর্বার ডাক্তারবাবুর সেই তির্যক দৃষ্টি —

—'ওটা রেখে দাও হে ছোক্‌রা! তোমাদের সেবাধর্মে আমরও না হয় একটু ভাগ থাকল।'

শঙ্করার কণ্ঠে এবার জেদ — 'আজ আপনাকে এটা রাখতেই হবে ডাক্তারবাবু। তাছাড়া, আমার দেবার ক্ষমতা নেই, তা তো নয়।'

ক্ষণকাল নিরুত্তর ডাক্তারবাবু। তারপর বলেন—

—'দেবে বলছ! তা দাও।'

—টাকাটা পকেটে রাখেন। দু'পা এগিয়ে যান, ফিরে দাড়ান আবার — 'আর শোনো, দরকার পড়লেই আমাকে খবর দেবে।'

সংবাদ পেয়ে সন্ধ্যার মুখে আরো অনেকে সমবেত হয় শঙ্করার বাড়ীতে। প্রাত্যহিক রুজি-রোজগারের ধান্দাবাজি তো আছেই, কিন্তু এর মধ্যেই রোগীর সেবার ভার ওরা নিল কয়েকজন পালাক্রমে। অনুভা বিন্তি মালতী মানদা এবং আরো কেউ কেউ। এসব আলোচনাসূত্রে, বারবার উচ্চারিত হতে থাকল মৃতা লতার নামটি গভীর সন্তাপে। এ-রকম একটি পরিস্থিতিতে লতা যে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারত, একথা সবাই স্বীকার করল একবাক্যে।

কাজে বের হ'লে, প্রায় প্রতিদিনই, বাড়ী ফিরতে রাত্রি গভীর হয় বিন্তির। বাপ মেয়ের সংসারে, নিতান্ত উপায়হীনতায়, এটা এখন স্বীকৃত রেওযাজ। কাজে বের হবার আগে, দু'বেলার রান্নার পর্ব একসঙ্গে শেষ ক'রে রাখে বিন্তি। বাবার খাবার আলাদা ঢাকা দিয়ে রাখে। সময় এবং ইচ্ছা অনুযায়ী উমাপতি নিজেই খাবার গুছিয়ে খেয়ে নেন। রাত্রেব খাবারও, ডাক্তারের নির্দেশে, উমাপতিকে সন্ধ্যার মুখেই খেয়ে নিতে। বিগত কিছুদিনেব বোগভোগের পর, শরীর-স্বাস্থ্যের অধিকতর অবনতির ফলে, স্বাস্থ্যবিধি নন কবতে হচ্ছে কঠোব ভাবে। গভীব বাত্রে ঘরে ফিরে, খাওয়া সেরে, পরবর্তী সকালের প্রস্তুতি-পর্ব সমাধা ক'রে, শয্যায আশ্রয নেবার সুযোগ ঘটে বিন্তিব। এ-সময়ে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথাবার্তা হয না বাবাব সঙ্গে, কারণ, উমাপতি তখন শয্যাশায়ী, কিন্তু বিন্তি বোঝে, সে না শোযা পর্যন্ত বাবাব নিদ্রা আসেনা। এক অসহনীয় গুমোট, নিরুচ্চার বেদনা, আড়াল ক'রে রাখে বাপ ও মেয়েকে।

আজও রাত্রি বাড়ী ফিবে যথারীতি খাওযা এবং কাজকর্ম সমাধা ক'বে, বিন্তি এসে বসে উমাপতির শয্যাপার্শ্বে।

—'বাবা, ঘুমুলে?'

—'কে, বিন্তি? কিছু বলছিস?' — সাড়া দেন উমাপতি।

— 'জানো বাবা, আজ এক কাণ্ড হয়েছে।' — বিন্তির উচ্ছলতা স্পর্শ কবে উমাপতিকে। মশারীব মধ্যে উঠে বসেন তিনি।

—'আজ আমরা স্টেশন থেকে একজনকে তুলে নিয়ে এসেছি। স্টেশনে প'ড়ে থাকলে এতক্ষণে বোধহয় মরেই যেত। অবশ্য এখনো বাঁচবে কিনা সন্দেহ।'

— 'সে কি রে? কাকে তুলে এনেছিস?'

—'ঐ তো, তোমাদের বাঙাল দেশের লোক। স্টেশনে কদিন ধরে যে রিফিউজিরা ছিল, ওরাই বোধহয় ফেলে গেছে বুড়িটাকে। কি ধুম জ্বর গায়ে।'

মেয়ের কথায় উমাপতি কৌতুকে একটু হাসেন — 'আমাদের বাঙাল দেশ বলছিস — তোরা তবে কি? তোরা বুঝি বাঙাল নোস্?'

— 'কেন বাবা, আমরা বাঙাল হতে যাবো কেন? আমরা তো এই দেশের লোক—আমরা তো ঘটি।' — বিন্তির কণ্ঠে প্রসন্নতা।

— 'সে না হয় বুঝলাম, কিন্তু স্টেশন থেকে জানা নেই চেনা নেই, যাকে তাকে অমনি তুলে নিয়ে এলি?

—'জানা চেনা নাই বা থাকল, একটা মানুষ তো বটে। নিরাশ্রয়ে একটা মানুষ মারা যাবে তা তো হয় না।'

উমাপতি চুপ করে থাকেন কিছুক্ষণ, দীর্ঘশ্বাস মোচন করেন — 'পথে ঘাটে এমন কত মানুষ মারা গিয়েছে, আজও মারা যাচ্ছে, ক'জনকে বাঁচাবি তোরা? তা, এনে রাখলি কোথায়?'

—'আমরা সবাই মেয়েলোকটাকে শঙ্করাদার বাড়ী তুলে দিয়ে এসেছি। কথা হয়েছে, সবাই মিলে পালা করে সেবা-যত্ন করব আমরা। শঙ্করাদাও খুব করছে।'

উমাপতির কণ্ঠস্বর—ধীর, প্রগাঢ় — 'শঙ্করা ছেলেটাকে ঠিক বুঝতে পারি না। কেই-বা ওর মা বাবা, কি-ই বা ওর জাত-গোত্তর, কিছুই জানিনা। লোকে তো কত মন্দ কথা বলে ওর নামে। কেউ বলে গুণ্ডা, কেউ বলে ছিনতাইবাজ। তবে, যে যাই বলুক, ছেলেটার মনটা বড়ো ভালোরে। পরের জন্য ওর প্রাণটা বড়ো কাঁদে। এই যে তুই বাইরে বাইরে ঘুরিস, এতো রাত ক'রে বাড়ী ফিরিস, চিন্তা কি হয়না আমার! তবু, ভরসা আমার একটাই — শঙ্করা তোকে আগলে রাখে সব সময়। শঙ্করা সঙ্গে থাকলে তোর জন্য আমার আর কোনো ভয় থাকে না রে!'

আর কোনো কথা হয় না। সন্তর্পণে উঠে আসে বিন্তি। রাত্রির প্রগাঢ়তায় নামে শান্ত নৈঃশব্দ

।। চৌদ্দ ।।

একটি সাম্প্রতিক উটকো দুর্ভাবনা বড়ই বিমর্ষ রাখে নিবারণকে।

পরিস্থিতির প্রতিকূলতা নামক বিষয়টি সম্পর্কে সে অনভিজ্ঞ বা সংগ্রামে অদক্ষ এমত নয়। বরং তার এই পঞ্চান্ন বছরের জীবনের নানা পর্বে যখন নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে বারবার নাকানি-চোবানি খেতে হয়েছে, এবং সেই রুক্ষ, রক্তাক্ত দিনগুলোতে যখন মনে হয়েছে, আর কখনও সে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পারবে না, দারিদ্র্য এবং অসহায়তা তাকে একটি হেরো, বাতিল মানুষে পরিণত করবে, তখনো টিঁকে থাকার এক-বগ্গা জেদ, কঠোর পরিশ্রম এবং ব্যবসায়িকতার কৌশলীপনার মধ্যেও একধরনের সততাবোধে সে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে জীবন-সংগ্রামে।

বাজারে তার কারবার অধুনা শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত। চালের ব্যবসা এবং মুদিখানার অতি-সমৃদ্ধ ব্যবসার সঙ্গে আরো টুক্টাক্ পণ্য-দ্রব্যাদির লাভজনক ক্রয়-বিক্রয় তাকে বাজারে বেশ সমৃদ্ধ এবং এতদঞ্চলের ধনী ব্যক্তিদের অন্যতম ক'রে তুলেছে। ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে জীবন-যাত্রায় মসৃণতা এলেও নিবারণ তার পূর্বেকার পরিশ্রমী এবং সংযমী জীবন-যাত্রায় শৈথিল্য আনেনি। ফলে সার্বিক একটি পূর্ণতা বিরাজমান ছিল তার দেহ মনে।

তার এই মসৃণ জীবন-যাত্রায় অকস্মাৎ বিঘ্ন ঘটাল একটি উড়ো চিঠি।

কে বা কারা তাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছে ডাকযোগে, কুড়ি হাজার টাকার সংস্থান ক'রে রাখতে, এবং যে কোনো দিন টাকাটা সংগৃহীত হবে তার দোকান থেকে। বিষয়টি গোপন রাখতে হবে কঠোর ভাবে, পুলিশের সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগাযোগের চেষ্টাও ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে আনবে — এ জাতীয় সতর্ক বাণীও উল্লিখিত হয়েছে চিঠিটিতে।

স্বভাবত নিবারণ ধীর স্থির, এবং নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সে ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করতে চায়, কিন্তু পারেনা। কারণ এই সাতের দশকের অস্থির, টালমাটাল রাজনৈতিক পটভূমিকায় কিছুই যেন অবিশ্বাস্য বা অসম্ভব ছিলনা। নকশালী আন্দোলনের একটি প্রাথমিক-সৎ রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে সম্প্রতি নানা ঘোলাজল মিশে সৃষ্টি হয়েছে নানা আবিলতা এবং সেই ধোঁয়াশায় ক'রে ক'ম্মে খেতে উঠে পড়ে লেগেছে নানা অশুভ শক্তি। চতুর্দিকে যখন ভয়ের রাজত্ব এবং মানুষকে যেখানে ভয় পাইয়ে দেওয়া সহজসাধ্য, তখন তার ফায়দা লোটায় তৃতীয় বিশ্বের একটি অনুন্নত বেকার-সমস্যায়-দীর্ণ দেশে কালো হাত তো এগিয়ে আসবেই। ফলে নকশালী আদর্শের বিপ্লব ত্বরান্বিত না হ'লেও, তাকে কেন্দ্র ক'রে চোরাপথে মাথা চাড়া দিল নানা অশুভ শক্তি।

পারিপার্শ্বিক এইসব বিক্ষুব্ধ আবর্ত নিবারণের মতো সাধারণ অরাজনৈতিক মানুষকেও সংক্ষুব্ধ রাখে এবং আকস্মিক এই চিঠিটি দেশব্যাপ্ত সাধারণ উদ্বেগকে রূপান্তরিত করে ব্যক্তিগত উদ্বেগে। একটি বিভীষিকার ছায়া যেন নিরন্তর অনুসরণ করে তাকে। আক্রমণটা কোথা থেকে কিভাবে আসবে, কোথা থেকে সে এককালীন কুড়ি হাজার টাকা যোগাড় করবে, টাকাটা যোগাড় করলেও এভাবে কষ্টার্জিত টাকাগুলোকে সে কেন বেহাত করতে যাবে, এ সঙ্কটে পুলিশের বা অন্য কোনো নিরাপত্তার আশ্রয় নেওয়া উচিত কিনা, এসব চিন্তা তাকে বিচলিত রাখে।

ব্যাপারটাকে গুরুত্বহীন বলে বিবেচনা করতেও ভরসা পায়না নিবারণ।

সপ্তাহ দুয়েক আগে হাবড়া বাজারে একটি অবাঙালীর দোকানে আকস্মিক হানা দিয়ে কয়েকজন সশস্ত্র যুবক লুঠপাট করেছে বেশ কয়েক হাজার টাকা। ব্যাপারটা ঘটেছে প্রকাশ্য দিবালোকে এবং বিবিধ মারাত্মক শস্ত্রধারী আততায়ী যুবকদের সামনে কোনো প্রতিবোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি বাজারের লোকজন। সুদখোর মহাজনদের অবৈধ অর্থ-লালসাকে প্রতিহত করতে যে বলিষ্ঠ রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন জেহাদের সূত্রপাত হয়েছিল ছয়ের দশকের শেষে, তা এখন এইভাবে, ক্ষেত্র বিশেষে, পরিণত হয়েছে ব্যক্তিগত গুণ্ডামীতে।

বেকার-সমস্যা-পীড়িত এ-যুগের আর একটি চিত্রও সাম্প্রতিক একটি ঘটনায় বড়ই দৃশ্যমান। এবং এসব ঘটনাদি অবশ্যই অধিকতর উদ্‌ভ্রান্ত রাখে নিবারণকে।

দিনটি ছিল মাসের ১লা তারিখ। বর্ষাকালের মেঘলা আকাশ। তারপরে লোডশেডিং। সন্ধ্যাতেই অন্ধকারের ঘোর। এ লাইনেরই কোনো একটি জনবহুল এলাকার স্টেশনের প্লাটফর্মে এসে ট্রেন থামল। মাসের ১লা তারিখের সুবাদে অফিস-বাবুদের বেতন-প্রাপ্তিতে পকেটে টাকার ভার। এমত সময়ে মিনিট পনেরো কুড়ির একটি সফল অপরেশন সমাপ্ত হ'ল। জনা পনেরোর একটি রাগী যুবকের দল, ট্রেন থেকে নামতেই অফিস-বাবুদের গলার কাছে ডান হাতে বাড়িয়ে ধরল তীক্ষ্ণ ছুরির ফলা, আর বাঁ হাতে ফর্সা করে দিল পকেটস্থ যাবতীয় মালকড়ি। এবং অপারেশনটি সম্পন্ন হতেই চকিতে অন্ধকারে তাদের অন্তর্ধান। তারপরেই মাসকাবারী মাইনে-হারানো সর্বস্বান্ত রিক্ত অফিস বাবুদের মর্মান্তিক হা-হুতাশ, অভিসম্পাত।

ঘটনাটিকে কেন্দ্র ক'রে প্রচারিত হল নানা জাতীয় চুটকিও। এক রাগী যুবক নাকি সন্ধ্যার সেই আধো-অন্ধকারে এক প্রৌঢ় অফিস-বাবুর গলার কাছে ছুরি চেপে ধ'রে পকেটের টাকা তুলতে গিয়ে সরে গিয়েছিল ঝটিতি, পার্শ্ববর্তী এক বন্ধুকে বলেছিল চাপা উৎকণ্ঠায়—'ওটা আমার বাবা মাইরি, ও অপারেশনটা তুই কর।'— বলা বাহুল্য, উপযুক্ত পুত্রের উপযুক্ত বন্ধুটি অপারেশনটি সাঙ্গ করেছিল নির্বিঘ্নেই।—

এ জাতীয় বিচিত্র বিচিত্র ঘটনা আবহাওয়ায় নিয়ত এখন শঙ্কা এবং ত্রাসের বার্তা ছড়ায় এবং তপ্ত রাখে আবহাওয়াকে। ফলে উক্ত বেনামী চিঠিটিতে সবিশেষ উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তা বোধ করে নিবারণ।

বিষয়টি সম্পর্কে যথোচিত বুদ্ধিপরামর্শদাতারও অভাব বোধ করে নিবারণ।

গৃহিনীটি নিতান্তই গৃহবাসী, সাংসারিক কূটকচাল এবং গৃহকর্মাদির সঙ্কীর্ণতার বাইরে মাথা খেলে না তার। তিনটি কন্যার একটি পাত্রস্থ হয়েছে, অবশিষ্ট দুটিও বিবাহযোগ্যা। তাদের একটি নিজস্ব জগৎ। পুত্র পলাশ সম্পর্কে নিবারণ সম্পূর্ণ আস্থাহীন। অন্ন এবং অর্থসংগ্রহের বাইরে বাড়ীর সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিন্ন। নিবারণের অনুপস্থিতিতে মাঝে মাঝে দোকানের ক্যাশবাক্স

থেকে টাকা হাতিয়ে নিত, অধুনা বন্ধ হয়েছে সেটা। পলাশের নানাবিধ কুকর্মের নালিশ তাকে প্রায়ই শুনতে হয় এবং পুত্রটি যে তার শাসন-সীমার আয়ত্তের বাইরে, একথা নিবারণকে সবিনয়ে স্বীকার করতে হয় অভিযোগকারীর কাছে। ইদানীং একটি রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় পলাশ যথেষ্ট পুষ্ট। রাজনৈতিক ক্ষমতার মদতে অর্থাগম এবং ক্ষমতা-প্রদর্শনের নানা পথও সুগম, ফলে তার যথেচ্ছাচার মাত্রাহীন হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। সুতরাং এমন কোন অন্তরঙ্গ আপনজন পায়না নিবারণ, সমস্যা উত্তরেণর জন্য যার কাছে একটি নির্ভরযোগ্য সুপরামর্শের অপেক্ষা করতে পারে।

এ বিপত্তিকালে, সম্ভাব্য সর্বস্থানেই আশাহীনতায় হতোদ্যম, নিবারণ আকস্মিক বড়ই ভরসাস্থল বলে বিবেচনা করে শঙ্করাকে। শঙ্করা কি তার সাহায্য বা বুদ্ধি-বিবেচনা নিয়ে এগিয়ে আসবে না তার পাশে, যদি সে প্রার্থীর মতো হাত জোড় করে তার কাছে? শঙ্করা যে-কয়েক বছর তার বাড়ীতে আশ্রিত ছিল, যথেষ্ট লাঞ্ছনা এবং অবহেলা জুটেছে তার কপালে। কিন্তু সেগুলো যে অধিকাংশই তার পরিবারিকতার সূত্রে, এবং নিবারণ যে কখনই শঙ্করার প্রতি অপ্রসন্ন নয়, কোনো বিরূপতা প্রকাশ পায়নি তার আচরণে, বরং সময়ে-অসময়ে তাকে সাহায্য করেছে, তার চালের চোরাচালানের ব্যবসায়ে ধার-দেনার ব্যবস্থা করেছে এসব কথা কি একেবারেই ভুলে যাবে শঙ্করা? সম্ভবত না।

শঙ্করা সম্পর্কিত নানাবিধ অভিজ্ঞতা এ মুহূর্তে নিবারণকে এটুকু ধারণায় অন্ততঃ স্থিত করে, শঙ্করা কাপুরুষ নয় এবং তার বলবীর্য বুদ্ধিমত্তা নিয়ে এহেন বিপদকালে নিবারণের পাশে না দাঁড়ানোর মতো অকৃতজ্ঞ নয়।

সন্ধ্যের মুখে শঙ্করা দোকানে এল। এবং ভাগ্যক্রমে, তখন সে ছিল সঙ্গীহীন। অন্তর্গত উদ্বেগ দুশ্চিন্তাকে কোনো প্রকার চাপা দেবার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থেকে নিবারণ বলল—'তোর সঙ্গে একটা বিশেষ কথা ছিল বাবা শঙ্করা—।'

দাস মশায়ের সহজ আন্তরিকতা এবং স্নেহমিশ্রিত নৈকট্যবোধের অভিব্যক্তি ছাড়াও তার কণ্ঠস্বরে যে ভিন্ন কিছুর অস্তিত্ব বর্তমান, সেটা অনুভব করল শঙ্করা এবং অবস্থার গুরুত্ব অনুমান করল—

—'কি হয়েছে দাসমশায়, আপনাকে এমন মনমরা লাগছে কেন?'

শঙ্করাকে জড়িয়ে ধ'রে নিবারণ তাকে নিয়ে যায় গদিঘরের কোণে, খদ্দের-সাধারণের দৃষ্টির কিছু আড়ালে, নিরালা নিভৃতে। সন্তর্পণে চিঠিটা পকেট থেকে শঙ্করার হাতে তুলে দিতে গিয়ে স্মরণে আসে, শঙ্করা অক্ষয়-পরিচয় হীন। ধীরে ধীরে চিঠিটা আবার পকেটস্থ করে, ঢোঁক গেলে বারকয়েক, বলে— 'বড়ই বিপদে পড়েছি বাবা শঙ্করা। একটা ব্যবস্থা তোর করতেই হবে।'

—'শুধু শুধু উতলা হচ্ছেন কেন দাসমশায়, বিপদটা কি সেটা আগে বলুন। ব্যবস্থা তো সেই বুঝেই করতে হবে।' অতঃপর নিবারণ ধীরে ধীরে, কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নিম্নগ্রামে রেখে, প্রাসঙ্গিক ঘটনাটা বিবৃত করে এবং পকেট থেকে চিঠিটা বের ক'রে বলে—'এই দেখ্ চিঠিটা। এখন উপায় কি করি বল্?'

নিবারণের হাত থেকে চিঠিটা তুলে দেখার কোনো আগ্রহ দেখায় না শঙ্করা, শুধু অপলকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। চিন্তা করে। একবার ভাবে, ব্যাপারটাকে তুড়ি মেরে, হালকাভাবে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু মনে জোর পায় না। পকেট থেকে বিড়ি বার করে। দেশলাই জ্বেলে বিড়িটা ধরায়।—

—'ব্যাপারটা সত্যিই একটু ভাববার দাসমশায়। দিনকাল তো ভালো যাচ্ছে না। সাবধানে থাকতে হবে। তবে, আপনি ভয় পাবেন না। আমি তো নজর রাখবই, দলেরও সবাইকে বলে রাখব। আর, দোকানের ক্যাশবাক্সে খুব বেশী টাকাকড়ি রাখবেন না। দেখা যাক কি হয়।'

—'পুলিশে খবর দেবো?'

—'পুলিশে খবর দিয়ে কি হবে? পুলিশ আপনাকে কতক্ষণ বাঁচাবে? উল্টে নানান ঝামেলায় পড়তে হবে আপনাকে। বরং চুপচাপ থেকে অবস্থা কোন্ দিকে যায়, তাই দেখেন।'

শঙ্করার কথায় নিবারণের মনে ভরসার সঞ্চার হ'ল এমত বোধ হল' না কিন্তু আবিরত এক অনিশ্চিত ভয়েও যেহেতু কাঁটা হয়ে থাকা অর্থহীন, এবং প্রতিরোধের বিকল্প কোনো পন্থাও যেখানে অনায়ত্ত, সেখানে ধৈর্যশীল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি।

এবং এমত সময়-সীমায় সূক্ষ্ম কুয়াশার মতো এক অভিমান নিবারণের মনে বড়ই দাগা সৃষ্টি করে। অভিমানের কেন্দ্র-বিন্দু অবশ্যই তার যুবক-পুত্র পলাশ। জীবন-ধর্মের রীতি অনুযায়ী মানুষ পরিণত বয়সে তার যুবা বয়সের প্রতিরূপ যুবক-পুত্রের প্রতি নির্ভরশীল হতে ভালবাসে এবং এ নির্ভরতায় আনন্দ এবং আবশ্যকতা উভয়েরই গুরুত্ব তুল্যমূল্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রটিতে নিবারণের দগ্ধ-ভাগ্য সর্বজনে বিদিত। পলাশ এখন যথেষ্ট সাবালক এক পরিণত যুবক, একটি রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় কিছু-কিঞ্চিৎ ক্ষমতারও অধিকারী ব'লে জানে নিবারণ, কিন্তু 'বাপের ভোগে কিছুই লাগে না'— এসব ভেবে বয়োধর্মে অধুনা কিছু বিমর্ষ এবং দুর্বলবোধ করে নিবারণ। এ জাতীয় একটি উত্তেজক বিপত্তিকালে সক্ষম পুত্রের প্রসারিত হাতের সাহায্য তাকে কতখানি নিরাপত্তা জোগাতো, এ-সব হিসেব তাব মস্তিষ্কে বিহ্বলতা আনে।

ইতিমধ্যে বঙ্গভূমিতে দুর্গোৎসবের আগমন ঘটল। তার রেশ লাগল এ-অঞ্চলটিতেও।

ময়লাটে মেঘের বিস্তাব অপসৃত ক'রে নীল আকাশে শুভ্র মেঘখণ্ডের অবাধ বিচরণ, নদীকূলে কাশফুলের মনোরম উদ্ভাস, ভোরবেলায় ঐতিহ্যমণ্ডিত শিউলিফুলের স্নিগ্ধ প্রসন্নতা প্রভৃতি রুটিনমাফিক ব্যাপার যথারীতি সম্পন্ন হতে লাগল।

বেকার বঙ্গ-যুবকদের বারোয়ারী পুজোর চাঁদার বই হাতে বাড়ী বাড়ী চাঁদা আদায়ের জন্য ঘোরাঘুরি, কখনো সদম্ভ, কখনো বিনীত ভঙ্গি, অর্থাৎ যেখানে যেমন সেখানে তেমন ব্যবস্থা এবং মূলত চাঁদার বইয়ে একটি শাঁসালো অঙ্ক বসানো,— ইত্যাদি পরিচিত পর্বও অনুষ্ঠিত হতে লাগল পালাক্রমে।

পুজোকে কেন্দ্র ক'রে ছোটখাটো হাঙামা-হুজ্জোত হলেও সামগ্রিক জন-জীবনে বিষয়টি যথেষ্ট উত্তেজক এবং আনন্দদায়কও বটে। উৎসবে আনন্দে, প্রিয়জনের মিলনে, মাইক বাজির প্রমত্ত কোলাহলে, হৈহুল্লোড়ে কয়েকটা দিন মন্দ কাটে না। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা, প্যান্‌পেনে একঘেয়েমির মধ্যে ভিন্নধর্মী এক ব্যাপকতা আর বৈচিত্র্য। সুতরাং দুর্গাপুজোর উৎসবাদি সব মিলিয়ে বেশ রোমাঞ্চকর।

এ-পর্বটি শেষ হতে না হতেই কালী-পুজোর বাজনা বাজে নতুন উদ্যমে। সেখানেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। মাইকবাজি, আলোর রোশনাই আর বাজি-পটকার শব্দাবলীতে প্রমত্ত মা-কালীর অনুপম ভক্তবৃন্দ-মোড়ে মোড়ে, পুজোর প্যাণ্ডেলে বড়ই ভক্তিযুক্ত থাকে।

কিন্তু এতদঞ্চলে শারদীয় হুল্লোড় শেষ হতেই আসন্ন কালীপুজো বা দেওয়ালী উৎসবকে সম্মুখবর্তী রেখে এক নতুনতর খেল্ জমাটি হবার আয়োজন শুরু হ'ল।

বিষয়টি হ'ল, হিন্দি চলচ্চিত্র-সঙ্গীত জগতের স্বনামধন্য এক সঙ্গীত-শিল্পীর নামে চিহ্নিত একটি 'অমুক নাইট' —গানের জলসার ব্যাপক প্রস্তুতি। স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা হীরুবাবুর প্রচ্ছন্ন মদত বিষয়টির উজ্জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিল। যেহেতু যুবশক্তিকে সংঘবদ্ধ রাখতে এবং তাদের মনে উত্তেজনার রসদ জোগাতে এ-জাতীয় বিনোদনের আবশ্যকতা অপরিহার্য

ব'লে বিবেচিত, সেহেতু যুব-মানসে নিজের নেতৃত্বের ইমেজটিকে সুপ্রকট রাখতে এবং স্থায়ীত্ব দিতে 'অমুক নাইট' নামক খেলটিতে যথেষ্ট প্রেরণা দিতে লাগলেন হীরুবাবু। সারারাত্রব্যাপী অনুষ্ঠান। বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পীদের শুভাগমন ঘটাতে হবে এবং নিশ্চিতই ব্যাপারটি সমধিক ব্যয়-সাপেক্ষ। হীরুবাবু ক্ষমতাসীন দলের বিশিষ্ট ব্যক্তি, সুতরাং রাজনৈতিক প্রভাবে সংস্কৃতির বাতাবরণ উন্নত করতে অর্থ-সমাগমের কয়েকটি নিশ্চিত এবং নির্ভরযোগ্য উৎস তো আছেই, এছাড়াও স্থানীয় সংগ্রহের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হ'ল যথেষ্ট।

ঢাউস ঢাউস সব চাঁদার বই মুদ্রিত হ'ল এবং সেগুলি নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে উঠল উৎসাহী সমর্থ যুবা-বৃন্দ।

এ-বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিল পলাশচন্দ্র।

এতদঞ্চলের এমন একটি রোমহর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এর সবিশেষ সাফল্যের উপর অবশ্যই তাদের মান-ইজ্জত নির্ভরশীল, এমত ধারণায় স্থানীয় এবং বহিরাগত বেশ কিছু চেলা-চামুণ্ডা নিয়ে উগ্র সকর্মক ভূমিকায় উদ্দীপিত হ'ল পলাশ।

সম্মতি অসম্মতির ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে বাজার, বড় রাস্তার দু পাশের বিভিন্ন দোকান, এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে ধরিয়ে দেওয়া হতে লাগল মোটা টাকার চাঁদার রসিদ। এবং যাবতীয় ওজর-আপত্তিকে অগ্রাহ্য ক'রে সেগুলি সংগৃহীত হতে লাগল অব্যাহত ভাবে। সংস্কৃতি-চর্চার এই প্রবল উদ্দীপনায় স্থানীয় জন-জীবনে উদ্বেগ এবং উত্তেজনা দানা বাঁধে।

হেমন্তের অলস দুপুর। স্টেশনের প্লাটফর্ম এলাকাটি এখন সকাল সন্ধ্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত জনহীন। ইতস্ততঃ দু'চারজন যাত্রী বা যাত্রিণী পরবর্তী ট্রেনের জন্য অপেক্ষমাণ। স্টেশনে শেডের তলায় যথারীতি চালের বস্তা সমেত চাল-পাচারের ছোট একটি দল। কিন্তু এ দলটির পারিপার্শ্বিকতা স্পষ্টতই কিছু ভিন্নমাত্রিক। দলে কয়েকজন প্রৌঢ়া এবং দুটি উচ্ছলা তরুণী। এবং তাদের মাঝখানে স্বয়ং পলাশচন্দ্র এবং তার গুটিকয়েক সাঙ্গোপাঙ্গ। হাতে তাদের জলসার চাঁদার বই।

একজন প্রৌঢ়ার কণ্ঠে অক্ষম ক্ষোভ—'দ্যাখো বাবারা, আমাদের খাওয়া-পরা দেবার কেউ নেই। নিজেরা কষ্ট ক'রে কয়ডা'চাল নিয়ে কলকাতায় যাই। তাতে দুডো পয়সা হয়। কোনো মতে পেট চালাই। তা তোমরা যদি এই ভাবে চাঁদার জন্যি জুলুম করো, আমরা বাঁচি কি ক'রে?'

পলাশ কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে, নায়কোচিত ভঙ্গীতে বলে— 'সে কি মাসি, গরমেন্টকে ফাঁকি দিয়ে এত এত যে চাল নিয়ে চালান দিচ্ছ, পয়সা তো ভালই কামাচ্ছ, তা জনগণের সেবায় কিছু দান না করলে বেওসা যে তোমার লাটে তুলে দেব মাসি!'

পলাশের এক শাগরেদ ফোড়ন কাটে—'আরে বেশী তো চাইছি না মাসি, প্রতি খেপে বস্তায় দু'টাকা ক'রে, —বলো দেখি আমার চাঁদু মাসি, এটা কি বেশী হ'ল?' —ব'লেই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি চাঁটি মারে প্রৌঢ়ার মাথায়।

অপমানিতা প্রৌঢ়াটি চালের বস্তার পাশে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। সঙ্গের তরুণী দুটি কিন্তু উচ্ছলা, পলাশচন্দ্র এবং তার লক্কা-পায়রা শাগরেদদের সঙ্গে হাসা-পরিহাসে তাদের প্রগল্ভ, কৌতুকময়ী রাখে।

তাদের একজন আঁচল খুলে দুটো টাকা দেয় পলাশের হাতে এবং ভ্রূ-ধনুতে তির্যক কটাক্ষ হেনে বলে—'টাকা নিচ্ছ নাও পলাশদা, জলসার দিনে কিন্তু আমাকে ভাল সিটে বসার ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে।'

কলকাতায় যাবার গাড়ীর সিগন্যাল হয়েছে। গেট পড়ছে লেভেল ক্রসিংয়ের। অনতি পরেই ট্রেন আসবে। ইতস্ততঃ যাত্রীদের মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যস্ততা।

বিশাল একটা চালের বস্তা কাঁখে তুলে, টান টান আঁচলে শরীর পেঁচিয়ে, দ্রুত প্লাটফর্মে উঠে আসে বিন্তি। আজ একেবারেই সঙ্গীহীন সে। দলের আর সবাই সম্ভবত আগের ট্রেনে চাল নিয়ে চলে গেছে কলকাতায়। লোকজন বাঁচিয়ে যথাসম্ভব দ্রুত বিন্তি প্লাটফর্মের সম্মুখবর্তী দিকটায় ছুটবার চেষ্টা করে।

শেডের তলা থেকে আকস্মিক কয়েকজোড়া চোখ ওকে দ্রুত লক্ষ করে, ওর একাকীত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দিহান হয়, এবং উচ্চকিত হয় একটি লোভার্ত কণ্ঠস্বর

— 'এই যে বিন্তিদেবী, ওদিকে নয়, এদিকে। তোমার চাঁদার টাকাটা দিযে তবে গাড়ীতে উঠবে।'

চম্‌কে ফিরে তাকায় বিন্তি। ওপাশে পলাশ এবং তাব দলবল বন্যপ্রাণী-সুলভ-লোলুপতোয় দাঁত বের ক'রে হাসছে। দলছুট্ একাকীত্বে হঠাৎ বড়ো অসহায় মনে হয় নিজেকে বিন্তির।

একটি ছেলে এগিয়ে আসে—'দিয়ে দাও মাইরি দুটো টাকা। বস্তা প্রতি দু'টাকা বেট্।'

—'কিসের টাকা?'— দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ কবে বিন্তি।

এবার এগিয়ে আসে পলাশ

—'তাও জানো না বিন্তিদেবী। এত বড়ো ফাংশান কবছি আমরা, আব তুমি কিছুই জানোনা! কোন্ গগনে থাকো তুমি দেবী? তা, তুমি থাকোগে যে চুলোয়, আমাদের টাকা পেলেই হ'ল। প্রতি খেপে বস্তা প্রতি দু'টাকা না দিলে কাউকে আমরা গাড়ীতে চাল তুলতে দেবনা। আব এ টাকার রসিদ কাটতে গেলে আমাদের মজুবি পোষাবে না, তাও বলে রাখছি।'

পূর্বোক্ত প্রৌঢ়াটি হাউমাউ করে — 'দ্যাখ্ না মা বিন্তি, এ কোন্ দেশী জুলুম। বলে, চালের বস্তা তুললেই দু'টাকা দিতে হবে। তার আবার রসিদও নেই।'

পশ্চাদ্‌বর্তী স্টেশন অতিক্রম ক'রে ট্রেন ক্রমশঃ দৃশ্যমান হয়। এখনই প্রবেশ কববে প্লাটফর্মে।

চালের বস্তা কাঁকালে সজোরে চেপে রেখে সামনে অগ্রসর হবার জন্য পা বাড়ায় বিন্তি। দ্রুত সামনে ঘুরে আসে পলাশ। বস্তায় বেড় দেওয়া বিন্তির হাতটা চেপে ধবে সজোরে

—'উহুঁ, ওটি হচ্ছেনা, আগে টাকা ফ্যালো, তাবপবে চাল নিয়ে ট্রেনে উঠবে।'

অপমান লাঞ্ছনা আর অসহায় একাকীত্বে বড়ই বিপন্ন বোধ করে বিন্তি। কিন্তু যুগপৎ এক দুর্জয় ক্রোধ ওকে দুঃসাহসী আর বেপরোয়া ক'রে তোলে। দ্রুত পাশ ফিবেই চালের বস্তাটাকে ঢালের মতো বাগিয়ে ধ'রে সজোরে ধাক্কা মারে পলাশকে। অকস্মিক আক্রমণেব এই প্রবল ধাক্কার জন্য তৈরি ছিলনা পলাশ। সটান হুমড়ি খেয়ে লুণ্ঠিত হয প্লাটফর্মেব উপব। পলাশেব শাগরেদগুলো ঝটিতি বেষ্টন ক'রে ফেলে বিন্তিকে।

ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ায় পলাশ। চোট লেগেছে কনুইয়ে। সেটা অবশ্যই একটা যন্ত্রণাদায়ক শারীরিক ব্যাপার! কিন্তু প্লাটফর্ম-ভর্তি ভদ্র এবং ভদ্রেতব জনগণেব সামনে তাব মতো প্রবল পবাক্রমশালী পুরুষের এ-হেন হেনস্তা, বড়ই মর্মপীড়াদায়ক হ'ল।

কিন্তু তবু সেটাকে হজম ক'রে ঘোষণা করে পলাশ —'ছেড়ে দে ওটাকে আজ। পাবি তো বদলা নেব।

সশব্দে ট্রেন প্রবেশ করে প্লাটফর্মে। লাঞ্ছনা আর চালেব বস্তার দুর্বহ ভার শরীরে [illegible] ট্রেনের কামরায দ্রুত উঠে যায় বিন্তি।

।। পনেরো ।।

উট্‌কো এই ঝামেলাটা এখন পূর্ণমাত্রায় বর্তেছে শঙ্করার মাথায়। বিন্তি অনুভা মালতী রতন ইত্যাদি ওর আত্মবর্তী মানুষগুলো অবশ্যই প্রাথমিকভাবে ওর মাথায় এ ঝামেলাটা ন্যস্ত করেছে, এবং নিতান্ত অনিচ্ছা থাকলে কয়েক দিন বাদেই শঙ্করা এটাকে উৎখাত করে দিতে পারত নির্বিবাদে, এতেও নিশ্চিত কোনো সংশয় নেই। কিন্তু কি এক অনির্দেশ্য কারণে শঙ্করা ঝামেলাটাকে উৎখাত করেনা, বরং ঘটনাগতির সঙ্গে তাল রেখে কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো বা নিজ অগোচরে ব্যাপারটার সঙ্গে সাঙ্গীভূত হয়ে পড়ে।

ঝামেলাটার কেন্দ্রমূলে অবশ্যই রেল স্টেশন থেকে সংগৃহীত সেই বুড়িটি, শঙ্করার সঙ্গোপাঙ্গরা অসুস্থ অবস্থায় যাকে তুলে এনে শঙ্করার বাড়ীতে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। বিন্তি অনুভা মালতীরা এসে বুড়ির দেখাশোনা, সেবা যত্ন করেছে পালাক্রমে। ওষুধপত্র, বিশেষতঃ নিয়মিত পুষ্টিকর পথ্য এবং আহার্যের প্রভাবে বুড়ি সেই মুমর্ষু অবস্থাটি বেশ কাটিয়ে উঠেছে এবং শরীরে এখন বলাধানও হয়েছে কিঞ্চিৎ।

কিন্তু সুস্থসজুত হয়ে উঠলে বুড়িকে তার পূর্বাস্থানে, অর্থাৎ রেল-স্টেশনে বা অন্যত্র কোথাও স্থানান্তরিত ক'রে ঝামেলা চুকোনোর যে পরিকল্পনাটা ছিল শঙ্করার, সেটা আর কার্যকরী করা হয়ে ওঠেনি। বরং, এক ভিন্নতর জীবনের স্বাদ ক্রমশ যেন কি এক নিগূঢ় মায়ায় মাখামাখি হয়ে আবিষ্ট করছিল শঙ্করাকে। শঙ্করার স্বজনহীন, মায়া-মমতার স্পর্শ-বঞ্চিত জীবনে হঠাৎ-আবির্ভূত, অবাঞ্ছিত বুড়িটি ক্রমশঃ যেন কিছুটা স্থান অধিকার করে নিতে থাকে। কোনো বন্ধন যাকে কখনো বাঁধেনা, সেই শঙ্করা কেন যেন বাঁধা পড়তে থাকে এই মায়ার নিগড়টুকুতে। ফলে বুড়িকে এখান থেকে স্থানান্তরিত করার দিন-ক্ষণও বিলম্বিত হতে থাকে।

এবং বুড়ির সঙ্গে ক্রমশঃ যেন শঙ্করার এক মান-অভিমান, লুকোচুরির খেলা শুরু হয়। শঙ্করার প্রাত্যহিক কাজকর্মে অবশ্য কোনো ব্যতিক্রম নেই। প্রতিদিন ভোরে বেরিয়ে যাওয়া, দিন ভর চালের চোরাচালানি; গভীর রাতে ঘরে ফিরে আসা, —এসব প্রাত্যহিক রুটিনের নিয়মানুবর্তিতায় কোনো ছেদ নেই। তবে বুড়ির তদারকিতে কিছু শ্রী ফিরেছে শঙ্করার ঘর-দোরে। শঙ্করার অনুপস্থিতিকালে বুড়ি সারাদিন টুকুর টুকুর ক'রে ঘর দোরের মালিন্য আবর্জনা সরিয়ে, লেপে-পুছে বেশ ভদ্রস্থ করেছে ঘরটিকে।

স্বভাব-বাউণ্ডুলে শঙ্করার চোখেও ধরা পড়ে ঘর-বাড়ীর এ পরিবর্তনটুকু।

মনের অভ্যন্তরে আপ্লুত, বিগলিত হয়।

তবু তেরিয়া মেজাজে হয়ত কখনো বুড়িকে বলে—'এই যে, ও বুড়ি, এসব হচ্ছে কি? সারাদিন এইরকম খেটে-খুটে যদি আবার জ্বর বাধাও, দেখবেটা কে শুনি?'

বুড়ির চোখে মুখে কেমন এক সঙ্কোচ, সন্ত্রাস। বিহ্বল তাকিয়ে থাকে' সে দৃষ্টি বিচলিত করে শঙ্করাকে। কিন্তু কণ্ঠস্বরের রূঢ়তা থাকে অটুট

—'এবার জ্বর-ফর বাধালে কিন্তু ভালো হবে না বলছি।'

শঙ্করার গৃহস্থালী জীবনেও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। অতি ভোরে ঘুম থেকে ওঠা, প্রাতঃকৃত্য সেরে চা জলখাবার বানানো, দু'বেলার রান্নাবান্না — সবই এতদিন সমাধা করতে হ'ত তার একক, আত্মকৃত তত্ত্বাবধানে। বিরক্তিকর, একঘেয়ে কাজ, কিন্তু তা ছিল অপরিহার্য।

বুড়ি কখন্ যেন এসব দায়িত্ব তুলে নিয়েছে নিজের মাথায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে ঝাঁট দেয় ঘর দোরে, শঙ্করার চা-জল খাবার বানায়, রান্না চাপায়, এবং নিতান্ত সঙ্কোচে, সন্তর্পণে ভাত বেড়ে খাওয়ায় শঙ্করাকে। অনাত্মীয় এই আশ্রয়টুকু তার কাছে যেন অলীকবৎ প্রতীত হয়।

আজন্ম অনভ্যাসের এ-জাতীয় জীবন-ধারায় শঙ্করাও প্রথমে অস্বচ্ছন্দ, এবং পরে ধীরে ধীরে অভ্যাস অর্জন করে। ফলতঃ এ-ধরনের জীবন-যাত্রার স্বাদ তাকে যেন একটি সুখী, মমতাময় গৃহী-জীবনের হাতছানি দেয়।

কাজে বেরোনোর মুখে বুড়ি হয়ত সসঙ্কোচে বলে—'ঘরে তরকারি কিছু নেই, কিছু তরি-তরকারি এনো।'

শঙ্করা দাব্‌ড়ানি লাগায়— 'ও বুড়ি, খুব নোলা হয়েছে তোমার, তাই না?'

কিন্তু গভীর রাতে শঙ্করা যখন ঘরে ফেরে, তার হাতে থাকে নতুন শীতের আনাজপাতিভরা থলি। পরের দিনে সেগুলি বুড়ির হাতে স্বাদু ব্যঞ্জনে পরিণত হয়, বাটি ভ'রে যার অধিকাংশটুকু বুড়ি এগিয়ে দেয় শঙ্করার থালার পাশে। শঙ্করা চেটে-পুটে খায় এবং তৃপ্তিতে ঢেকুর তুলে বলে——'ও বুড়ি, তোমার জন্য রেখেছ তো, পেট ভরে না খেলে কিন্তু গায়ে বল পাবে না!'

বুড়ির মুখে কোনো কথা নেই। শুধু ভাঙাচোরা মুখে, ঠোঁটের কোণে বুঝিবা এক চিলতে হাসির আভাস — এক পাশে মাথা হেলিয়ে যেন শুধু জানায় — এখানকার এ অন্ন তার পরমান্ন।

মাঝে মাঝে আকস্মিক এক বিপর্যয়ের ঘোর বেহাল করে বুড়িকে। তার শান্ত সহিষ্ণু নম্রতায় তখন যেন উচ্চণ্ড এক ক্ষ্যাপামি এবং তা তার আচরণকে অনিয়ন্ত্রিত করে। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, যুগপৎ হিংস্রতা এবং ভীতি যেন খেলা করে সেখানে। গৃহস্থালীতে মন থাকে না, বিহ্বল বসে থাকে অন্যমনে। গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম করলেও, নিজস্ব প্রয়োজন অপ্রয়োজনে সে হয়ে ওঠে চরম উদাসীন এবং খাওয়া-দাওয়া একদম বন্ধ।

শঙ্করা দু' একদিন ব্যাপারটা লক্ষ ক'রে তলব লাগায় — 'ও বুড়ি, ভাত খাচ্ছ না কেন?'

বুড়ির দু' চোখে অসংবদ্ধ দৃষ্টি, বিহ্বল তাকিয়ে থাকে অন্য দিকে।

—'দ্যাখো বুড়ি, এ-রকম করলে তোমাকে কিন্তু আবার স্টেশনে নিয়ে ফেলে রেখে আসব।' —শঙ্করা ধমক লাগায়।

অন্তর্গূঢ় এক চাপা বিক্ষোভ অকস্মাৎ বুড়িকে যেন অসহিষ্ণু করে। তার মুখে উচ্চারিত হয় অসম্বদ্ধ প্রলাপের মত এক হতাশোক্তি —'ফেলে আয়, তোরা আমাবে স্টেশনে ফেলে আয়, ক্যানো থাকব তোর কাছে, তুই আমার কেডা?'

বুড়ির আচরণের সামঞ্জস্যহীনতা বিহ্বল করে শঙ্করাকে। এবং এ-জাতীয় পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের কোনো উপায় জানা থাকে না তার।

কিন্তু বুড়ির এই বেমক্কা ক্রোধ আবার থিতিয়েও আসে আকস্মিক। তখন তাব ভিন্ন আর এক চরিত্র। আরো যেন সঙ্কুচিত, দীন, সন্ত্রস্ত। ঘরের একেবারে কোণটাতে নিজেকে লুকোনোর জন্য তার তখন আপ্রাণ চেষ্টা। এবং নিরবধি অশ্রুধারা তার দু'চোখ এবং ভাঙা গাল সিক্ত করে।

বুড়ির অসুস্থতার সময় প্রতিদিন নিয়মিত আসা-যাওয়া করত বিত্তি মালতী অনুভারা। সঙ্গে আনত সাধ্য অনুযায়ী ফল মিষ্টি। বুড়ির সেবাযত্ন করত। বুড়ি সুস্থ হয়ে ওঠার পর, ওদের আসাটা কিছু অনিয়মিত, কারণ প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড এবং ক্লান্তি স্বাভাবিক ভাবেই তাদের সময়ের সঙ্কুলানে বিঘ্ন ঘটায়।

তবু সময় পেলেই ওরা দল বেঁধে চলে আসে এবং বুড়িকে নিয়ে হৈচৈ করে। বুড়ির নাম

ওরা জানে না, কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই, কেউ সম্বোধনের কোনো সম্পর্ক-নামও পাতায় না, তাই সার্বজনীন, 'বুড়ি' নামেই চিহ্নিত হয়ে থাকে মাহিলাটি। বুড়ি ওদের আগমনে প্রসন্ন হয়। ওর ভাঙাচোরা মুখে নীরব অভিব্যক্তিতে প্রতিফলন ঘটে তার।

শঙ্করা সে সব সময় কখনো বা ঘরে থাকে, কখনো বা থাকে না, শঙ্করার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি — উভয়তই শঙ্করার প্রসঙ্গই থাকে আলোচনাদির মুখ্য বিষয়।

অনুভা বলে—'ও বুড়ি, কেমন আছো এখন?'

বুড়ির ভাঙা গালে হাসির রেখা, ঘাড় কাত ক'রে জানায় — ভাল আছি।

বিস্তি বলে—'কাণ্ড দেখেছো বুড়ির, কদিনে শঙ্করাদার বাড়ীর ভোল্ পালটে দিয়েছে। শঙ্করাদা তো আনতেই চায়নি বুড়িকে।'

মালতী বলে শঙ্করাকে উদ্দেশ ক'রে— 'ও শঙ্করাদা, বুড়িকে তাহলে আমরা আবার রেখে আসি স্টেশনে — কি বলো?'

শঙ্করা ধমক লাগায় —'যা না, রেখে আয় গিয়ে। দিব্যি তো আমার ঘাড়ে চাপিযে দিয়ে সবাই সরে পড়েছিস্। আমার কিসের এতো দায় পড়েছে?'

মালতীর চোখে কটাক্ষ—'তাতো বলবেই, বুড়ির হাতে দুই বেলা রাঁধা ভাত-তরকারি খাচ্ছো, বুড়ি বুঝি ফ্যাল্না। ওসব চলবে না বলছি শঙ্করাদা!'

রতন বলে—'ও বুড়ি, তুমি রোজ রোজ শঙ্করাদাকে রেঁধে খাওয়াচ্ছ, একদিন আমরাও তোমার হাতের রান্না খাব।'

বিস্তি বুড়ির পিঠের উপর হাত রেখে সকৌতুকে বলে —'কি গো বুড়ি, রাজী আছো তো?'

ওদের এইসব বাদ-প্রতিবাদ, খুন্‌সুটি — বুড়ির চোখে মুখে প্রসন্নতা ছড়ায়।

বুড়ি ওদের মুখে কথায় কথায় 'শঙ্করা' নামটি উচ্চারিত হতে শোনে। 'শঙ্করা' শব্দটি উচ্চারিত হলেই সে যেন উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। শব্দটি অবিরত এক গুঞ্জন তোলে তার মনে। স্মৃতির অসীম সমুদ্র আলোড়িত ক'রে কি যেন খুঁজবার চেষ্টা করে, হাতড়ে বেড়ায় আতিপাতি, কিন্তু ব্যর্থ হয় তার সেই নিরন্তর প্রয়াস। এবং এক গভীর বিষাদ তাকে আচ্ছন্ন করে তখন। তার অনিবার্য পরিণামে মাথার মধ্যে যেন নামে হাজার ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক, এবং যা তাকে প্রায়শঃ এক ক্ষ্যাপামিতে আচ্ছন্ন করে।

আসন্ন শীতের মৃদু হিম-খাকা এক সকাল। এক চিল্‌তে বারান্দার কোণে রান্না-রান্নার সরঞ্জাম, বুড়ি যথারীতি সেখানে পাকাদি নিয়ে ব্যস্ত। বারান্দার নিচে নিকানো উঠোনে চাটাই পেতে ব'সে শঙ্করা; গৃহাশ্রয়ী জীবনের একটা পরিপূর্ণতা এবং নির্ভরতার বলয় তার চারপাশে, যা তাকে ইদানীং কিছু আয়েশী করে তুলেছে।

রান্না-রান্নায় নিমগ্ন বুড়ির দিকে এক পলক তাকায় শঙ্করা এবং সোচ্চারে হাঁক দেয়— 'ও বুড়ি, চা দিলে না যে এখনো!'

সন্ত্রস্ত বুড়িটি কিছু বাদেই চায়ের কাপ এনে নামিয়ে রাখে শঙ্করার পাশে।

সকালের প্রসন্ন সূর্যালোকের উজ্জ্বল উদ্ভাস তখন চারদিকে এবং সেই আলোক-ধারা শঙ্করার কপালে চিবুকে ঘাড়ে—সর্বাঙ্গে। চাটাইয়ে উপবিষ্ট শঙ্করার ডানপাশে চায়ের কাপটি সন্তর্পণে নামিয়ে রেখে শঙ্করার মুখের দিকে এক পলক তাকায় বুড়ি। ঘরকন্নার কাজে প্রয়োজনীয় কোনো সামগ্রী এনে দেবার জন্য হয়ত শঙ্করার কাছে আরজি পেশ করতে চায়, এবং কথাটা উচ্চারণ করার আগে একটু দম নিয়ে সাহস সঞ্চয় করতে চায় বুড়ি।

আকস্মিক তার দৃষ্টি আমূল নিবদ্ধ হয় শঙ্করার ঘাড়ের উপরের সেই ইঞ্চি চারেক লম্বা সাদা জড়ুলটার উপর। সকালের স্বর্ণাভ রোদ তখন সেখানে মাখামাখি জড়াজড়ি হয়ে লুকোচুরি খেলছে।

বুড়ির জবজবে ঘোলা চোখের দৃষ্টি অকস্মাৎ কি যেন এক অমোঘ টানে শাণিত, তীব্র হয়ে ওঠে। মাথার মধ্যে ধ্বনিত হতে থাকে ঝিঁঝিঁ পোকার রণন। দুটি বৈদ্যুতিক তারের চকিত সংযোগে যেমন জ্বলে ওঠে আলোর স্ফুলিঙ্গ, তেমনি বুড়ির মাস্তিষ্কে, চেতনায় যেন কি এক অনুভবের উজ্জ্বল আলোকিত প্রভা।

বুকভাঙ্গা এক দীর্ণ আর্তনাদ আচমকা আকাশ বাতাস মথিত ক'রে ধ্বনিত হয়

—'শঙ্করা—'

বুড়ির এই অপ্রত্যাশিত উচ্চকিত কণ্ঠস্বর চমকিত, বিরক্ত করে শঙ্করাকে। বুড়ি ক্ষীণকণ্ঠ, এবং সে কণ্ঠস্বর প্রায়শঃ অনুচ্চারিত, কণ্ঠস্বরের উচ্চগ্রাম তো অকল্পনীয়। এ যাবত শঙ্করা কখনো তাব নাম উচ্চারিত হতে শোনেনি বুড়ির মুখে। তাই তাব নাম ধ'রে বুড়ির এমন তীব্র আর্তনাদে শঙ্করায় বিরক্ত এবং চমকিত হওয়াই স্বাভাবিক।

ধমক বাজে শঙ্করার কণ্ঠে—'এ্যাই বুড়ি, অমন ক'রে চিল্লাচ্ছো ক্যানো?'

একটি ক্ষীণ বেতস-পত্রের মতো বুড়ির সর্বাঙ্গ তখন আন্দোলিত, এবং শঙ্কবাব বিস্মিত বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে হৃতচেতন বুড়ি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

তীক্ষ্ম অভিনিবেশে শঙ্করা নির্নিমেষ তাকিয়ে বইল বুড়িব মুখের দিকে।

তার নাম ধ'বে বুড়িটা কেন ডেকে উঠল অমন আর্ত চীৎকারে?

বুড়িব মুখের দিকে নিবিষ্টি দৃষ্টিপাতে অভিভূত শঙ্করা যেন অকস্মাৎ এক তীব্র কম্পন অনুভব করে সর্বাঙ্গে, চেতনালোকে সমারূঢ় হয এক ওলট-পালট—ঝড়ের দোলা। তাব অবরুদ্ধ আবেগ ভাষা পায় আর্ত স্বগত জিজ্ঞাসায়—'কে এই বুড়ি?'

স্মৃতি তাকে টেনে নিযে যায় দূর অতীতে।

সীমান্তবর্তী সেই বেল-স্টেশন। স্টেশন-সংলগ্ন অস্থায়ী উদ্বাস্তু আবাস। উদ্বাস্তুদের ভিড়ে দম আটকানো অসহ্য পরিবেশ। তারই মাঝে এক মা, আব তার এক অবোধ, নিতান্ত আপোগণ্ড ছেলে। স্মৃতির ক্ষীণ সূত্র অবলম্বনে উঠে আসা সেই সব চিত্রাবলী আবছা ভাসে শঙ্করার চোখের সামনে।

স্টেশনেব প্লাটফর্মেব এক প্রান্ত ঘেঁষে মা-ছেলের অনিশ্চিত আশ্রয়। আশ্রয়, অন্ন এবং নিরাপত্তা—সবই সেখানে অনিশ্চিত। মাঝে মাঝে কোথা থেকে রেলের গাড়ি আসে। স্টেশনের উদ্বাস্তুদের গরু-ছাগলের মতো তুলে নিয়ে পাড়ি দেয কোন্ অনিশ্চযেব পথে। স্টেশনে স্বল্পকালীন কিঞ্চিৎ শূন্যতা। পরদিনই হয়ত নতুনতর উদ্বাস্তু-আগমনে ভিড়াক্রান্ত হয স্টেশন-চত্বব। শিশু শঙ্করা আর তার মা সুবালার নাম নথিভুক্ত হয় না পুনর্বাসনের তালিকায়। সক্ষম পুরুষমানুষেব অভিভাবকত্বহীন এক হাবাগোবা নাবী, আব তাব নিতান্তই শিশু এক ছেলে, তাদের পুনর্বাসনেব অধিকার কোথায়? অতএব মা আর ছেলে প্লাটফর্মেব কয়েক হাত জমি আঁকড়ে একাদিক্রমে কাটিয়ে দেয় কয়েকটি বছর।

স্টেশনের সেই অনিশ্চিত আবাসে শিশুটি টাল-মাটাল হাঁটে এবং দামাল হতে থাকে ক্রমশঃ। সঙ্গীদের সঙ্গে প্লাটফর্ম-চত্বরে এ-পাশ ও-পাশ বিচরণ করে অবাধ।

কখনো বা চলে যায় স্টেশন ছাড়িয়ে এদিকে ওদিকে, দূরবর্তী কোনো স্থানে। মাযের সতর্ক

প্রহরা এবং সাবধানতা তাকে আবদ্ধ রাখতে পারেনা স্টেশন-চত্বরে। সমবয়স্কদের মা ছিল, বাবা ছিল, ছিল ভাইবোন। কিন্তু তার আপন জন বলতে ছিল একটি মাত্র মানুষ — তার মা। স্বল্প কয়েক বছরেই সে তখন এক পোড়-খাওয়া পক্ক শিশু, স্বজনহীন অভিভাবকহীন সংসারে মা ছাড়া তার স্বজন কেউ নেই, এ বোধ তখন প্রাজ্ঞ করছে তাকে। তার জন্মের আগেই তার বাপকে কারা কেটে ফেলেছে — উদ্বাস্তু এলাকায় ভাসমান এ কাহিনী তাকে কখনো বিমর্ষ, কখনো বা এক-বগ্গা করে। স্বজনহীন উদ্বাস্তু-জীবনের রুক্ষ ভূমিতে সে তখন বড় হচ্ছিল মাকে আশ্রয় করেই। মা যে তার নিতান্ত হাবাগোবা এক মা—উদ্বাস্তু-জীবনের এই রুক্ষ নিরাশ্রয় জীবনে নিজেকে বা তার ছেলেটিকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা সে মা-টির নেই, এ বোধও তাকে অভিজ্ঞ করছিল।

তবু সেই নিরাশ্রয়, নিরালম্ব শূন্যতার মাঝখানে মা-ই যে তার একমাত্র অবলম্বন, এ-বোধ মায়ের প্রতি নির্ভরশীল রাখত তাকে। সেই আধপেটা খেয়ে বেঁচে থাকা অস্তিত্ব, সমবয়স্কদের কাছে কখনো মারধোর-খাওয়া অনাদৃত অহেলিত জীবন, —তার মাঝে মা-ই ছিল তার একমাত্র আশ্রয়-স্থল।

সারাদিন স্টেশনে যাত্রী আর উদ্বাস্তুদের ভিড়ভাট্টায়, কখনো বা স্টেশন ছাড়িয়ে—আরো এদিক ওদিক সে ঘুরে বেড়াত টাল-মাটাল পায়ে। রাত হলে প্লাটফর্মের কোনো স্যাঁৎসেঁতে জমিতে মার কোল-লগ্ন হয়ে শুয়ে থাকত গুটিসুটি। মা তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত, বিলি কেটে দিত চুলে। ঘাড়ের সাদা জড়ুলটার উপর হাতের পাতা বিন্যস্ত রেখে মা বলত —'ও শঙ্করা, ঘুমোলি বাবা?'

ঘুমের অতল রাজ্যে তলিয়ে যেতে যেতে, মায়ের গলা জড়িয়ে ধ'রে, শিশু শঙ্করা কিসব বিড় বিড় করত অস্ফুটে।

শঙ্করাকে বুকে জড়িয়ে সেই অভাগিনী মা তখন যেন অলৌকিক শব্দধ্বনিতে কত কথা উচ্চারণ ক'রে যেত। সেই শব্দ-ধ্বনিতে একটি বক্তব্যই ঘুরে ফিরে আবর্তিত হ'ত ধুয়ার মতো— 'তুই কবে বড় হবি বাবা শঙ্করা, তুই বড় হয়ে আমার দুক্কু ঘোচাবি।'

স্টেশন-প্লাটফর্মের সেই ভূমি-খণ্ডের আশ্রয়ে মা-ছেলের সংসার-জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল নিস্তরঙ্গ।

এরই মধ্যে এক বর্ষণ-মুখর মধ্যাহ্নে এসে দাঁড়িয়েছিল পুলিশ-পরিবৃত উদ্বাস্তু বহনকারী রেলগাড়ী।

সরকারের কঠোর নির্দেশ ছিল, স্টেশন-এলাকায় কোনো উদ্বাস্তু থাকতে পারবে না। হয় তাদের অস্থায়ী উদ্বাস্তু-শিবিরে যেতে হবে, নতুবা যেতে হবে দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের আওতায়।

সেদিনও যথারীতি সকালের খাওয়া-দাওয়া সেরে শঙ্করা বেরিয়ে পড়েছিল নিজস্ব টো টো কর্মে। যদৃচ্ছা ঘুরে বেড়িয়েছিল এদিক ওদিক, সঙ্গীদের সঙ্গে হরেকরকম খেলাধূলা, তারপর জোর বৃষ্টি নামায় রেলের সাইডিং-এর টিনের শেডের তলায় আশ্রয়, এবং বাদুলে হাওয়ার স্নিগ্ধ স্পর্শে অচিরেই গভীর ঘুমে অচেতন।

এদিকে স্টেশন-প্লাটফর্মে তখন দক্ষযজ্ঞ। উদ্বাস্তু পরিবারগুলোকে বলপূর্বক টেনে তোলা হচ্ছিল রেলগাড়িতে। যত দ্রুত পারা যায়, স্টেশন খালি ক'রে উদ্বাস্তুদের চালান দিতে হবে অন্যত্র।

সেদিনও সুবালার গায়ে ছিল জ্বর, প্লাটফর্মের ঠাণ্ডা মেঝেয় হাত পা গুটিয়ে জ্বরে ককাচ্ছিল। কিন্তু এবার রেহাই পেল না সেও। উদ্বাস্তুদের সেই গড্ডালিকাপ্রবাহে সুবালাও অন্তর্ভুক্ত হ'ল বাধ্যতামুলকভাবে। তাকে ঠেলে তুলে দেওয়া হ'ল গাড়িতে।

কিন্তু সুবালা জ্বরের ঘোরেও পরিত্রাহি আর্তনাদ করেছিল—

—'আমার ছেলে, আমার শঙ্করা যে প'ড়ে থাকল, তারে ফ্যালায়ে আমি কেমন ক'রে যাব, ও বাবুরা, আমার ছেলেরে আ'নে দ্যাও।'—

কর্মকর্তাদের রক্তচক্ষু ধম্‌কে উঠেছিল—'সবাইকে তোলা হবে, কেউ বাদ যাবে না, আগে তুমি গাড়িতে ওঠো।'

এক প্রবল ধাক্কায় সুবালা উঠে যায় গাড়িতে।

পার্শ্ববর্তী এক তাড়িত বৃদ্ধা মন্তব্য করে— 'তোর ছেলেরে যেন দেখলাম গাড়িতে উঠ্‌তিছে। তুইও উঠে পড়। শঙ্করা দেখবি ঠিকই উঠে পড়িছে কোনোটায়।'

কামরায় সেই স্থান-সঙ্কুলান হীন পরিবেশে সুবালার চীৎকার, কান্না, ব্যর্থ হয়েছিল সবই। সবাই তখন নিজস্ব বাক্স-প্যাঁটরা এবং আত্মজনের নিরাপত্তা নিয়েই ব্যস্ত। ফলে সুবালা গাড়িতে উঠ্‌ল, কিন্তু তার ছেলে উঠল কিনা, তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা ছিল না। সেই বিষম হট্টগোলে শঙ্করাকে খুঁজে বেড়ানো সুবালার পক্ষেও ছিল সাধ্যাতীত।

কিছুক্ষণ বাদেই স্টেশন-প্লাটফর্ম এবং সন্নিহিত এলাকাটি উদ্বাস্তুমুক্ত ক'রে বিদায় নিল রেলগাড়িটি।

এসব ঘটনাবলীর পরে সাইডিং-এর টিনের শেডের তলায় কয়েক ঘন্টার দিবানিদ্রা সেরে, আপন খেয়ালে শঙ্করা যখন আবার ফিরে এসেছিল স্টেশনে, প্লাটফর্ম তখন ফাঁকা, শুনশান্।

ভরা-ভরতি প্লাটফর্মের এই আকস্মিক শূন্যতার কারণ শঙ্করার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে বোধগম্য হ'ল না, তাকিয়ে থাকল ভ্যাবলার মতো।

দীর্ঘদিন এখানে অবস্থানের দরুণ প্লাটফর্মের চায়ের দোকানীটি শঙ্করা এবং ওর মা সুবালার সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচিত। প্লাটফর্মের সেই ঠা ঠা শূন্যতার মাঝখানে শিশু শঙ্করার একক অবস্থান, একা এবং নিতান্তই অসহায় একা, বিচলিত করে দোকনীটিকে। জিজ্ঞাসা করে—'কিরে শঙ্করা, তুই কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

শঙ্করা নিরুত্তর, পরিস্থিতি তাকে বিমূঢ় ক'রে রাখে।

দোকানীটি এবার আর্তনাদ করে —'আরে হতভাগা ছেলে, কোথায় গিয়ে প'ড়ে ছিলি এতক্ষণ? রেলগাড়িতে সবাইকে তুলে নিয়ে গেল, তোর মাকেও নিয়ে গেছে, আর তুই একা পড়ে থাক্‌লি? কি হতভাগা ছেলেরে তুই?'

শঙ্করার চারপাশ ঘিরে তখন অন্ধকার। ঘন কালো জমাট অন্ধকার। অপরিসীম এক শূন্যতা। মা তাকে ফেলে গেছে। কিম্বা সে কাছে ছিল না বলে মা তাকে নিয়ে যেতে পারেনি সঙ্গে ক'রে। সে একা, পরিত্যক্ত, অসহায়। তার শিশু-মস্তিষ্কেও অবস্থার গুরুত্ব অনধিগম্য থাকেনি। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে, ফুলে ফুলে সে কেঁদেছিল সারাটি সন্ধ্যে।

জীবনের সেই শিশুবেলায়, নিষ্ঠুর পারিপার্শ্বিকে একমাত্র নির্ভরতার স্থান সেই মাতৃক্রোড়টুকু থেকে এমনি করেই সেদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল শঙ্করা।

বেঁচে থাকার আদিম তাগিদে প্রথমে ভিক্ষাবৃত্তি, তারপর হাজার ঘাটের নাকানি-চোবানি খেয়ে আজ এতখানি বড়ো হয়েছে সে। মাকে ফিরে পাবার এক দুর্মর আকাঙক্ষা সে দীর্ঘদিন লালন ক'রে চলত বুকের মধ্যে সংগোপনে, উথাল-পাথাল হতাশ্বাস নিয়ে ঘুরে বেড়াত নানা রেল-স্টেশনে, প্লাটফর্মে, কিন্তু ধীরে ধীরে একদিন এ উপলব্ধি তার মনে নিশ্চিত শিকড় গেড়েছিল, তার অভাগিনী মাকে কোনোদিনই আর সে ফিরে পাবে না জীবনে।

কিন্তু, কে এই বুড়ি? তার ঘাড়ের সাদা জড়ুলটার দিকে অমন পলকহীন দৃষ্টিপাত, সহসা যেন কি এক আবিষ্কারের আনন্দে 'শঙ্করা' ব'লে অমন বুক-নিঙড়ানো ডাক, এসবের অর্থ খুঁজে পায়না শঙ্করা। বারবার মনের মধ্যে আবর্তিত হয় ঐ একই প্রশ্ন — কে এই বুড়ি?

নির্নিমেষ শঙ্করা তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধার মুখের দিকে। মাথায় কাঁচাপাকা চুল, বলি-রেখা-অঙ্কিত ভাঙা-চোরা মুখ, শীর্ণ দেহ, — বৃদ্ধার অবয়বে উদ্‌ভ্রান্তের মতো কি যেন খুঁজে বেড়ায় শঙ্করা।

তারপর, তার সব সন্দেহ নিরসন হয় নিশ্চিত প্রতীতিতে। বৃদ্ধার মুখের ডৌলে, চোখের দৃষ্টিতে, চিবুকের গঠনে, ধীরে ধীরে প্রতিভাসিত হয় এক রমণী-মূর্তি, যা তার শৈশবের প্রত্যুষে হারিয়ে-ফেলা মায়ের অবিকল প্রতিচ্ছবি।

এক আশ্চর্য অনুভবের মধ্য দিয়ে শঙ্করা বুঝল, তার ভাগ্য আবার ফিরিয়ে দিয়েছে তার মাকে। মা, তার দুঃখিনী মা, আবার ফিরে এসেছে তার কাছে।

পরম মমতায় শঙ্করা অচেতন বুড়িকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে এনে শুইয়ে দেয় ঘরের মধ্যেকার মাচার বিছানাটিতে। জলের ছিটে দেয় চোখে মুখে। বুড়ির শরীরে স্পন্দন আসে।

ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে, শঙ্করা বের হয়ে আসে ঘর থেকে। চাটাইয়ের উপরে পূর্বেকার জায়গাটিতে এসে বসে থাকে নিশ্চুপ। ঘটনার এই আকস্মিকতা, এই পরম প্রাপ্তির আতিশয্য তাকে বিমূঢ়, নির্বাক করে রাখে।

।। ষোলো ।।

সেই স্তব্ধ শিলীভূত মুহূর্তটিতে ওরা এল দল বেঁধে। রতন বিন্তি অনুভা মালতী।

রতনের হাতে একটি চটের থলি, জিনিসপত্রের ভারে থলিটি স্ফীতোদর। আসন্ন শীতের নরম রোদে শঙ্করার ঘরের চতুষ্পার্শ্বের ঝোপ-আগাছার বনজ-ভূমিতে বিচরণশীল যে বিচিত্রবর্ণা প্রজাপতিগুলি, তাদের মতো সহজ, লঘু এক স্বাচ্ছন্দ্যে ওরা এসে দাঁড়াল শঙ্করার উঠোনে।

উঠোনের জমিতে, স্তব্ধ এক অনড় গাম্ভীর্যে, আনন্দ কিম্বা বিষাদের যুগলবন্দীতে সমাচ্ছন্ন তখন শঙ্করা।

শঙ্করার সেই সমাহিত অবয়বের দিকে তাকিয়ে সোচ্চার হ'ল রতন — 'কি গুরু, সাত-সকালে এমন ভোম্ মেরে বসে আছো কেন? স্টেশনেও যাওনি। হ'লটা কি তোমার?'

শঙ্করা ওদের দিকে অর্থশূন্য, ভাবলেশহীন দৃষ্টিপাত ছড়িয়ে দিল একবার। কিন্তু ভাষার কোনো স্পন্দন এলোনা তার কণ্ঠে।

অনুভা বলল—'জানো শঙ্করাদা, স্টেশনে গিয়ে সবাই দেখি, গাড়ি বন্ধ। দমদমে নাকি মালগাড়ি উল্টে পড়েছে। মেন লাইন, বনগাঁ লাইন, সব লাইনেই ট্রেন বন্ধ। তোমাকে স্টেশনে দেখলাম না, তাই দলবেঁধে চলে এলাম তোমার বাড়ীতে।'

বিন্তি বলল — 'বুড়ি কোথায় গেল শঙ্করাদা? দ্যাখো, রতন কি কাণ্ড করেছে।'

রতনের কণ্ঠে উল্লাসের উচ্ছ্বাস —'বুড়ি কোথায় গেলে, ও বুড়ি, দ্যাখো কত অতিথ এসেছে তোমার বাড়ীতে। আজে তুমি মাংস রান্না করবে, আমারা সবাই তোমার হাতের রান্না খাবো। আজ আমাদের পিকনিক।'

আসলে, ওরা সকালে স্টেশনে গিয়ে ট্রেন চলাচলের বিভ্রাটে বাধ্যতামূলক কর্ম-বিরতির পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে, এবং শঙ্করাও অনুপস্থিত, ফলে ওরা দীর্ঘদিন ধ'রে মনের কোণে যে ইচ্ছাটা লালন করছিল, সেটা কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিল ঝটিতি। মোটামুটি হিসাব ক'ষে ওরা নিজেদের

মধ্যে চাঁদা তুলে কিছু অর্থের ব্যবস্থাও করল। স্টেশন-পার্শ্ববর্তী বাজারে গিয়ে কিলো দেড়েক মাংস, সরু চাল, আলুপেঁয়াজ এবং অন্যান্য রন্ধন-সামগ্রী সংগ্রহ করল রতন, এবং তারপরেই শঙ্করার বাড়ীর উদ্দেশে ওদের সম্মিলিত পুলক-অভিযান। উদ্দেশ্য, শঙ্করাকে চমকে দেওয়া, সারাদিন শঙ্করার বাড়ীতে সম্মিলিত অবস্থান, শঙ্করার নতুন গৃহস্থালি-জীবনে রান্নাবান্না, হৈ চৈ ক'রে দিনটা পিকনিক আর ছুটির মেজাজে কাটানো।

কিন্তু শঙ্করার বিষাদ আর গাম্ভীর্যমাখা থম্-মারা অবয়ব ওদের উৎসাহে আনে ভাঁটার টান। ওদেব জিজ্ঞাসু চোখ পবস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে, কিন্তু পরিস্থিতির তল পায়না।

নীরবতা ভাঙে শঙ্করাই— 'আয়, বস্ সবাই। তা, হঠাৎ দল বেঁধে চলে আস্লি সবাই, ব্যাপার কি?'

রতন তড়বড় করে —'আরে, সেই কথাটাই তো বলে যাচ্ছি আমরা তখন থেকে। তা, তুমি গুরু এমন মট্কা মেরে পড়ে আছো, কিছুই তোমার কানে ঢুকছে না।'

মালতী বলল —'আজ ট্রেন বন্ধ, আমাদের কাজও বন্ধ। আজ আমরা পিকনিক করব সবাই তোমাব বাড়ীতে।'

বিষণ্ণ, বিধুব এক মগ্ন কণ্ঠস্বরে শঙ্কবা বলে — 'পিকনিক কববি, সে তো ভালো কথারে। আমাব কাছ থেকেও চাঁদা নিতে হবে। আমার চাঁদাটা একটু বেশী ক'রে ধরবি। আজ আমার বড়ো আনন্দের দিন।'

ফোঁস ক'রে মন্তব্য করে রতন —'নাও গুরু, আর বং দেখিও না। এতক্ষণ তো কথাই বলছিলে না, এখন বলছ বেশী করে চাঁদা নিতে হবে—তোমার নাকি বড়ো আনন্দের দিন! তা, এত আনন্দটা তোমার কিসে হ'ল তা তো বললে না।'

মালতী বলে—'শঙ্করাদাব আবার আনন্দ! সবই সমান শঙ্করাদার। ভালতেও মুখ-গোম্ড়া, মন্দতেও মুখ-গোম্ড়া।'

রহস্যটা অনুধাবনের চেষ্টা করে বিন্তি। অপলক গভীর দৃষ্টিপাতে এক পলক তাকিয়ে থাকে শঙ্কবাব দিকে।

সে দৃষ্টিব সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় ঘটে শঙ্করার। প্রসন্নতায় মেদুর শঙ্কবাব সে দৃষ্টি আশ্বস্ত করে বিন্তিকে।

শঙ্করা বলে— 'এখানে বস্ সবাই। একটা কথা বলব।'

—চাটাই জুড়ে বসে সবাই।

শঙ্করার কণ্ঠে সেই মগ্নতা —'তোরা সবাই মিলে যে বুড়িকে আমার বাড়ী ফেলে গেলি—'

রতন অসহিষ্ণু ক্ষিপ্রতায় বলে ওঠে — 'ক্যানো, বুড়ি কি খুব বেশী হয়ে গেছে, তুমি না রাখতে চাও, আমি নিয়ে যাব বুড়িকে।'

রতনের অসহিষ্ণুতা, কথার মধ্যে বাধা দেওয়া — এসব সত্ত্বেও শঙ্করার মেজাজে উত্তাপ ছড়ায় না। সেই ধীর কণ্ঠেই সে বলে যায় — 'আগে আমার কথা শোন্ সবাই। তারপর বুড়িকে কি করবি, সবাই ঠিক করিস্।'

ওরা নিশ্চুপ বসে থাকে।

এক সিক্ত কণ্ঠস্বর নির্গত হয় শঙ্করার হৃদয়ের গভীর থেকে — 'তোরা সবাই শোন্ , ঐ বুড়ি আমার মা—, আমার হারিয়ে যাওয়া মা —।'

সংবাদটির আকস্মিকতা বিহ্বল করে ওদের। চমকিত বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে।

কিন্তু রতনের কণ্ঠে অবিশ্বাস —'বলছ কি শঙ্করাদা! বলা নেই, কওয়া নেই, বুড়ি তোমার মা হয়ে গেল! কি ক'রে বুঝলে যে বুড়ি তোমার মা?'

শঙ্করা হাসে, বলে —'আমার মাকে আমি চিনতে পারব না, তুই চিনবি? — একটু থেমে বলে —'সত্যিইরে, আমি আগে চিনতে পারিনি মাকে, মা-ই আমাকে আগে চিনেছে। আমার ঘাড়ের এই সাদা দাগটা দেখে চিনতে পেরেছে মা আমাকে। 'শঙ্করা' ব'লে চেঁচিয়ে উঠতেই, আজ আমি ভালো ক'রে বুড়িকে দেখলাম। বুড়ি আমারই মা।'

রতন এবার উচ্ছ্বসিত —'জব্বর কাণ্ড, কুড়িয়ে পাওয়া বুড়ি হয়ে গেল শঙ্করাদার মা! ঠিক আছে, আজ থেকে বুড়ি হয়ে গেল আমাদেরও মাসিমা — আমাদের মাসি। ও মাসি— কোথায় গেলে মাসি—'

রতন দ্রুত ছুটে যায় ঘরের মধ্যে। মাচানের উপর বুড়ি তখন স্থির ভঙ্গিমায় উপবিষ্ট। ঝটিতি বুড়িকে পাঁজাকোলা ক'রে বাইরে নিয়ে আসে রতন। বসিয়ে দেয় উঠোনের চাটাইয়ের মধ্যস্থানে।

অনুভা বলে — 'ও মাসি, দিব্যিতো ছেলের মা হয়ে গেলে, এবার আর আমাদের চিনতেই পারবে না।'

বুড়ির দু'চোখ ছাপিয়ে অশ্রুধারার প্লাবন। আর, ভাঙা-চোরা মুখ কাঁপিয়ে থিরিথিরি সুখের কাঁপন। ওদের পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, আর কি যেন এক সুখ-সাগরে ভাসে।

সহজ, স্পষ্ট উচ্চারণে বুড়ি, বুড়ি সুবালা বলে—'হ্যারে মা, শঙ্করা আমারই ছেলে। সেই কোন্ কালের কথা! রেলগাড়ি আ'সে আমারে তুলে নিয়ে গেল, শঙ্করা যে ক'নে প'ড়ে থাকলো, জানতিও পারলাম না। এট্টু এট্টু হাঁটতি পারতো, খুঁটে খাতি জানতো না। সেই শঙ্করা আমার হারায়ে গেল। কোনোদিন যে ওরে আর ফিরে পাবো, তা তো ভাবিনি। — তোমরা ওরে 'শঙ্করা' বলে ডাকো, শুনে আমার বুকির মধ্যি মোচড় মারে। মনে ভাবি, তাও কি হয়! শঙ্করা নামতো আর মান্‌ষিরও হয়। আজ ওর ঘাড়ের দাগ দেখে বুঝতি পারলাম, ওই আমার শঙ্করা। ঘাড়ের ঐ ধলা দাগ ওর জন্মো-দাগ।'

শঙ্করার মুখে স্মিত প্রসন্নতা। সে প্রসন্নতা শনাক্ত করে সুবালার মাতৃত্বকে।

বিন্তি উঠে এগিয়ে যায় কিছু দূরবর্তী-স্থানে। একান্তে ডাকে রতনকে।

সমীপবর্তী রতনকে কানে কানে বলে—'খুব তো মা ছেলের আহ্লাদ দেখ্‌ছ বসে বসে, তা এমন একটা দিনে আমাদেরও তো কিছু করা দরকার!'

বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়ে রতন — 'সে তো ঠিক কথা বিন্তিদি। কিন্তু কি করা যায় বলোতো?'

ছোট্ট টাকার ব্যাগটা বের করে বিন্তি। কয়েকখানা দশ টাকার নোট বের ক'রে রতনকে বলে—'এইটা ধরো। দৌড়ে গিয়ে বাজার থেকে একখানা ভাল সরুপেড়ে শাড়ি আর সায়া ব্লাউজ কিনে আনো, আমরা এদিকে রান্না চাপাই।'

টাকাগুলো নিতে নিতে বলে রতন— 'তুমি একা দিলে কি ক'রে হবে, আমাদের কাছ থেকেও নিতে হবে।'

ধমক দিয়ে বলে বিন্তি— 'যা বলছি, তাই করো তো। টাকা দিতে হয়, পরে দিও। এখন যা বলছি, তাই করো।'

কৃত্রিম বিনয়ে মাথা নোয়ায় রতন — 'যে আজ্ঞে মেম সাহেব।' — এবং দ্রুত রওনা হয় স্টেশন-সংলগ্ন বাজারের দিকে।

সকালের হিম-স্নান রোদে বেলা বেড়ে এখন উত্তাপ সঞ্চারিত। অনুভা মালতী উঠোনের চাটাইটা তুলে ফেলে। বারান্দার এ-পাশটিতে পেতে দেয় সযত্নে।

বিস্তির দু'চোখে রহস্য আর মমতার মেদুর অবস্থান — অপাঙ্গে একবার তাকায় শঙ্করার দিকে। তারপর সুবালার হাত ধরে বলে— 'চলো মাসি, বারান্দায় বসবে চলো। শঙ্করাদা, তুমিও মাসির কাছে এসে বসো। আমরা রান্না-বান্নার দিকটা দেখি।'

সুবালা আজ যেন অনেক সহজ, স্বাভাবিক। নিয়ত যে কুণ্ঠা এবং সন্ত্রস্ত মানসিকতা আড়ষ্ট ক'রে রাখত তাকে, আজ যেন তা থেকে সে মুক্ত। স্বাভাবিক, প্রকৃতিস্থ এক মানুষ।

গৃহকত্রীর দায়িত্ববোধে যেন সে সচেতন, বলে— 'তা কি ক'রে হয় মা, তোমরা আজকে সবাই আমার শঙ্করার বাড়ী অতিথ হইচো, আমি ব'সে থাকলে চলে নাকি?'

কৃত্রিম ক্রোধে চোখ পাকায় মালতী — 'ও মাসি, ছেলে পেয়ে একদিনে তোমার খুব সাহস বেড়েছে দেখছি। আমরা যা বলছি তাই হবে। আজ তুমি কোনো কাজ করতে পরবে না। চুপচাপ বসে থাকবে।'

কৌতুকের হাসি ছড়িয়ে বিস্তি বলে— 'দেখলে তো মাসি। মালতী কি রকম রেগে গেছে। ভয়ানক জাহাবাঁজ ওটা। ভালোয় ভালোয় গিয়ে বারান্দায় বসে থাকো।'

স্নিগ্ধ মমতায় সুবালার হাত ধ'রে নিয়ে বারান্দায় বসিয়ে দেয় বিস্তি। নন্দিত মমতার বিভাটুকু দৃষ্টিতে ধরে রে'খে বলে —'কি শঙ্করাদা, তোমাকেও বললাম না, মাসির কাছে এসে বসো।'

অনুগত বাধ্যতায় শঙ্করা গিয়ে বসে মায়ের পাশে।

অতঃপর বিস্তি মালতী অনুভা, সমবয়স্কা তিনটি মেয়ে, হাসি আর কলোচ্ছ্বাসের মত্ততায় হাত লাগায় রান্নার কাজে। শঙ্করা তার মাকে ফিরে পাওয়ায়, এই হতভাগ্য মানুষ দু'টির জীবনে আকস্মিক আজ যে পূর্ণতার স্পর্শ লেগেছে, তা যেন আপ্লুত করে ওদেরও।

ঘন্টাখানেকের ব্যবধানে ফিরে আসে রতন। স্টেশন-অঞ্চলের একটি সুখ্যাত বস্ত্র-বিপণির মোড়ক ওর হাতে।

রতন ফিরতেই আর একবার কলধ্বনি ওঠে মেয়েদের মধ্যে। মোড়কটি নিয়ে কিঞ্চিৎ কাড়াকাড়ি, এবং সবাই মিলে মোড়কটি খুলে কাপড় ব্লাউজ দেখে, তারিফ করে রতনের পছন্দের।

মালতী বলে— 'ও মাসি, আমার সঙ্গে চলো।'

সুবালা এদের কাণ্ড-কারখানায় যেন কিছুটা দিশেহারা। বলে—'আমারে আবার ক'নে নিয়ে যাবিরে মা?'

ততক্ষণে সুবালার মাথার তালু নিষিক্ত করে বিস্তি খানিকটা তেল লেপ্‌টে। সুবালাকে ধ'রে ধ'রে নিয়ে যায় পার্শ্ববর্তী এক পুকুর ঘাটে। স্নানান্তে ঘরে ফিরিয়ে আনে এবং নতুন শাড়ি ব্লাউজে সুবালাকে সাজায় বিস্তি।

মেয়েগুলোর এসব দৌরাত্ম্যে তটস্থ বোধ করে সুবালা, এবং এ-জাতীয় হুড়োহুড়িতে কিছুটা যেন বেসামাল, বলে— 'কি যে সব নছল্লা নাগাইছো মা তোমরা, আমি যে আর পা'রে উঠতিচি না।'

বিস্তি বলে — 'তা বললে তো চলে না মাসি, আজ তোমার কত বড় আনন্দের দিন। তোমার ছেলেকে ফিরে পেলে।'

অনুভা বলে —'নতুন কাপড় প'রে তোমাকে কিন্তু বেশ দেখাচ্ছে মাসি।'

ওদের এই ছেলেমানুষী আনন্দে অতঃপব সুবালাকেও সামিল হতে হয়।

বারান্দার এক কোণে শঙ্করা বসে থাকে নিশ্চুপ, যেন এক উদাসীন দর্শক, ঘটনা-গতির সঙ্গে যেন তার কোনো সংযোগ নেই। অপ্রত্যাশিত এই প্রাপ্তিতে যে উত্তাল আবহাওয়া নির্মিত হয়েছে তার সমস্ত মন জুড়ে, তা যেন তাকে স্থাণুবৎ ক'রে রাখে বহিরঙ্গে।

বার্তাটি ক্রমশঃ রটিত হয়ে যায় এতদঞ্চলে।

ডাক্তারবাবু তাঁর জীর্ণ নিরাময়-কেন্দ্রটিতে ব'সে রোগী দেখছিলেন যথারীতি। উপস্থিত একজন রোগীর মুখে সংবাদটি বিবৃত হয়

—'জানেন ডাক্তারবাবু, শঙ্করা যে বুড়িটাকে স্টেশন থেকে তুলে এনেছিল, আর আপনি যার চিকিৎসা করেছিলেন, সে বুড়ি আসলে শঙ্করারই মা।'

সংবাদটিতে ডাক্তারবাবুও চমৎকৃত হ'ন। বলেন— 'বলো কিহে, খবরটা কি সত্যি?'

—'হ্যা ডাক্তারবাবু, পুরো সত্যি ঘটনা।'

ডাক্তারবাবু সংক্ষেপে মন্তব্য করেন— 'ট্রুথ্ ইজ স্ট্রেঞ্জ দ্যান্ ফিক্‌শান্। খুবই তাজ্জব ঘটনা।'

সরেজমিনে একবার স্বয়ং রহস্যটা তদন্ত করবার সিদ্ধান্ত নেন ডাক্তারবাবু।

রোগী দেখার পর্ব সাঙ্গ করে মধ্য-দুপুরে তার দ্বিচক্র-যান বাহনটিতে আরূঢ় হয়ে উপস্থিত হন শঙ্করার বাড়ীতে। বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে 'ক্রিং ক্রিং' আওয়াজ তোলেন সাইকেলের ঘন্টিতে। সে আওয়াজে সচকিত হয়ে সবাই তাকায় বাড়ীর বাইরে।

ডাক্তারবাবুকে দেখে পুলক অনুভব করে সবাই, সাদর আহ্বান জানায় শঙ্করা— 'আসেন ডাক্তার বাবু, আসেন।'

বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করেন ডাক্তারবাবু। বলেন —'আমার রোগী কোথায়? কেমন আছে এখন?

ডাক্তারবাবুকে দেখে নতুন বস্ত্রশোভিত সুবালা কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত, জড়সড়।

মালতী বলে— 'জানেন ডাক্তার বাবু, আপনার রোগী আসলে শঙ্করাদার মা।'

মাথা নাড়েন ডাক্তারবাবু — 'হ্যাঁ, সে রকমই তো বলছে সবাই। তা, ব্যাপারটা কি সত্যি?'

এগিয়ে আসে শঙ্করা। অবনত দৃষ্টিতে ডাক্তার বাবুকে বলে—'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, আমার মা!'

প্রসন্ন হাসেন ডাক্তারবাবু। এগিয়ে যান সুবালার কাছে— 'কি মেয়ে, কেমন আছো এখন?'

সুবালা বলে— 'ভালো আছি ডাক্তার বাবু।'

ডাক্তার বাবু বলেন — 'তা বেশ, বেশ, — ভালো থাকো সবাই।'

অতঃপর পশ্চাদ্‌বর্তী হয়ে ডাক্তারবাবু তার যানটিতে উঠবার উপক্রম কবেন।

বিন্তির কণ্ঠে ত্বরিত আহ্বান — 'ও ডাক্তার বাবু, দাঁড়ান দাঁড়ান, যাবেন না।'

ফিরে দাঁড়ান ডাক্তারবাবু—'আবার পিছু ডাক কেন?'

বিন্তির কণ্ঠে অনুনয়— 'একটুখানি বসে যেতে হবে আপনাকে।'

— 'কি হ'ল, কি ব্যাপার আবার?' — অগ্রবর্তী হ'ন ডাক্তার বাবু।

বারান্দার পাশে একখণ্ড আসন বিছিয়ে দেয় মালতী। দ্রুত হাতে বিন্তি এক বাটিতে কয়েক টুকরো মাংস আর গরম ঝোল বাড়িয়ে দেয ডাক্তারবাবুর দিকে—

—'আপনাকে একটুখানি চেখে-দেখতে হবে ডাক্তার বাবু।'

বিন্তির আন্তরিকতাটুকু অবহেলা করেন না ডাক্তারা। সানন্দে হাত বাড়িয়ে দেন— 'তোমরা দেখি দিব্যি ভোজের আয়োজন করেছ। আর আমি হঠাৎ উড়ে এসে ভাগ বসিয়ে ফেললাম।'

শঙ্করা বলে — 'কি যে বলেন ডাক্তারবাবু, দুই টুকরো মাংস খেলে আমাদের ভাগে কম পড়বে না।'

কাছে এসে দাঁড়ায় সুবালা। তার কণ্ঠেও নম্র অনুরোধ — 'খান ডাক্তার বাবু।'

সামগ্রিক অন্তরঙ্গ পরিবেশটিতে ডাক্তারবাবুও অভিভূত হ'ন— 'খাব বইকি বুড়িমা, নিশ্চয়ই খাব, তোমাদের এমন আনন্দের দিনে আমারও যে বড়ো আনন্দ হচ্ছে।'

ডাক্তারবাবু বিদায় নিলে শঙ্করা আর সুবালাকে পরম অভ্যাগতের যত্নে পাশাপাশি বসিয়ে যত্ন করে খাওয়ায় বিত্তিরা। সুবালার চোখে অকারণ অশ্রু, অবারণ ধারায় তা সিক্ত করে তার গণ্ডদেশ।

মালতী ধমক লাগায় — 'ও মাসি, আবার তোমার চোখে জল আসছে? খবরদার বলছি, আর যেন তোমার চোখে জল না দেখি।'

অঞ্চল প্রান্তে চোখ মোছে সুবালা।

ভোজন পর্ব সাঙ্গ হ'লে বারান্দায় চাটাই বিছিয়ে বসে ওরা সবাই। সুবালাকে কেন্দ্র ক'রে ওদের কথোপকথনের বৃত্তটি রচিত হয়। কুড়ি বছরের অধিক দিন ধ'রে সুবালার জীবন অতিবাহিত হয়েছে স্রোতের শ্যাওলার মতো। কখনো বাংলায়, কখনো বাংলার বাইরে— দণ্ডকারণ্যে। পরাশ্রিত, কৃপা-নির্ভর জীবন। শারীরিক এবং মানসিক অসুস্থতা সেই জীবনকে বিড়ম্বিত করেছে প্রায়শঃই। স্ত্রীলোকের প্রাণ নিতান্তই কচ্ছপের সমান,— এ জাতীয় উপমা সম্ভবতঃ এক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত। সুবালার জীবনের সেই সব দুঃখ-গাথাকে ঘিরে, ঘুরে ফিরে নানান প্রশ্ন করে বিত্তি অনুভা মালতী। নানাবিধ আঘাতে মানসিক বিকারগ্রস্ত, সন্তানহারা হতভাগিনী নারীটির জীবন-বৃত্তান্ত ওদের চোখ দু'টিকে আর্দ্র করে ক্ষণে ক্ষণে।

এক পাশে ঘুমের ভাণ ক'রে শঙ্করা শুয়ে ছিল কুণ্ডলাকৃতি, কিন্তু তাব চেতনা ছিল উৎকর্ণ, মায়ের দুঃখ-কাহিনী তার হৃদয়ে জ্বালা ছড়াচ্ছিল অনির্বাণ দাবদাহেব ভীষণতায।

রাত্রির নিরালা অবসরে বিত্তি আব উমাপতির কথোপকথন।.

বিত্তি বলে — 'শুনেছো বাবা, কি কাণ্ড! যে বুড়িকে আমরা স্টেশন থেকে তুলে এনেছিলাম, সে হ'ল শঙ্করাদার মা।'

নিঃসন্দেহে উমাপতিকেও চমৎকৃত করেছে ঘটনাটি। বলেন — 'সবই শুনেছি রে আমি ! সত্যিই বড়ো আনন্দের খবর।'

সাবাদিনের সঞ্চয় থেকে বিত্তি বলে।

—'দেশভাগের পর পূব-পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার সময় দাঙ্গাবাজরা মেরে ফেলে শঙ্করাদার বাবাকে। শঙ্করাদা তখন মার পেটে। শঙ্করাদার মাকে আটকে রেখেছিল গুণ্ডারা। শঙ্করাদার মা পালিয়ে এসে ওঠে বনগাঁ স্টেশনে। ওখানে শঙ্করাদার জন্ম হয়। ওখানেই ওরা থেকে যায় কয়েক বছর। তারপর একদিন উদ্বাস্তু-বওয়া গাড়িতে অন্য সবার সঙ্গে তুলে নিয়ে যায় শঙ্কবাদার মাকে । শঙ্করাদা সে সময় স্টেশনে না থাকায় বাদ পড়ে যায়। সেই থেকে মা ছেলের ছাড়াছাড়ি। শঙ্করাদার মাকে দণ্ডকারণ্যে নিয়ে গিয়েছিল। ওখানেই ছিল এতদিন। 'বাংলাদেশ' হ'লে ওরা একদল চলে এসেছিল পশ্চিম বাংলায়। সেই দলের সঙ্গে ছিল শঙ্কবাদার মা ও। ওরা 'বাংলাদেশে' নিজেদের ভিটেয় ফিরে যাবে বলে এসেছিল। যেতে পারেনি। নানা জায়গায় ঘুরে আমাদের স্টেশনে এসেছিল ওরা। কয়েকদিন ছিল। তারপর আবার দণ্ডকারণ্যে রওনা হয়ে যায়। সে সময় শঙ্করাদার মা-র জ্বর হয়েছিল। ওকে ফেলেই ওদের দলটা চলে যায়।'

দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করেন উমাপতি—'বড়ই দুঃখের কাহিনী রে!'

বিন্তি বলে —'ভাগ্যিস আমরা সেদিন বুড়িকে তুলে এনেছিলাম—!'

উমাপতি বলেন— 'ভগবানের একটা বিচার আছেরে বিন্তি! চিরদিন কারো এক রকম যায় না। শঙ্করা বড় ভালো ছেলে। কিন্তু জীবনে তো কম দুঃখ-কষ্ট পেলোনা। তবু ভগবান যে ওদের মা-ছেলেকে আবার মিলিয়ে দিয়েছেন, এটাই বড়ো সুখের কথা।'

নিস্তব্ধ অন্ধকারে উমাপতির প্রশান্ত, ঈশ্বর-বিশ্বাসী কণ্ঠস্বর গাম্ভীর্য ছড়ায় পরিবেশটিতে। এবং বিন্তি তখন নিছক এক একাগ্র শ্রোতা। দৃষ্টিহীন অন্ধকারে তার মনোযোগ ন্যস্ত থাকে বাবার কণ্ঠস্বরে—।

উমাপতির স্বরে বাজে পুনরায় তন্ময় বিষণ্ণতা — 'এই দেশভাগে অমন কত যে মা তার ছেলেকে হারিয়েছে, আর ছেলে হারিয়েছে তার মাকে, তার কি কোনো হদিস আছেরে! কোনো ইতিহাস খোঁজ পাবেনা কোনোদিন সে সব চোখের জলের কাহিনীর।'

।। সতেরো ।।

প্রাত্যহিক দিন-যাপন আবার স্থিত হয় নিজস্ব ছন্দে।

ঘুম থেকে উঠে সুবালা রান্না-বান্না করে অতি প্রত্যুষে। শঙ্করা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজস্ব কাজ-কর্মের তাড়ায় বেরিয়ে পড়ে যথারীতি। সুবালা সারাদিন গৃহস্থালীর কুটুর-কাটুর নানাবিধ কৃত্যের মধ্যে ব্যাপৃত রাখে নিজেকে, এবং এই দৈব-যোগে প্রাপ্ত গৃহ-জীবন, সন্তানের সান্নিধ্য, তাকে নিয়ত সুখী এবং তৃপ্ত রাখে। জগৎ-সংসাবে এতখানি সুখের বিস্তার তার এ-তাবৎকালীন ভাঙ্গা-চোরা জীবনের পটভূমিকায় অকল্পনীয়। ফলে সংসারেব এই সুখটুকুর সঙ্গে বড় সাধে সে নিজেকে জড়ায়।

কুয়াশা-মোড়া শীতের সকালের এক প্রত্যুষে শঙ্করার দরজায় একটি কণ্ঠস্বর — 'শঙ্করা, বাড়ী আছিস নাকি?'

বারান্দার কোণে যথারীতি রান্না-বান্নায় ব্যস্ত ছিল সুবালা, অপরিচিত আগন্তুকেব আকস্মিক আবির্ভাবে ত্রস্ত হয়, অভ্যাস-বশে এক চিলতে ঘোমটা টানে মাথার উপর।

ঘুম ভাঙলেও শঙ্করা ঘরের মধ্যে বিছানায় গুটি-সুটি শীত-সকালের আমেজটুকু উপভোগ করছিল তারিয়ে। উঠোনের উচ্চ কণ্ঠস্বরটি কর্ণ-গোচর হ'ল তারও, দ্রুত বেরিয়ে আসে ঘর থেকে, এবং আগন্তুক ব্যক্তিটিকে দেখে অতি-মাত্রায় বিহ্বল হয় সে।

পুলকিত বিস্ময় প্রকাশ পায় তার কণ্ঠে—'দাসমশায়, আপনি!'

মৃদু হাসে নিবারণ — 'হ্যারে শঙ্করা , আমি এলাম। তুই তো আসতে বলিস্ না কখনো। আমিই চলে এলাম। তা, এইভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব, বস্‌তে-টস্‌তে দিবি তো — না কি!

লজ্জিত শঙ্করা দ্রুত চাটাই বের ক'রে আনে ঘর থেকে, সযত্নে বিছিয়ে দেয় বারান্দায়— 'বসেন দাসমশায়, বসেন।'

নিবারণ দাস নামক এই মানুষটির ভূমিকা তার জীবনে যে কতখানি, সেটা শঙ্করা কখনো তলিয়ে দেখেনি, দেখবার কোনো প্রয়োজনীয়তাও কখনো ঘটেনি। কিন্তু তার জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে এই নিস্পর মানুষটি যে নিঃশব্দে গভীর একাত্মতা অনুভব করে, এটা অজানা নয় শঙ্করার। অধুনা যথেষ্ট বিত্তবান, আয়েশী জীবন, ফলে চলাফেরাও কিছু নিয়ন্ত্রিত, সেই দাসমশায় স্বেচ্ছায় উপযাচক হয়ে তার জীর্ণ বাড়ীতে এতখানি হেঁটে এসে উপস্থিত হয়েছেন, এটা অভিভূত করে

শঙ্করাকে। নিবারণকে বসতে দিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে বিনীত কুণ্ঠায়।

নিবারণ বলে — 'কদিন থেকে লোকের মুখে শুনছি, তুই নাকি তোর মাকে ফিরে পেয়েছিস্। তাই ভাবলাম, লোকের কাছে শুনে কি হবে, নিজেই তোর মার সঙ্গে আলাপ করে আসি। তা, দিদি কোথায় গেলে, ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবে না?'

শঙ্করা মায়ের চোখে চোখ রেখে মাকে কাছে ডাকে ইশারায়। লঙ্কা-হলুদ ছোপানো হাতখানা আঁচলের প্রান্তদেশে মুছতে মুছতে সসঙ্কোচে শঙ্করার পাশে এসে দাঁড়ায় সুবালা।

নিবারণের কণ্ঠে অকপট মমতা— 'বুঝলে দিদি, তোমার শঙ্করাকে আমিও খুব ভালবাসি। ও আমার ছেলের মতোই। তা, তোমরা মা-ছেলে দুজন দুজনকে ফিরে পেয়েছো, এ তো আনন্দের কথা! ঠাকুর তোমাদের সুখে রাখুন।'

সুবালার চোখ দুটি স্বভাবতঃই রোদন-প্রবণ। নিবারণের মনতা-সিক্ত কণ্ঠস্বরের প্রগাঢ়তা তার চোখকে স্বতঃই অশ্রুসিক্ত করে।—

নিবারণের হাতে ছিল এতদঞ্চলের বিখ্যাত বস্ত্র বিপণিটির নামাঙ্কিত একটি স্থূলাকৃতি প্যাকেট। সেটা সুবালার দিকে এগিয়ে দেয় নিবারণ — 'এটা তুমি নাও দিদি! এটা তোমার ভাইয়ের সামান্য প্রণামী।'

শঙ্করার কণ্ঠে কুণ্ঠা— 'এসব আবার কেন এনেছেন দাসমশায়!'

নিবারণের কণ্ঠে কপট ধমক— 'তুই থাম্‌তো ছ্যাম্‌ড়া, এটা আমাদের দিদি আর ভাইয়ের ব্যাপার, এর মধ্যে তুই নাক গলাতে আস্‌ছিস কেন?'

শঙ্করার ইঙ্গিতে নিবারণের হাত থেকে কাপড়ের প্যাকেটটি নেয় সুবালা।

নিবারণের কণ্ঠে স্নিগ্ধ প্রসন্নতা —'এবার চলিরে শঙ্করা, জানিস্ তো, গিয়ে দোকান খুলতে হবে, এমনিতেই দেরি হয়ে গেল।'

—'না না, — তা হয়না দাসমশায়। একটু কিছু মুখে না দিয়ে যেতে পারবেন না।'—

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে নিবারণ বলে — 'কি খাওয়াবি তুই? এখনই তো মিষ্টি আনতে দোকানে ছুটবি! মিষ্টি আমি খাইনা। তার চেয়ে একদিন ভাল ক'রে বাজার-টাজার কর্। দিদির হাতের রান্না খেয়ে যাব চেটে-পুটে।'

নিবারণ চলে যায়। ব্যস্ত মানুষটির এই আকস্মিক আগমন, মায়ের জন্য উপহার, অন্তরঙ্গ কথাবার্তা, —সব মিলিয়ে এক গভীর আবিষ্টতা আচ্ছন্ন করে শঙ্করাকে। এবং নিবারণের পাদ-স্পর্শে তার এই বাসস্থান, এই হতচ্ছাড়া ভিটেমাটিটুকু যেন পরম পবিত্র হ'ল এ-জাতীয় বোধ জন্মাল।

দিনভর কর্মকাণ্ডের অবসানে শঙ্করা ঘরে ফেরে। সারা দিন ঘর-গেরস্থালীতে মগ্ন থাকে সুবালা, তারপর সন্ধ্যা হলেই প্রতীক্ষারত থাকে শঙ্করার। শঙ্করার পোষা কুকুরটি সর্বদা গৃহাধিষ্ঠিত এই নতুন কর্ত্রীটিরও বর্তমানে সবিশেষ অনুগত। প্রতীক্ষায় সেও সর্বদা সুবালার অনুগামী থাকে। শঙ্করা ফিরে এসে হাত মুখ ধুয়ে খাওয়া শেষ করলে, তারপরে শঙ্করার পাতেই খেতে বসে সুবালা। ফলে রাত্রি অধিকতর গভীর হয়। এটি প্রতিদিনের রুটিন।

শঙ্করা একদিন মাকে বলেছিল — 'আমার ফিরতে কত রাত হয় মা। আর কদিন শীতও নেমেছে খুব। তুমি এত রাত পর্যন্ত আমার জন্য কেন না খেয়ে বসে থাকো? তুমি খেয়ে নিয়ে আমার ভাত ঢাকা দিয়ে রেখো।'

সুমিত হাসিতে উদ্ভাসিত সুবালার সংক্ষিপ্ত জবাব —'পাগল ছেলে, তুই না খালি কি আমি খাতি পারি?'

শঙ্করা এসব নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করেনা মাকে।

আজও খাওয়ার পরে বাঁশের মাচান্‌টির বিছানাটিতে ক্লান্ত দেহটাকে ন্যস্ত রাখে শঙ্করা। বারান্দায় মা খাচ্ছে। খাওয়া শেষে মা থালা-বাসন পরিষ্কার করবে, সযত্নে এঁটোমুক্ত করবে বারান্দাটিকে। ততক্ষণ শঙ্করাকে অবশ্যই জেগে থাকতে হবে। এই নিভৃত সময়টুকু একেবারেই শঙ্করার নিজস্ব, অকর্মক অবসরের নিচ্ছিদ্র আত্ম-কণ্ডূয়ণ। ফলে এই সময়টা নানাবিধ চিন্তা পাকে পাকে জড়ায়।

এতদিন ছিল নিঃসঙ্গ একক জীবন। বাধা-বন্ধনহীন, ফলে বেপরোয়া, স্বচ্ছন্দগতি । কিন্তু এখন মায়ের সান্নিধ্য যেন তাকে এক মায়ার টানে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে স্থিত করতে চাইছে। এদিকে পারিপার্শ্বিক জীবনেও নানাবিধ জটিলতার ক্রম-ঘনঘটা। সামাজিক, রাজনৈতিক—সমস্ত জগতের সঙ্গেই সে সম্পর্কহীন, নিজস্ব কর্মাদির গণ্ডীটুকুর মধ্যেই সে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সেখানেও সমাবেশ ঘটছে নানাবিধ জটিলতার। চাল-পার্টির মধ্যে নিত্য-নতুন মুখের আগমন ঘটছে, তৈরী হচ্ছে দল উপদল, ফলে স্বার্থের সংঘাতের সম্ভাবনা ঘটলেই সংঘর্ষের সম্ভাবনাও অবধারিত হয়ে উঠছে। এসব ভাবনা ইদানীং শঙ্করাকে পীড়িত রাখে।

তবে অতি-সাম্প্রতিকের যে সমস্যাটি তাকে দুর্ভাবনা-গ্রস্থ করেছিল, সেটির নিরসন ঘটেছে।

বিষয়টি হ'ল, নিবারণের সেই উড়ো চিঠিটা। দাসমশায়কে নির্ভাবনায় থাকার কথা বলেছিল বটে সেদিন যথেষ্ট জোর গলায়, কিন্তু বিপদের আগমন যথার্থই ঘটলে তা থেকে দাস মশায়কে কি ভাবে নিরাপত্তা দেওয়া যাবে, বা আদৌ দেবার সময় বা সুযোগ ঘটবে কিনা, এ চিন্তাটা তাকে ক্লিষ্ট রেখেছিল ভিতরে ভিতরে। কিন্তু সেটার নিরসন ঘটে অপ্রত্যাশিতভাবে।

দলের ঐ লেখাপড়া-জানা রাজনীতি-করা ছেলেটি— বরুণ যার নাম — স্টেশনের নিভৃতে তাকে গত পরশুদিন হঠাৎ বলে

—'শঙ্করাদা, একটা খবর শুনেছো?'

—'কি খবর কে?'

—'নিবারণ দাসের কাছে একটা উড়ো চিঠি এসেছে জানো?'

চমকিত হয় শঙ্করা। — 'তুই জানলি কি ক'রে?'

বরুণ হাসে —'আমাদেরও খবর জানার কিছু রাস্তা আছে। তবে তোমাকে একটা কথা বলি শঙ্করাদা। কথাটা কাউকে প্রকাশ করোনা। চিঠিটা নকশালদের নামে লেখা হয়েছে বটে, কিন্তু ওটা লিখেছে নিবারণ দাসেরই ছেলে পলাশ।'

অধিকতর চমকিত হয় শঙ্করা —'বলিস্ কি? এটা তুই জান্‌লি কি করে?'

—'তোমাকে বলতে আমার বাধা নেই শঙ্করাদা, কিন্তু এ-কথাটাও গোপন রেখো। পলাশদের পার্টির একটা ছেলে, বাইরে পলাশের খুব বন্ধু ব'লে ভাব দেখায়, কিন্তু গোপনে আমাদের পাটির সঙ্গে যোগ রাখে—ও-ই আমাদের খবর দিয়েছে। কথাটা কিন্তু তুমি গোপন রেখো শঙ্করাদা।'

চিন্তাক্লিষ্ট শঙ্করা শুধু বলেছিল —'ঠিক আছে।'

প্রাথমিক ভাবনায় শঙ্করা মনস্থ করেছিল, সংবাদটি দাসমশায়কে জানিয়ে দেয়। কিন্তু চিন্তার দ্বিতীয় ধাপ তাকে বোঝায়, কাজটা ঠিক হবে না। এ সংবাদে বিপদ-মুক্তির তাৎক্ষণিক আনন্দ হয়ত হবে দাসমশায়ের, কিন্তু পুত্রের এই বিট্‌কেলে রসিকতায় দাস-মশায়ের বুকে যে শেল বিদ্ধ হবে, সেটিও দাস-মশায়ের পক্ষে যথেষ্ট মর্মবেদনার কারণ ঘটাবে। সুতরাং বৃত্তান্তটি চেপে রেখে, অবস্থা যেমন চলছে, চলতে দেওয়াই সঙ্গত হবে। দাস মশায়ও চিঠি-সম্পর্কিত ভীতির ব্যাপারে ধাতস্থ হয়ে উঠবে ক্রমশঃ।

কিন্তু পারিপার্শ্বিকের সাম্প্রতিক জটিলতা তো ক্রমশঃ বহুমুখী। নিজে অক্ষর-পরিচয়হীন, কিন্তু নানা সূত্রে সাম্প্রতিক-রাজনীতি-জগতের সংবাদাদিও অগোচর থাকে না। 'মিসা' নামক একটি আইনের কথা এখন জন-মনে বহুল সম্প্রচারিত, কোনোরূপ কারণ না দর্শিয়েই সরকার-বাহাদুর নাকি যাকে খুশী তাকে যখন-তখন গ্রেফ্‌তার করতে পারেন, মর্জি-মাফিক কারারুদ্ধ রাখতে পারেন বিনা বিচারে। এবং এ-জাতীয় অপরাধীদের তালিকায় শঙ্করার মতো মানুষদের নাকি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে। ফলে, যে কোনোদিন, যে কোনো সময় শঙ্করার গ্রেফ্‌তার হয়ে যাওয়াটা বিচিত্র নয়। হীরুবাবুর সেই সতর্ক-বাণীও মনে পড়ে। ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক নেতা হীরুবাবু, শঙ্করার অনিষ্ট করার প্রকৃত ইচ্ছা থাকলে, হীরুবাবুর পক্ষে তা সহজসাধ্য।

নিজের জীবনের জন্য শঙ্করা-ভাবিত নয়, কিন্তু তার অভাগিনী মাকে নতুন ক'রে দুঃখ দিতে শঙ্করার মন সায় দেয় না। হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে মা তার বড় এক সুখের সন্ধান পেয়েছে। মার এই সুখের নীড়টুকু ভেঙে দিতে চায় না শঙ্করা।

এসব চিন্তা-ভাবনার মধ্যে বিন্তির ভাবনা স্বতন্ত্র একটি শ্যামল, সবুজ দ্বীপ-খণ্ডের মতো প্রতিভাসিত হয়।

কিছুদিন থেকেই বিন্তির আচার-আচরণ, কথাবার্তা, দৃষ্টিপাত —সব কিছুর মধ্যে যেন এক ভিন্নতর ব্যঞ্জনা অনুভব করে। ব্যাপারটি যে কি, তা সে ভেবে তল পায়না। তা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, ফলে তা স্বচ্ছতা স্পষ্টতা পায়না, শুধু অনুভবে তার কিছু ইঙ্গিত পায়। সাবাদিনের কর্ম-ব্যস্ততা — বাজারে চাল-কেনা, ট্রেনে তুলে কলকাতায় নেওয়া, বিক্রি-বাটা—এসবের মধ্যে নিরন্তর বিন্তির মধ্যেও রূঢ় ব্যবসায়িক বাস্তবতা, কঠোবতা শ্রমশীলতার অভাব নেই। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ কোনো এক নিরালা নিভৃতে বিন্তির চোখে-মুখে, দৃষ্টিপাতে, আচরণে, যেন ভেসে ওঠে অন্য কোনো কথা, অন্য কোনো রহস্যময়তা।

আজও যথারীতি দুজনে গভীর রাতে শেষ ট্রেনে ফিরে, স্টেশন অতিক্রম ক'রে, পিচ রাস্তা ছাড়িয়ে মেঠো রাস্তা এবং রাস্তাহীনতার অনুসারী হয়ে, শীতের হিম আর কুয়াশা গায়ে মেখে, পাশাপাশি হেঁটে এসেছে বিন্তিদের বাড়ী পর্যন্ত। মাঝে মাঝে ব্যবসা প্রাসঙ্গিক দু'চারটি বাক্যালাপ।

বিন্তিদের বাড়ীর কাছে এসে বিন্তি যখন প্রবিষ্ট হবে নিজের বাসস্থানে, আর শঙ্করা বাঁক নিয়ে এগিয়ে যাবে আরো দূরবর্তী নিজের বাসস্থানের অভিমুখে, তখনই যেন এক ঘোর-লাগা মানুষ, সেই নিশুতি রাত্রের অন্ধকারের মতো রহস্যময় যার আচরণ, শঙ্করার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় বিন্তি এক পলক। প্রগাঢ় মমতায় তুলে নেয় শঙ্করার চোয়াড় হাতখানা, অঞ্জলিবদ্ধ শিহরিত মুঠোয় জড়িয়ে রাখে, তারপর বুকভাঙা এক উদগত নিশ্বাসের ভাব নামিয়ে, ছেড়ে দেয় শঙ্করার হাতখানা, তারপর যেন এক ঝলক অপ্রতিরোধ্য দমকা হাওয়া, ঝটিতি অদৃশ্য হয়ে যায় নিজের ঘরের মধ্যে।

বিন্তির এ আচরণ বিহুল করেছিল শঙ্করাকে, বিমূঢ় দাঁড়িয়ে ছিল ক্ষণকাল, তারপর শ্লথ পায়ে রওনা হয়েছিল নিজস্ব গৃহের গন্তব্যে। বিন্তির আচরণের রহস্যময়তা তার অবশিষ্ট যাত্রাপথটুকু আচ্ছন্ন রেখেছিল।

অর্ধশায়িত শঙ্করা এসব ভাবনায় বুঁদ হয়ে ছিল।

বাইরের কাজকর্ম সাঙ্গ ক'রে ঘরে আসে সুবালা। ঘরের কোণে হারিকেনের শিখাটাকে কিঞ্চিৎ নিস্তেজ ক'রে নামিয়ে রেখে মেঝেতে নিজের বিছানা পাতার আয়োজন করে। শঙ্করাকে বলে—

—'ঘুমোস্‌নি বাবা শঙ্করা?'

— 'না মা, কিছু বলবে?'

—'ঐ যে ভদ্দরনোক আমারে সেদিন জামা-কাপড় দিয়ে গেল, উনি কেডা তা তো বল্লি নে।'

শঙ্করা এদিকে পাশ ফিরে শোয়।—

—'ওনার নাম নিবারণ দাস। আমি 'দাসমশায়' বলে ডাকি। অনেক দিন আমি ওনার বাড়ীতেই ছিলাম। বাজারে বড়ো দোকান আছে। খুব ভালো লোক মা।'

—'সত্যিই বড়ো ভালো নোকরে। আমার জন্যি কতো জামা কাপড় নিয়ে আইচে। আর কতো মায়া-মমতা। ঠাউর দেব্তার মতোন কথা কয়।'

ক্ষণকালীন বিরতি। পুনরায় কথা বলে সুবালা —

—'এট্টা কথা কই বাবা তোরে! এবার তুই এট্টা বিয়ে-বাবা কর্ বাবা।'

পরিবেশটাকে লঘু করার চেষ্টা করে শঙ্করা—

—'কেন ঝামেলা বাড়াতে চাইছো মা। বেশ তো আছি মা ছেলেতে! আর, তোমার এই হতচ্ছাড়া বোম্বেটে ছেলেকে কেই বা মেয়ে দেবে মা! লোকের কাছে তো আমি একটা গুণ্ডা ছাড়া আর কিছু নয়।'

—'নোকে কি ভাবে, তাতে তোর বয়ে গেছে শঙ্করা!'

আকস্মিক সুবালার কণ্ঠে স্তব্ধতা।

বাইরে শীতের রাত ক্রমশঃ গাঢ়তা পায়। জীর্ণ বেড়ার অজস্র রন্ধ্র-পথে গৃহাভ্যন্তরে হিমেল হাওয়ার স্বচ্ছন্দ যাতায়াত।

সুবালার কণ্ঠে আবার এক জিজ্ঞাসা—

—'তোরে একটা কথা বলবো বাবা শঙ্করা? বিন্তি মেয়েডাবে তোব কেমন লাগে? বড়ো নক্কী মেয়েডা!'

অন্ধকারেও যেন শঙ্করা তাকাতে পারে না মা'র মুখের দিকে। মা'র এই উক্তি যেন আকস্মিক আলোকিত ক'রে তুলেছে তার হৃদয়ের তলদেশের এক অন্ধকার স্তরকে। এক সংগোপন দুর্বলতার ক্ষেত্র অনাবৃত্ত হয়ে পড়ে আকস্মিক। মা'র চোখে কি ধরা পড়ে গেছে তার এই দুর্বলতাটি?

কিন্তু প্রকাশ্যতঃ শঙ্করা ব্যাপারটিকে যেন আমল দেয় না আদপেই।

—'এসবের মধ্যে আবার বিন্তির নাম কেন আসছে মা?'

—'এম্নিই কচ্ছিলাম। মেয়েডা বড়ো ভালোরে! তোর সাথে বেশ মানাতো!'

বিষণ্ণ এক বেদনার ভার কিছু সময় স্তব্ধ রাখে শঙ্করাকে।

বিন্তির নিবিড়-সান্নিধ্য, নির্ভরতা — সবই বড় প্রবল মাত্রায় শঙ্করার উপর। তবু বিন্তি যেন তার কাছে এক দূরতম দ্বীপ। কখনো তার সান্নিধ্যে হয়ত আসা যায়, কিন্তু সে দ্বীপ-ভূমির সর্বত্র স্বচ্ছন্দ বিচরণ তার সাধ্যাতীত । অজানা, রহস্যময়। উচ্চশিক্ষিত, পদস্থ চাকুরে, ভদ্রবংশ-জাত, অনিমেষ নামক সেই যুবাটির কথা মনে আসে, চালপার্টির মধ্যে যাকে কেন্দ্র ক'রে বিন্তিকে নিয়ে নানা রসিকতা প্রচলিত। এই অসম প্রতিযোগিতায় শঙ্করার স্থান কোথায়? বন্ধুতা, নির্ভরতা — এসবের ক্ষেত্রে বিন্তি হয়ত তার প্রতি অকৃপণ, কিন্তু ভালবাসা নামক বস্তুটি যে সেখানে একান্তই দুর্লভ, পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবা শঙ্করার এ বোধ অগম্য থাকে না।

অবশ্য ঐ ভালবাসা বস্তুটির প্রকৃত স্বরূপ কি, কোন্ লক্ষ্য-বিন্দুতে তার চূড়ান্ত সিদ্ধি, এসব অভিজ্ঞতা শঙ্করার নেই। কিন্তু বন্ধুতা আর নির্ভরতার সীমারেখা পর্যন্ত সে বিন্তির কাছে যত

সহজ গতিতে অগ্রসর হতে পারে, বা বিন্তিও তাকে স্বাগত জানায়, এর বাইরের কোনো জগতে বিন্তি যেন অপরিচিতা, হিমশীতল। বিন্তির সেই শীতলতার সীমারেখা অতিক্রম করার কোনো সুযোগ ঘটেনি শঙ্করার।

শুধু আজ বাড়ী ফেরার সময়ের সেই রহস্যময় আচরণটুকু ছাড়া বিন্তির চরিত্র তার কাছে স্বচ্ছ, জলবৎ পরিষ্কার, সেখানে আর যা কিছু থাক, ভালবাসার অস্তিত্ব যে নেই, শিক্ষা-দীক্ষাহীন অসংস্কৃত হয়েও এটুকু উপলব্ধি না করার মতো গাড়ল শঙ্করা নয়।

মা'র কথার জবাবে এসব উপলব্ধি এবার ভাষা পায় শঙ্করার কণ্ঠে

—'কি যা তা বলছ মা? এ-রকম ভাবনা তুমি আর ভেবোনা! জানো , বিন্তি লেখাপড়া-জানা মেয়ে, ওরা জাতে বামুন, ওর বাবা মাস্টার মানুষ। কত বড় বংশের মেয়ে! আব বিন্তিই বা আমাকে পছন্দ করবে কেন? কি আছে আমার?'

সুবালার বুকে ধূসরতা, দীর্ঘশ্বাসের ভার। শঙ্করার কথার স্পষ্ট কোনো জবাব জানা নেই। শুধু কদিন আগের এক চিত্র এবং কতিপয় বাক্য তার মনের মুকুরে বড় মায়াময় ভাসে।

শীতের প্রাত্যহিক কর্মব্যস্ততা ও কর্মহীনতার টানাপোড়েনে সুবালা কখন যেন বারান্দায় বিকেলের নরম রোদে ক্ষণিকের তন্দ্রায় ছিল আচ্ছন্ন। আকস্মিক এক আহ্বান তাকে চকিত করে —'মাসি আছো নাকি?'

ধড়মড় ক'রে উঠে বসে সুবালা।

বিন্তিকে দেখে সুবালার তন্দ্রা-জড়িত চোখে হঠাৎ আলোর রোশনাই। সুবালার অসুখের সময় বিন্তি অনুভা মালতীদের দলটির এ বাড়ীতে আগমন কোনো দিন-ক্ষণের অপেক্ষা রাখত না। কখনো একক, কখনো সমবেতভাবে, সময়ে অসময়ে যাতায়াত করেছে, সুবালার সেবা, যত্ন করেছে।

কিন্তু সুবালা সুস্থ হয়ে উঠলে যাতায়াতটা যেখানে প্রয়োজন-বোধে তাড়িত নয়, ওদের আসাটা হ্রাস পেয়েছিল ক্রমশঃ। তাই বেশ কিছুদিন বাদে, অসময়ে, এমন অতর্কিতে বিন্তির আগমনে বড়ই পুলকিত হয় সুবালা। ওদের সব ক'টি মেয়েকেই সুবালা গভীর প্রীতির চোখে দেখে, কিন্তু বিন্তির প্রতি টানটা যেন কিছু বেশী। ধীরে স্থির নম্র মেয়েটি। চেহারাটিতেও সহজাত একটি দীপ্তি, যা দৃকপাতেই দৃষ্টিকে আবদ্ধ করে।

বিন্তির অবয়বে আজ হালকা প্রসাধনের চিহ্ন।

বিন্তিকে দেখে ত্রস্তে উঠে দাঁড়ায় সুবালা। চাটাই পেতে দেয়—

— 'এসো মা বসো। তা, এই অবেলায় কি মনে ক'রে?'

— 'কেন মাসি, আসতে নেই বুঝি?'

— 'দ্যাখো দেখি মেয়ের কথা! তোমরা যদি না আসতে, আর আমার দেখাশোনা না করতে, তাহলি তো কবেই আমি যম-রাজার বাড়ী চলে যাতাম। তোমাদের কল্যেণে আমি আমার হারানো মাণিক শঙ্করাকে ফিরে পাইছি!'

স্মিত প্রসন্ন হাসিতে বিন্তি সুবালার কথা শোনে।

সুবালা বলে— 'তা মা, তুমি আজ কাজে যাওনি?'

— 'না মাসি, শরীরটা তেমন ভাল লাগছে না। আজ যাইনি। সারাদিন প্রায় শুয়েই ছিলাম।

বিকেলে ভাবলাম, যাই একবার মাসিকে দেখে আসি। তা, শঙ্করাদা তো বোধহয় সকালেই বেরিয়ে গেছে।'

— 'হ্যারে মা, শঙ্করা তো সেই কোন্ ভোরেই বারোয়ে গেছে। দিনরাত খালি টো-টো ক'রে ব্যাড়ায়।'

—'তুমি শঙ্করাদারে খুব ভালবাসো, তাই না মাসি?'

— 'মেয়ের কথা শোনো! ছেলেমেয়েরে মা ভালবাসবে, এ আর নতুন কথা কি! তোমার মা-ও তোমারে ভালবাসে।'

— 'না মাসি, আমার মা আমাকে একটুও ভালবাসে না।'

— 'দূর পাগলী, তাই আবার হয় নাকি?'

— 'ঠিকই মাসি! আমার মা আমারে একটুও ভালবাসে না। কি ক'রে ভাল বাসবে বলো! আমার মা-টা তো সেই কবেই ড্যাং-ড্যাং ক'রে চলে গেছে।'

বিস্তির লঘু আলাপ-চারিতায় সুবালা হাসতে যাচ্ছিল। কিন্তু বিস্তির মাতৃহীনতা ওর মনকে দ্রব করে। এগিয়ে এসে লঘু বেষ্টনে বিস্তিকে জড়িয়ে ধরে বলে — 'আহারে মা আমার!'

সুবালার আন্তরিক মমতাটুকু স্পর্শ করে বিস্তিকে। সুবালার দুই বাহুর বেষ্টনে শিশুর মতো সমর্পিত রাখে নিজেকে। অন্তর্গত অবরুদ্ধ বেদনা আর ভাবনার স্রোত আকস্মিক যুগপৎ তাকে প্লাবিত করে —

— 'মা তো কবেই চলে গেছে মাসি! বাবার শরীরও ভাল না। বাবা চলে গেলে আমার যে কি হবে মাসি! কোথায় গিয়ে যে দাঁড়াব!'

সুবালা যেন আকস্মিক নির্ভরতার এক কেন্দ্রমূলে অবস্থিত হয় — 'ভয় পাস্নে মা, শঙ্করা তোরে দেখবে।'

—'শঙ্করাদার জোরেই তো এতোদিন টিকে আছি মাসি! শঙ্করাদা না থাকলে এতদিন কবে না খেয়ে মরে যেতাম। নয়ত শেযাল শকুনে টেনে ছিঁড়ে খেতো। দুই হাত দিয়ে আগলে রেখে শঙ্করাদাই তো এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে আমাদের বাপ মেয়েকে।'

— 'তাহ্লি ভয় পাচ্ছিস্ কেন মা! শঙ্করাই তোদের দেখবে।'

সুবালার একান্ত ঘনিষ্ঠতায় লিপ্ত থাকে বিস্তি। আত্মগত এক উচ্চারণ ভাসে তার কণ্ঠে।

—'পরের ঘাড়ে বোঝা হয়ে আমি আর কদ্দিন থাকব মাসি! শঙ্করাদা আমার কে? কেন সে আমার জন্য এত করতে যাবে?'

বিস্তির অজান্তেই দু'ফোঁটা অশ্রু চোখের কোণ বেয়ে প্লাবিত করে তার গণ্ডদেশ। সেই দু'ফোঁটা অশ্রু অকস্মাৎ যেন বিস্তির এক নতুন পরিচয় উদঘাটিত করে সুবালার কাছে। এক নারী যেন সন্ধান পায় অন্য নারীর গোপন মনের এক রহস্য-কেন্দ্র।

সুবালা ধীরে ধীরে বিস্তির মাথায় হাত বুলোয়। বলে—'শঙ্করারে তুই অন্য চোখে দেখিস, তাই না মা!'

অকস্মাৎ উঠে দাঁড়ায় বিস্তি। দৃপ্ত এক ফণিনীর তেজ যেন তার সর্বাঙ্গে। যেন এক ঘোরে—পাওয়া মানুষ।

— 'আমি কিছু জানিনা মাসি — আমি কিছু জানিনা! আমার মনটারে নিয়ে আমার বড়ো ভয়!'

ক্ষণ-পরেই বিস্তি যেন আবার স্বাভাবিক, প্রকৃতিস্থ। ক্ষিপ্র চটুলতায় এগিয়ে এসে সুবালাকে

জড়িয়ে ধরে বলে —'দ্যাখো দেখি কি কাণ্ড মাসি! আমাকে কি এসব কথা মানায় নাকি? আমি হলাম গিয়ে চাল-পার্টির ডাকসাইটে মেয়ে বিস্তি। আমার চোখে ছিচ্ কান্না! ছিঃ!'

হাসি এবং কান্নার দ্বৈত তরঙ্গে খান্ খান্ বাজে বিস্তির কণ্ঠ। এবং ঝটিতি সুবালাকে ছেড়ে দিয়ে নেমে আসে রাস্তায়।

এখন এই নিশুতি রাতের স্তব্ধতায়, শঙ্করার কথাব জবাবে, সেদিনের সেই নিরালা মুহূর্তের বিস্তি আর তার কথাগুলো বড়ই অর্থময় মনে হয়। সেই অর্থময়তার সূত্র আবিষ্কার করতে গিয়ে সুবালা থই পায়না, এবং ক্রমশঃ যেন এক জটিলতায় জড়াতে থাকে।

অবশেষে গভীর রাত্রির সেই নিস্তব্ধতায় স্নিগ্ধ এক মায়াময় উচ্চারণ শোনা যায় সুবালার কণ্ঠে—

—'এট্টা কথা তোরে কই বাবা শঙ্করা—। ও মেয়েডা যদি কোনোদিন তোর কাছে আসে, তুই ওরে ফেলিস্ না। বড়ো দুক্কী মেয়ে। কিন্তুক, ওর মনডা তোর কাছেই বাঁধা আছেরে!'

।। আঠারো ।।

উমাপতি এখন বহুলাংশে সুস্থ। প্রাণশক্তিতে প্রাচুর্য না থাকলেও, আধি-ব্যাধির বালাই থেকে কিছুটা মুক্ত। শীতেব সমাগমে রুক্ষতা সত্ত্বেও বার্ধক্যের মধ্যেও কিঞ্চিৎ সজীবতা। ফলে প্রাত্যহিক দিনযাত্রা অনুযায়ী ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বিস্তি গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলে, জাড্য উমাপতিকে তেলচিটে বিছানাটার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারেনা।

ঘরের চারপাশের নিজস্ব ভূখণ্ডটিতে এলোমেলো বিচরণ করেন উমাপতি, পূর্ববঙ্গীয় চারিত্রিকতায় ছোটো একটি খুরপি নিয়ে কখনো ঘাস নিড়োন, লাউ পালং বেগুন ফলানোর চেষ্টা করেন, কখনো বারান্দার পাশ ঘেঁষে গাঁদা ফুলেব উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পরিবেশটিতে সজীবতা দানে উৎসাহী থাকেন। নিঃসঙ্গ একক জীবনেব দিন তার অতিবাহিত হয় এভাবে।

বিস্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তা তাকে অবশ্যই কুরে কুরে খায় প্রতি মুহূর্তে, কিন্তু কালগতি সব কিছুতেই আনে সহনশীলতা, মানুষকে যা ধৈর্যশীল হতে শেখায়। উমাপতির সাম্প্রতিক জীবন-যাত্রাতেও এসব নিয়ম প্রতিফলিত।

কিন্তু বিস্তির সঙ্গে অধুনা তিনি এক ধরনের ব্যবধান অনুভব করেন। আঠারো বছরের স্বাস্থ্যবতী বিস্তির শরীরে ভরাট পূর্ণতা, যা তার চেহারায় একটি রাশভারী গাম্ভীর্য এনেছে, এবং সর্বোপরি, বিস্তির মানসিকতাতেও সঞ্চারিত হয়েছে একটি ধীর স্থির গম্ভীর ব্যক্তিত্ব, যাকে উমাপতি সমীহ করতে শুরু করেছেন নিজের অজান্তেই।

পিতা হয়েও মেয়েকে ভরণ-পোষণেব নিরাপত্তা দিতে পারেননি, উপযুক্ত বয়সেও মেয়েকে পাত্রস্থ করতে পারেননি, এ ব্যাপারটি তার মধ্যে জন্ম দিয়েছে এক ধরনের অপরাধবোধের। তার মধ্যে মেয়ের এই বয়সোচিত গাম্ভীর্য, বর্হিকেন্দ্রিক জীবন-সংগ্রামের পুরুষালী মনোভাব— ইত্যাদিতে উমাপতি এবং তার কন্যাটির মধ্যে যেন একটি শীতল ব্যবধান রচিত হচ্ছে।

বেশ কিছুটা বেলা থাকতেই সেদিন বাড়ী ফিরে এলো বিস্তি। এক হাতে গুটিয়ে শক্ত ক'রে বাঁধা চাল-বহনকারী পৃথুল আকারের কয়েকটি শূন্য বস্তা, অন্য হাতে একটি বাজারের থলি। দৃষ্টিপাতেই বোঝা যায়, থলিটি বিবিধ সামগ্রীতে পূর্ণ।

মেয়ের এই অসময়ে প্রত্যবর্তনে ভ্রূ কুঞ্চিত হ'ল উমাপতির, চিন্তা দেখা দিল মেয়ের সুস্থতা

সম্পর্কে। কিন্তু কন্যার উপার্জন-লব্ধ অন্নে নির্ভরকারী পিতা, কন্যার মন-মেজাজের খবর না নিয়ে উটকো কোনো প্রশ্ন করতেও সাহসী হলেন না।

কিন্তু বিন্তিই বারান্দার কোণে হাতের বোঝা নামিয়ে বাবার পাশে এসে দাঁড়ায়। বলে—

— 'কি যে দিনরাত ছেলেমানুষের মতো মাটি-চুটি হাতড়ে বেড়াও বাবা, এ-রকম করলে কিন্তু আবার শরীর খারাপ হবে।'

মেয়ের প্রশ্রয়ে আশ্বস্ত হন উমাপতি। খুরপি নামিয়ে, হাতের ধুলোমাটি ঝেড়ে ভদ্রস্থ হতে সচেষ্ট হন। বিন্তির দিকে তাকিয়ে একটু লাজুক হাসেন।

— 'না রে মা, তোর এ বুড়ো ছেলের এটুকু ধুলো-মাটি হাতে লাগলে কিছু শরীর খারাপ হবে না। দেশ বাড়ীতে যখন ছিলাম, এ-রকম কত সব্জী বানিয়েছি জানিস্?'

বাবার কথায় বিন্তিও হাসে—'তুমি আর তোমার দেশের কথা এখনো ভুলতে পারলে না বাবা!'

—'জন্মদেশের মাটির টান রক্তের সাথে মিশে থাকেরে মা। তা কি সহজে ভোলা যায়! — তা, তুই আজ এত সকাল সকাল চলে এলি? শরীর ভালো আছে তো?'

— 'হ্যাঁ বাবা, শরীর ভালো আছে। ইচ্ছে করেই আগে চলে এলাম। রোজ তো সেই সাতসকালে বেরিয়ে যাই, আর কোন্ রাতে ফিরি। ছাই-পাঁশ যা রেঁধে রেখে যাই, তাই তো খেয়ে নাও। আজ আমি রান্না করে নিজে তোমাকে পাশে বসে খাওয়াব। তুমি কই মাছ ভালবাসো। বড়ো বড়ো কই মাছ এনেছি। নতুন ফুলকপি এনেছি, চই দিয়ে কেমন জুতসই রাঁধি দেখবে।'

চোখের চার পাশে তন্তুগুলোতে অদম্য এক প্রদাহ অনুভব করেন উমাপতি এবং নিমেষেই তার চোখ দু'টি সজল হয়। দারিদ্র্য-অক্ষমতা, কন্যার উপার্জন-নির্ভর দিন-যাপনের গ্লানি, সে জল-ধারায় প্লাবিত হয়ে যায়। বাবার সেই প্লাবিত দৃষ্টিপথে ক্ষণ-মাত্র দৃষ্টি রেখেই নতমুখী হয় বিন্তি, দাঁতের ফাঁকে কঠিন অর্গলে আবদ্ধ রাখতে প্রাণপণে সচেষ্ট হয় ওষ্ঠদুটিকে।

দেওয়ালী উপলক্ষে এতদঞ্চলে যে বিভিন্ন নক্ষত্র-সমাবেশে বৃহৎ জলসাটি আয়োজিত হয়েছিল, স্থানীয় বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হীরুবাবু ছিলেন যার নেপথ্য-প্রধান-পৃষ্ঠপোষক এবং মদতকারী, যাকে ঘিরে পলাশ এবং উঠতি মস্তান-সম্প্রদায় দেশ-সেবার একটি সুমধুর তরলিত সর্ট-কাট বাস্তা আবিষ্কার ক'রে, জান লড়িয়ে দিতে ব্যস্ত ছিল, —তা অনিবার্য কারণেই কিঞ্চিৎ বিলম্বিত হ'ল।

অনিবার্য কারণটি আর কিছুই নয়, খ্যাতনামা নক্ষত্রদের একত্র সমাবেশ ঘটানোর কিছু বিঘ্ন ঘটছিল। যদিও জলসার উদ্যোক্তাদের আর্থিক সচ্ছলতার ঘাটতি ছিল না, তবুও এসব নক্ষত্র-শিল্পীরা যেহেতু অত্যধিক জনপ্রিয় এবং বহু পূর্বেই যোগাযোগ না করলে 'ডেট' পাওয়াই মুশকিল, সেহেতু জলসার চূড়ান্ত দিনটি স্থিরীকরণে বিলম্ব ঘটল।

অবশেষে মধ্যশীতের একটি আমেজী রাত্রে আয়োজিত হ'ল অনুষ্ঠানটি।

রেলওয়ে স্টেশন-সংলগ্ন বিশাল মাঠটি অনুষ্ঠানের কেন্দ্রস্থল। সুদৃশ্য, প্রশস্ত মঞ্চ। মঞ্চের পাশে ভি. আই. পিদের বসার স্থান। সারা মাঠ জুড়ে আম-জনতার বসার জন্য ত্রিপল বিছানো। ভারত-খ্যাত বেশ কয়েকজন সঙ্গীত-শিল্পীর আগমনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, ফলে আম-জনতার বসার স্থানটি যেমন ভিড়ে ঠাসা, তেমনি ভি. আই. পিদের আসনে কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা এবং স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীও সমবেত হয়েছেন। স্থানীয় প্রভাবশালী নেতা এবং উদ্যোক্তাদের প্রধান হিসেবে অবশ্যই বিশিষ্ট একটি আসন অলঙ্কৃত ক'রে রয়েছেন হীরুবাবু।

রাত দশটা নাগাদ অনুষ্ঠান শুরু হ'ল। সমস্ত রাত্রি-ব্যাপী অনুষ্ঠান। এগারোটা বাজতেই আসর জমাটি আকার ধারণ করল।

হিন্দী চলচ্চিত্র-সঙ্গীত-জগতের এক বিশিষ্ট শিল্পী তখন সঙ্গীত পরিবেশন করছেন। যাঁর সঙ্গীতে তো বটেই, দর্শনেও আম-জনতার অপরিসীম আগ্রহ। ফলে এতদঞ্চলের মফস্বলীয় জীবন-বৃত্তে বিশাল মাঠটিতে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ ধৈর্য এবং পুলকসহ সাগ্রহে উপবিষ্ট। বিশিষ্ট সঙ্গীত-শিল্পীর এক একটি সঙ্গীত শেষ হতেই হাততালি এবং আর একটি সঙ্গীতের জন্য সহর্ষ অনুরোধ।

মাঝে মাঝেই উদ্যোক্তাদের পরিবেশের সঙ্গে মানানসই গম্ভীব ঘোষণা —'আপনারা কোনো শিল্পীকে বেশী গান গাইবার জন্য অনুরোধ করবেন না। আমাদের আরো অনেক শিল্পী অপেক্ষা ক'রে আছেন। তাদের আসরে আসার সুযোগ ক'রে দিন।'

আপ-এর একটি ট্রেন এসে থামল স্টেশনে। যাত্রীদেব ওঠা-নামার কোলাহল, গুঞ্জন — ট্রেন চলে যেতেই আবার স্তব্ধতা। বিশিষ্ট সঙ্গীত-শিল্পীর কণ্ঠের অপরূপ সুরের ঝর্না-ধারা তখন শক্তিশালী মাইক-সংযোগে আকাশ বাতাস পরিপার্শ্ব ধুইয়ে দিচ্ছিল।

এই ট্রেনেই নেমেছিল বিস্তি এবং শঙ্করা। কলকাতার কাজেব পাট সাঙ্গ ক'বে এবার ঘরে ফেরাব পালা। দীর্ঘদিনেব প্রস্তুতি এবং সাড়ম্বরে আয়োজিত এই জলসাটির সম্পর্কে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না, ববং পলাশ এবং সম্প্রদাযেব সম্পৃক্তি তাদেব এই জলসাটি সম্পর্কে বিতৃষ্ণ রেখেছিল।

কিন্তু ট্রেন থেকে নেমেই অভিভূত হল বিস্তি। তার বুকের গভীরে যে চাপা-পড়া সঙ্গীত-পিপাসু সত্তাটি ছিল, তা আমূল নাড়া খেলো অবিলম্বে। বাতাসে ভাসমান অনুপাম সুর-প্রবাহ আচ্ছন্ন করল তাকে।

ঘবে ফেরার অভ্যস্ত রাস্তার পরিবর্তে রেল লাইনের বিপরীতে জলসার স্থানটির দিকেই সে পা বাড়াল।

বিস্তির এ আচরণে কিছু বা বিরক্ত শঙ্করা। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্তি আর অবসাদ শরীরে —'কি হ'ল, ওদিকে চললে কোথায়?'

অবসাদ আর ক্লান্তি ছাপিয়ে বিস্তির দু'চোখে যেন এক বিহ্বল উচ্ছলতা — 'দারুণ গাইছে! চলোনা শঙ্করাদা, একটুখানি শুনে যাই।'

বিস্তির মুগ্ধতা স্পর্শ করে শঙ্করাকে। সে নিরুত্তর থাকে, কিন্তু পায়ে পায়ে অনুসরণ করে বিস্তিকে।

শ্রোতাদের প্রান্তদেশে গিয়ে দাঁড়ায় বিস্তি এবং পরস্পর-সংলগ্ন মানুষ জনের ফাঁক-ফোকর গলিয়ে বহু বাঞ্ছিত শিল্পীকে এক ঝলক দেখার জন্য সচেষ্ট হয়। সে চেষ্টা যথেষ্ট পরিমাণে ফলবতী না হলেও, শিল্পীর মহিমময় সুর-ধারা ক্রমশঃই অবিষ্ট করছিল তাকে। স্থান-কাল, ঘরে-ফেরার তাড়া, এমন কি শঙ্করার উপস্থিতি, যেন সে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছিল।

এমতাবস্থায় ঘন্টাখানেক কাটলে শঙ্করাই এবার তাড়া লাগায়।

'হয়েছে, এবার চলো।'

যেন এক সম্মোহন থেকে জেগে ওঠে বিস্তি। বুকের গভীর থেকে একটি দীর্ঘশ্বাসের ভার নামিয়ে বলে।

—'হ্যা, চলো যাই।'

জলসার মাঠ ছাড়িয়ে কিছু এগিয়েই পিচের রাস্তা। এদিকটা অপেক্ষাকৃত নির্জন এখন। কদাচিৎ দু' একজন পথচারী। স্টেশন-প্লাটফর্মের এ-প্রান্তে রাস্তার উপর সারি সারি বেশ কয়েকটি মোটর গাড়ী। বিস্তি এবং শঙ্করা স্থানটি অতিক্রম করতেই এ-পাশে একটি মোটর গাড়ীর গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষমাণ কয়েকটি মনুষ্য-মূর্তির মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল।

পলাশ এবং তার কয়েকটি শাগরেদ। সব কটিই যে সুরামত্ত, দৃষ্টিমাত্রেই তা অনুমান করা যায়।

পলাশের জড়িত কণ্ঠস্বর—'শঙ্করা গেল না? সঙ্গে সেই মালটা মাইরি।'

পাশে এক শাগরেদের অধিকতর বেসামাল বিজড়িত কণ্ঠ — 'হ্যাঁ মাইরি, ঠিক দেখেছো! তুমিও দেখেছো, আমিও দেখেছি।'

আকস্মিক যেন পলাশের মত্ততা কেটে যায়। কিম্বা অন্যবিধ কোনো শক্তিশালী মত্ততা তাকে গ্রাস করে।

মোটর গাড়ীটায় উঠতে উঠতে বলে — 'চল্, সবাই গাড়ীতে ওঠ্। মাগীটাকে আজ খেল্ দেখাব।'

পিচ রাস্তার মসৃণতায় শঙ্করা আর বিস্তি এগিয়ে যায় বেশ কিছুটা। তার পরেই ডান দিকে নেমে যায় তাদের নির্দিষ্ট মেঠো রাস্তা। যাত্রা-পথে শঙ্করা মাঝে মাঝে দু'একটি কথা বলে। কিন্তু কিছুই যেন আজ কর্ণগোচর হয়না বিস্তির। কিছু আগে শোনা সেই সুরের গুঞ্জন তার শ্রবণ-পথের সবটুকু যেন আড়াল ক'রে রাখে আর তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে এক সীমাহীন মুগ্ধতা।

অকস্মাৎ ওরা সচকিত হয়ে লক্ষ করে, তীব্র আলো ছড়িয়ে পিছন দিক দিয়ে অমসৃণ রাস্তায় সবেগে ছুটে আসছে একটি মোটরগাড়ী। ওরা দ্রুত সঙ্কীর্ণ রাস্তার একপাশে নেমে সরে দাঁড়ায়। গাড়ীটি বিস্তর ধুলো উড়িয়ে বাঁ দিকের অসমতল রাস্তা ধ'রে এগিয়ে গেল।

বিস্মিত হ'ল শঙ্করা। — এ-রাস্তায় এত রাত্রে মোটর গাড়ী! অবশ্য ক্ষণপরেই দ্বিতীয় ভাবনা তাকে আশ্বস্ত করল। ওদিকে একটি ইঁটের ভাঁটি আছে, মালিক বিস্তর অর্থবান, মোটর গাড়ীর মালিক, তিনি রাত-বিরোতে গাড়ী হাঁকিয়ে এ-রাস্তায় মাঝে মাঝে যাতায়াত করেন। এটা অবশ্যই সেই গাড়ী।

বিস্তিদের বাড়ীর কাছে এসে যথারীতি থমকে দাঁড়ায় শঙ্করা। চারিদিক নিস্তব্ধ । শুন্‌শান্ অন্ধকার। অন্যদিনের তুলনায় রাত্রি আজ আরো বেশী গভীর। সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রগাঢ় দৃষ্টিতে শঙ্করা তাকায় বিস্তির দিকে। সে দৃষ্টির সমান্তরালে এসে মিলিত হয় বিস্তির দৃষ্টি। গভীর আবেগে শঙ্করা দুই করতলে টেনে নেয় বিস্তির হাত দু'টি। সঞ্চারিত উত্তাপে মৃদু চাপ দিয়েই ছেড়ে দেয়।

স্নিগ্ধ উচ্চারণে বলে —'বাড়ী যাও।'

অতঃপর ডানদিকের সুড়ি পথের আস্তীর্ণ অন্ধকারে মিলিয়ে যায় শঙ্করা। এই অন্ধকার পথে তাকে একা যেতে হবে আরো অনেকটা দূরত্বে।

বাড়ীর মধ্যে ঢোকে বিস্তি। চারিদিকে গভীর অন্ধকার। শূন্যতা। প্রতিদিনই এ-সময় এই শূন্যতাটুকু সে অনুভব করে। শঙ্করা যতক্ষণ সঙ্গে থাকে, কোনো অন্ধকার তার অন্ধকার মনে হয় না, কোনো শূন্যতা তাকে স্পর্শ করেনা। কিন্তু শঙ্করা চলে যাবার পর মুহূর্তেই যে কী দুঃসহ

মনে হয়। চারিদিকের নিঃসীম অতল অন্ধকারের সবটুকু যেন তাকেই গ্রাস করার জন্য অধিকতর ঘনীভূত হয়।

শারীরিক উন্নতিতে ইদানীং উমাপতির নিদ্রাবেশেও কিছু উন্নতি ঘটেছে। গভীর নিদ্রায় তিনি মগ্ন এখন। ফলে পারিপার্শ্বিকের স্তব্ধতা বিঘ্নিত হবার দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো কারণ ছিলনা।

প্রগাঢ় শীত, নিবিড় স্তব্ধতা এবং কালিমাখা হারিকেনের ক্ষীণ আলোর পরিপ্রেক্ষিতে বিন্তি রুটিন-মাফিক কাজগুলো সাঙ্গ করে চলল। খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে, স্থানটিকে এঁটো মুক্ত ক'রে, উঠোনের ও-প্রান্তে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ স্থানটিতে এগিয়ে গেল হাত মুখ ধোবার জন্য। এই শীত-রাত, স্তব্ধতা, এবং খানিক আগে শোনা বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পীর অনুপম কণ্ঠস্বর এখনো এক আশ্চর্য মোহময় আচ্ছন্নতা নির্মাণ করে রেখে ছিল তার মনে। গভীর রাত্রি-নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা ইত্যাদি সম্পর্কিত কোনো সতকর্তা-বোধ সম্পর্কে তার মন ছিল অসচেতন।

ফলে ঘরের পিছনের ঝোপ ঝাড়, অন্ধকার, জোনাকি আর ঝিঁঝিঁপোকার ইতস্ততঃ বিচরণের মধ্যে কয়েকটি সতর্ক পদ-বিক্ষেপ ক্রমশঃ যে বিন্তির নিকটবর্তী হচ্ছিল, তা ছিল তার একান্ত অগোচর।

নিমেষে দু'টি সবল হাত বিন্তির মুখ এবং গ্রীবাদেশ বেষ্টন করল। বস্ত্র-খণ্ডের কঠিন বাঁধনে টুঁ' শব্দ উচ্চারণেরও সুযোগ পেলোনা তার কণ্ঠস্বর। আরো কয়েকটি সবল কঠিন হাত বিন্তির হাত-পায়েও পোক্ত বাঁধন জড়িয়ে দিল।

এ-ধরনের আকস্মিক আক্রমণের জন্য বিন্তি যেহেতু ছিল একেবারেই প্রস্তুতিহীন, কিম্বা এই বেপরোয়া উচ্চণ্ড সঙঘবদ্ধ পশুশক্তির অতর্কিত আক্রমণে বিন্তির মতো একটি মেয়ে-মানুষের পক্ষে প্রতিরোধের সকর্মক ভূমিকা প্রায় অসম্ভব, তবু বিন্তি আক্রমণের প্রাথমিক হত-চেতনা কাটিয়ে হাত পা ছুঁড়ে প্রবল প্রতিরোধের চেষ্টা চালাল।

কিন্তু পশুশক্তির মিলিত প্রচেষ্টায় অচিরেই কাবু হ'ল বিন্তি। মাথায় একটি নির্মম আঘাতে সংজ্ঞা হারাল। এবং সেই পুরুষ জান্তব হাতগুলো তাকে বহন ক'রে নিয়ে গেল অনতিদূরে নির্জন মেঠো রাস্তার পাশে দাঁড় করানো মোটর গাড়িটিতে।

কালো রাত্রির অন্ধকার বুক চিরে গাড়িটি দ্রুত ছুটতে লাগল অধিকতর অন্ধকারের দিকে।

স্টেশনের মাঠটিতে তখন স্তব্ধ মুগ্ধ শ্রোতাদের সামনে দরদী শিল্পীর কণ্ঠ সুরের মায়াজাল বিস্তার করছিল বহুল-প্রচারিত একটি সঙ্গীতের বাণীকে কেন্দ্র ক'রে —' তোমার ভুবনে মাগো' এত পাপ/একি অভিশাপ/ নাই প্রতিকার।'

প্রবল বায়ু-তাড়িত শুকনো পাতার মতো খবরটি ব্যাপ্ত হ'ল এতদঞ্চলে। উমাপতি মাষ্টারের মেয়ে বিনতা ওরফে অধুনা চাল-পাটির বেপরোয়া মেয়ে বিন্তি নিখোঁজ— এটি অবশ্যই একটি মুখরোচক সংবাদ। একে নারীঘটিত ব্যাপার, তার উপরে বিন্তির মতো একটি মেয়ে। ফলে নানাবিধ পল্লবিত আকার নিয়েই সংবাদটি প্রচার লাভ করল।

উমাপতির ঘুম ভেঙেছিল একটু বেলাতে। উমাপতির শয্যাত্যাগের অনেক আগেই বিন্তির প্রাত্যহিক কৃত্যাদি শুরু হয়ে যায়। রান্নার আয়োজন, বাবার চা জল-খাবার বানানো—ইত্যাদি। সেই অভ্যস্ত প্রাত্যহিকতার সম্ভাবনা নিয়েই ঘুম ভেঙে শীতের আমেজে বিছানায় অপেক্ষমাণ ছিলেন উমাপতি। কিন্তু কিছু বাদেই টের পান বিন্তির অনুপস্থিতি। সন্ত্রস্ত পায়ে উঠে আসেন বিছানা

ছেড়ে, ঘরে বারান্দায় ইতিউতি খোঁজেন, উঠোনে নেমে আসেন এবং হঠাৎই উঠোনের কোণে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত এঁটো থালা-বাসনগুলো দৃষ্টিগোচর হয়।

পারিপার্শ্বিক পরিবেশে এক শ্রীহীন শূন্যতা হঠাৎই যেন উদ্‌ঘাটিত হয় উমাপতির চোখে।

অনুচ্চ কণ্ঠে কয়েকবার ডাকেন — 'বিন্তি, ও বিন্তি—'

কোনো প্রত্যুত্তর নেই। প্রত্যুত্তরের কোনো সম্ভাবনাও দেখেন না উমাপতি। তার কণ্ঠস্বর এবার তীব্র এক হাহাকারের মতো বাজে —'বিন্তি — বিন্তিরে—'।

পরমুহূর্তে আবার সেই স্তব্ধতা।

বিষম এক বুক-চাপড়ানো আর্তনাদে তখন বিধ্বস্ত উমাপতি ভেঙে পড়েন উঠোনের মাঝ-খানে। সে আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হয় সন্নিহিত বৃক্ষ তৃণ তরু লতা গুল্মে। এবং প্রতিবেশীদের কানেও। অতঃপর ভিড়, গুঞ্জন, কৌতূহলী প্রশ্ন, সন্ধানের সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা—ইত্যাদি।

দুপুর নাগাদ পল্লবিত সংবাদটি সম্প্রচারিত হয়ে গেল চালপার্টির লোকদের মধ্যেও। হাতের কাজ স্থগিত রেখে সবাই ছুটে এলো প্রবল উৎকণ্ঠায়। ফলে বিস্তর লোক-সমাগম ঘটল উমাপতির বাড়ীটাকে ঘিরে।

ভোরেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল শঙ্করা। সকালের লোকাল ট্রেনটিতে এক খেপ চাল কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে আপ ট্রেনে এখানে ফিরে এসে বাজারে ঢুকতেই সংবাদটি গোচরে এলো তার। ভাগ্যক্রমে রতনের সঙ্গেও দেখা হ'ল। দ্বিরুক্তি না ক'রে দ্রুতগতিতে দু'জনে ছুটে এলো বিন্তিদের বাড়ী।

বিন্তিদের ঘরে বারান্দায় উঠোনে তখন উপচীয়মান ভিড়। শঙ্করাকে দেখেই সেই ভিড়ের গুঞ্জন, কোলাহল অধিকতর গতি পেল। শঙ্করার দিকে তাকিয়ে সকলেরই চোখে মুখে যেন উদ্যত প্রশ্ন —'বিন্তি কোথায়?' বিন্তি কোথায়?'

—বিন্তির শুভাশুভ, নিরাপত্তার সেই-ই যেন একক জিম্মাদার।

শঙ্করা দৃশ্যতই বিমূঢ়, বিভ্রান্ত। ঘটনার আকস্মিকতায় সে আমূল বিদ্ধ, হতচকিত। কারো কোনো প্রশ্নের জবাব দেবার মানসিকতা কিম্বা স্থৈর্য তখন তার নাগালের বাইরে। শুধু গতরাত্রের ঘটনাগুলো এবং বিন্তির কথাবার্তা ক্রম-পরম্পরায় স্মরণ করবার চেষ্টা করছিল। এর মধ্যে কোথাও বিন্তির-অন্তর্ধান রহস্যের সূত্রটি সংগুপ্ত আছে কিনা, খুঁজছিল তন্ন তন্ন ক'রে।

তারপর একসময় বিমূঢ় বিহ্বলতায় শঙ্করা ধীরে ধীরে ঘরে এসে দাঁড়ায় উমাপতির পাশে।

উমাপতির যে শোকাবেগ শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে সাময়িক স্তিমিত হয়ে এসেছিল, শঙ্করাকে দেখা মাত্রই তা দ্বিগুণতর হ'ল। শোকের প্রাবল্য উদ্বেল ক'রে তুলল উমাপতিকে।

— 'আমার একি সর্বনাশ হ'ল শঙ্করা! আমি যে তোমার উপরে সব সময়ে নির্ভর ক'রে থাকতাম বাবা! আমি যে জানতাম, তুমি থাকতে বিন্তির গায়ে কোনো কাঁটা ফুটবে না। হতভাগী আমারে কোথায় ফেলে গেল!'

উমাপতির কণ্ঠের পুঞ্জিত শোক ক্ষোভ অভিমান কখনো সোচ্চারে, কখনো নিরুচ্চারে, পরিবেশকে ভারী করে তোলে।

শঙ্করার বুকের মধ্যে আহত এক চিতা বাঘ নিষ্ফল আক্রোশে গর্জায়। বিন্তির এই আকস্মিক অন্তর্ধানের কোনো রহস্যই সে খুঁজে পায়না। বিন্তি স্বেচ্ছায় কোথাও আত্মগোপন ক'রে আছে, এটা একেবারেই অসম্ভব।

কেউ তাকে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছে, এটাই নির্মম সত্য। কিন্তু কে এ-কাজ করতে পারে? চাল-চালানের কারবারের চার-পাশে নানারকম মুখ, নানারকম লোক। তাদের কেউ? কিন্তু গত কিছু দিনে তেমন কোনো ঘটনা ঘটেনি, যার অনিবার্য পরিণামে এ-ধরনের পরিণতি ঘটতে পারে।

দুপুরে নিবারণের দোকানে হাজির হ'ল শঙ্করা।

—'শুনেছেন দাসমশায়, বিন্তিকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

নিবারণ সংবাদটি আগেই জেনেছে। স্বভাবতই উৎকণ্ঠিত। জিজ্ঞাসা করে — 'সব দিকে ভালো করে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে?'

— 'হ্যাঁ দাসমশায়।'

—'তাহলে তো বিপদের কথা। পুলিশকে একবার খবর দেওয়া দরকার।'

— 'পুলিশকে খবর দিয়ে কি হবে? পুলিশ কি করবে?'

— 'মাথা ঠান্ডা রাখ্ শঙ্করা। কি কারণে বিন্তি কোথায় কি ভাবে নিরুদ্দেশ হ'ল, কিছুই আমরা জানিনা। এ নিয়ে পরে ঝামেলা হতে পারে। পুলিশকে জানিয়ে রাখা ভালো।'

—'তাহলে বলছেন, থানায় খবর দেবো?'

— 'তোর যেতে হবে না শঙ্করা। তুই এদিকে খোঁজ-খবর কর। থানার বড়বাবু আমার চেনা লোক। আমি কাউকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

— 'যা ভালো বোঝেন করেন।'

অতঃপর শঙ্করা চলে যায়। আবার চারিদিকে আতি পাতি অনুসন্ধান। শঙ্করার অনুগত চাল-পার্টির সব কজনই কাজে নামে। বিন্তির সন্ধানে নিরুদ্দেশের সম্ভাব্য সব জায়গাতেই ওরা তল্লাশী চালায়। কিন্তু কোনো সন্ধান তো মেলেই না, বিন্দুমাত্র সূত্রও আবিষ্কৃত হয় না। ফলে এক সার্বিক হতাশা গ্রাস করে ওদের। বিন্তির বাবার অবস্থা করুণতর হয়ে ওঠে।

গভীর রাত্রে শঙ্করা ঘরে ফেরে। বিষাদ এবং ক্লান্তি তার সর্ব অবয়বে, অস্তিত্বে। খাবার আয়োজন করে সুবালা। নির্বাক খেয়ে ওঠে শঙ্করা। খাওয়া-শেষে সুবালা পাশে এসে দাঁড়ায়। শঙ্করার মুখাবয়বে বিমূঢ় রুক্ষতা — মরুভূমি-সদৃশ তীব্র এক দাবদাহের দগ্ধতা তার অস্তিত্বে।

বিপর্যয়ের সব সংবাদ আগেই জেনেছে সুবালা। ছেলের স্তব্ধ গম্ভীর মুখ তাকে বিদ্ধ করে।

সুবালা সন্তর্পণে একখানা হাত রাখে শঙ্করার কপালের উপর। সে হাত মেদুর মমতায় সঞ্চলিত হতে থাকে শঙ্করার কপালে, কপোলে। মা'র সেই স্নেহ-স্পর্শ ধীরে ধীরে দ্রব করতে থাকে শঙ্করাকে। শূন্যতার যে গুরুভার প্রস্তর-খণ্ডটি তার অন্তর-দেশকে সীমাহীন কাঠিন্যে অনড় ক'রে রেখেছিল, সেখানে স্পন্দন জাগল। ধীরে ধীরে তার চোখের প্রান্ত থেকে গড়াতে থাকে উদ্বেল অশ্রুধারা।

ছেলের চোখের জলে মাখামাখি হয় সুবালার হাত। অশ্রুধারা নামে তার চোখেও। আত্মগত উচ্চারণে সে বলে যায়।

— 'বড়ো ভালো ছেলোরে মেয়েডা, তার কপালে যে কেন এমন দুক্কু নেক্‌লো ভগমান!'—

লাঞ্ছিত নারীত্বের হাহাকার বুকের মধ্যে ঢেউ তোলে সুবালার। নারীর সতীত্বকে কোন্ রাক্ষসেরা এমন ক'রে লুটেপুটে খায়।

বর্ডারের সেই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা প্রবল এক ঝোড়ো হাওয়ার মতো সুবালার চেতনাকে উথাল-পাথাল ক'রে তোলে। কতদিন আগেকার কথা, কিন্তু এখনো তা এক দুর্মর স্মৃতি। সেই ছোট্ট একটি খুপ্‌রি ঘর — এক অসহায় নারী— গর্ভে যার সন্তান — দিনে রাতে পশুদের উপর্যুপরি আক্রমণ, নারী-শরীরটাকে নিয়ে সে কী জান্তব কামড়া-কামড়ি। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, কখনো সজ্ঞানে কখনো অজ্ঞানে।

বলাৎকারের সেই সব নারকীয় অভিজ্ঞতার স্মৃতি সুবালার মস্তিষ্কে তীব্র এক রণন তোলে। আকস্মিক সে মর্ম-ছেঁড়া আর্তনাদে চীৎকার করে ওঠে

— 'মেয়েডারে তুই যেমন ক'রে পারিস্‌, বাঁচা বাবা।'

।। উনিশ ।।

সাতের দশকের প্রথম পর্বের এই সময়টা বড়ই জটিল এবং গোলমেলে। শহরে গ্রামে গঞ্জে মানুষ খুন হচ্ছে। কেউ বা নিরুদ্দেশ হচ্ছে, কখনো সাময়িকভাবে, কখনো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে। ঘরের ছেলে বাইরে যাচ্ছে, তারপর কখন্‌ কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে লাশ হয়ে। তরতাজা এক একটা ছেলে তার যাবতীয় আইডেন্‌টিটি হারিয়ে বেওয়ারিশ মড়ায় পরিণত হচ্ছে। সেখানে বিন্তির মতো চালচুলোহীন, অবৈধ চাল-পার্টির একটি মেয়ে, সভ্যসমাজ যাকে সমাজ-বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করতে দ্বিরুক্তি করবে না, তার হারিয়ে যাওয়া কদিনই বা উত্তেজনা ধ'রে রাখতে পারে?

জলজ্যান্ত একটি মেয়ের রাতারাতি আকস্মিক অন্তর্হিত হয়ে যাওয়া, কিম্বা চাল-পার্টির ডব্‌কা মেয়ের অসামাজিক ক্রিয়া-কলাপ, ইত্যাদি নিয়ে সরস আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় কিছুটা উত্তেজনা অবশ্যই সঞ্চারিত হয়েছিল, কিন্তু কয়েকদিনেই এতদঞ্চলের জন-জীবন আবার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যে স্বাভাবিক ছন্দ খুঁজে পেল।

থানায় জানান হয়েছে। ও.সি. দলবল সহযোগে তদন্তও ক'রে গেলেন যথারীতি। বিন্তির বাবা—উমাপতিকে নানাপ্রকার জিজ্ঞসাবাদ, কাউকে সন্দেহ হয় কিনা—ইত্যাদি নিয়মমাফিক প্রশ্নাদি, এবং অবিলম্বে কেসটির কিনারা করা হবে-জাতীয় সুভাষিত বাণীদান প্রভৃতি ব্যাপারের মধ্যে প্রায় ধামা-চাপাই পড়ে গেল বিন্তির অন্তর্ধানের রহস্যটি।

কিন্তু আগুন জ্বলে — অনির্বাণ জ্বলতে থাকে ধিকিধিকি উমাপতির বুকের মধ্যে। আর আগুন জ্বলে শঙ্করার সমগ্র সত্তা জুড়ে। একজনের কাছ থেকে হারিয়ে গেল সংসারে তার শেষতম অবলম্বন একমাত্র আত্মজাটি, আর একজন হারাল তার দিন রাতের কর্ম-জীবনের বিশ্বস্ত সঙ্গীটিকে।

সর্বক্ষণের উপস্থিতি আর সান্নিধ্যের মধ্য দিয়ে শঙ্করার কাছে বিন্তির অস্তিত্ব একটি সহজ, অবিচ্ছেদ্য ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু বিন্তির এই আকস্মিক অবর্তমানতা এই মুহূর্তে তাকে বুঝিয়ে দিল, বিন্তি তার কি এবং কতখানি। অস্তিত্বের শিকড়-মূলে এতখানি জ্বালা, এতখানি নিঃসঙ্গতা যে অনুভব করা যেতে পারে, এ-ছিল তার চিন্তারও বাইরে। তার দিনরাত্রি, তার অস্তিত্ব, তার অনুভব — সব কিছুতে এক অন্তহীন দাহ, শূন্যতা। ফলে এক প্রমত্ত ক্ষ্যাপার মতো সে শুধু বিচরণ ক'রে বেড়ায় অঞ্চলটির স্টেশনে বাজারে, মাঠে ময়দানে, লোকালয়ে, নির্জনে। অঞ্চলটির বাইরেও খোঁজ-খবর রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো চেষ্টাই ফলবতী হয়না, সন্ধান মেলেনা বিন্তির। ফলে ছন্নছাড়া উদ্‌ভ্রান্তি দিশেহারা করে শঙ্করাকে।

দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের এক স্বল্প অবসরে হঠাৎ ওরা শঙ্করাকে আবিষ্কার করে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে স্টেশনের মাঠটিতে। অনুভা মালতী রতন ছানুবালা এবং আরো কয়েকজন মিলে শঙ্করাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বসায় স্টেশন-মাঠের নির্জন কোণটিতে।

অনুভার কণ্ঠে বেদনার্ত অভিমান — 'এ রকম পাগলের মতো ক'রে বেড়ালে কি চলবে শঙ্করাদা?'

শঙ্করা নির্বাক, উদাসীন, আত্মমগ্ন। সমগ্র চেহারায় ঝোড়ো কাকের বিপর্যয়।

মালতীর কণ্ঠে সমবেদনায় অনুনয়— 'কথা বলো শঙ্করাদা, এমন করে চুপ করে থেকো না।'

শঙ্করার কণ্ঠে হতাশ্বাস —'কি বল্‌ব বল্, কি আর বলার আছে!'

আহত অভিমানে রতনের কণ্ঠে উত্তাপ — 'তাই ব'লে তুমি এমন ক'রে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াবে শঙ্করাদা? কাজকাম নেই, খাওয়া-দাওয়া — তাও তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছো। এ-রকম করলে কি ক'রে চলবে? আমরাও তো বসে নেই। আমরাও তো খোঁজ খবর নিচ্ছি। বিত্তিদিকে আমরা খুঁজে বার করবই।'

বৃদ্ধা ছানুবালা চোখের জল মোছে — 'তুই একটু শান্ত হ' বাবা শঙ্করা। তোরে ধইরা আমরা এতোগুলান মানুষ রুজি-রোজগার জোটাইয়া খাইতাছি। তুই অমন ধারা ভাইঙ্গা পড়লে আমরা খাড়া থাহি ক্যাম্‌নে ক'? তুই বাবা শান্ত হ'। বিত্তিরে আমরাও ভালবাসি। অরে আমরাও খুঁজতাছি চাইর দিগে।'

আরো দুদিন পরের আর এক সন্ধ্যা। খালপড়ের পাশ ঘেঁষে শঙ্করা উপবিষ্ট। অন্ধকার আর ধোঁয়াশায় মাখামাখি চারিদিক। গত কদিনে শীতের দংশন তীব্রতর হয়েছে। ফলে সন্ধ্যা-সমাগমেই লোকজন গৃহাশ্রিত। শুধু অনতিদূরে শ্মশানের মধ্যস্থলে একটি চিতা জ্বলছে এবং চারিদিকে ছড়ানো-ছিটোনো মৃতের কিছু স্বজন।

এ-অঞ্চলের এ শ্মশান-ভূমিটি খুবই প্রাচীন, কিন্তু এর রম্‌রমাটি সাম্প্রতিক কালের। এতদঞ্চলে জনবসতির সংখ্যাবৃদ্ধি এবং উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই শ্মশান-ভূমিটিও বিস্তর গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ, জীবের অন্তিম পরিণামে শ্মশান বা কবর-ক্ষেত্রে আসাটা তো অনিবার্য। এখানকার বিত্তশালী ব্যক্তিদের জন্য কলকাতার নিমতলা, ক্যাঁওড়াতলা বা নিদেনপক্ষে পানিহাটির শ্মশান তো আছেই, কিন্তু সাধারণ মানুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য এই শ্মশান-ভূমিটি অপরিহার্য। সম্প্রতি প্রসার ঘটানো হয়েছে শ্মশান-ক্ষেত্রটির এবং শ্মশান-সংলগ্ন খালটির ঘাটও বাঁধানো হয়েছে। চিতার কাঠ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে সর্বক্ষণের জন্য। ফলতঃ, শবদাহের আনুষঙ্গিক সব ব্যবস্থাই পাকা। শ্মশান ভূমির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি কালীমন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নানাবিধ জেল্লা সহযোগে ঘটা ক'রে শ্মশানকালীর মন্দিরের উদ্বোধন করা হয়েছে বছর দুয়েক আগে। নিয়মিত পূজা-পাঠের ব্যবস্থাও আছে। ফলে অঞ্চলটির ক্রম-বর্ধমান উন্নতির সঙ্গে শ্মশান-ভূমিটিরও গুরুত্ব এবং মহিমা প্রসরমান।

এই শ্মশান-ভূমিটির এক প্রান্তে শঙ্করা বসে ছিল অতিপ্রাকৃত এক প্রাণীর মতো।

অদূরেই প্রজ্জ্বলন্ত চিতা। কালীমন্দিরের দরজায় জ্বলছে একটি হ্যাজাক। তারই আলোয় চতুর্দিকের ঝুপসি অন্ধকার কিছু ফিকে, তরল। প্রজ্জ্বলন্ত চিতার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক, আবিষ্ট শঙ্করা বসে আছে দীর্ঘক্ষণ।

চিতার আগুন নিস্তেজ হয়ে আসছে মাঝে মাঝে। কর্মরত ডোমেরা দীর্ঘ বাঁশের খোঁচায় উস্‌কে

দিচ্ছে আগুন। উড়ন্ত ছাইয়ের বুকের অগ্নি-ফুলকি, যেন এক অলৌকিক আভা, অন্ধকার ভেদ ক'রে উড়ে যায় অনেক উপরে। জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে বিচিত্র এক খেলা, এক অনুপম শোভার রং বাহার।

এসব দৃশ্যের দিকে শঙ্করা তাকিয়ে ছিল নির্নিমেষে। অথচ সে কিছুই দেখছিল না। সময়ের বোধহীন এক নিরালম্ব শূন্যতায় তার চেতনা ছিল আচ্ছন্ন, আবিষ্ট।

অকস্মাৎ এক আগন্তুক, ভূতগ্রস্তের মতো উপবিষ্ট শঙ্করাকে দেখে চমকায় — 'আরে শঙ্করাদা, তুমি এখানে, আর তোমাকে আমি সারা বিকেল ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

শঙ্করা কোনো কথা বলেনা, বসে থাকে নিশ্চুপ।

আগন্তুক ছেলেটি—বরুণ। বরুণ তার পূর্বেকার বক্তব্যের সূত্রে আবার বলে — 'তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য খুঁজে খুঁজে তোমার বাড়ী গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখা হয়নি। মাসিমা তোমার জন্য কান্নাকাটি করছে। তোমাকে না পেয়ে ফিরে যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে ভাবলাম, শ্মশানের দিকটা একবার দেখে যাই। তা, এখানে তোমার দেখা পেয়ে গেলাম।'

শঙ্করার কণ্ঠ কর্কশ, নির্ভেজাল রুক্ষতা — 'দেখা তো হ'ল। এবার যা, পালা এখান থেকে, ফোট্।'

শঙ্করার তিক্ততা স্পর্শ করল না বরুণকে, বরং শান্ত সংবেদনশীল এক ধীরতা তার অবয়বে। শান্ত পায়ে এগিয়ে এসে বসল শঙ্করার পাশে।

— 'বিস্তিদির কোনো খোঁজ পেলে শঙ্করদা?'

— 'কেন জ্বালাচ্ছিস্ বল্‌ত? খোঁজ পেলে তো জান্‌তেই পারতিস্। এখন যেখানে যাচ্ছিস্ সেখানে যা।'

কণ্ঠস্বরে নির্লিপ্ততা বজায় রেখে বরুণ বলে — 'আমার কাছে একটা খবর আছে শঙ্করাদা!'

চকিতে, তীরমুক্ত জ্যা-এর মতো ছিটকে বরুণের দিকে ঘুরে বসল শঙ্করা। তার হাতের থাবা, বিষম এক আবেগে সঞ্চালিত, দ্রুত এসে চেপে ধরল বরুণের কাঁধ।

উদগ্র জিজ্ঞাসায় খান্ খান্ হয় — 'কি খবর, কি খবর তুই জেনেছিস্ বল্?'

বরুণ সর্তক দৃষ্টিপাত করে পরিপার্শ্বে এবং তাদের সম্পর্কে যে কেউ কৌতূহলী নয়, এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়। ধীরে ধীরে বলে—

— 'দ্যাখো শঙ্করাদা, আমি ঠিক নিশ্চিত নই। শুধু একটা শোনা-কথা তোমাকে জানাচ্ছি। দুপুরে আমাদের পার্টির একটা ছেলে আমাকে খবরটা দিল। তুমি শরৎ-পল্লীর ও-পাশে জঙ্গলের মধ্যে ভাঙা মসজিদটা চেনো? ওখানে নাকি খুব ভোরের দিকে পলাশ আর কয়েকটা ছেলেকে দেখা গেছে। ছেলেগুলো ভাল না। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, ঐ জঙ্গলের মধ্যে ওরাই কোথাও বিস্তিদিকে লুকিয়ে রেখেছে।'

বরুণের কাঁধ বজ্রমুষ্টিতে ধরা হাতটা ধীরে শিথিল হয়ে আসে শঙ্করার। উঠে দাঁড়ায় বরুণ এবং শঙ্করার হাতখানা টেনে নেয় নিজের হাতের মুঠিতে। উষ্ণ একটি চাপ দিয়ে বলে।

— 'আমার শুভেচ্ছা রইল শঙ্করাদা, নিশ্চয়ই দু' একদিনের মধ্যে বিস্তিদিকে খুঁজে পাওয়া যাবে।'

বরুণ চলে যায়।

বিপর্যয়ের নিদারুণ অভিঘাত এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায়হীনতা শঙ্করাকে প্রথমে ক্ষুব্ধ এবং পরিশেষে নিষ্ক্রিয় ক'রে তুলেছিল। এ কদিনে বিস্তিকে আতিপাতি ক'রে খুঁজেও তার সন্ধান না পাওয়া, এবং তার সন্ধান পাওয়া যে আর সহজসাধ্য নয়, এই বোধ তাকে হতাশ করছিল এবং সেই হতাশাই তাকে নিষ্ক্রিয় ক'রে তুলেছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে বরুণের কাছে বিস্তির অন্তর্ধানের সামান্যতম সূত্রের সন্ধানই উজ্জীবিত করল তাকে এবং উঠে দাঁড়াল সটান। তার মস্তিষ্কের কোষে দ্রুত হ'ল রক্ত-প্রবাহ এবং সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব ঘটল না। শীত কুয়াশা আর অন্ধকার ভেদ ক'রে ঝড়ের গতিতে ফিরে এল বাড়ীতে।

ওকে দেখেই ছুটে এলো সুবালা। অস্নাত, অভুক্ত ছেলের বিপর্যস্ত চেহারা শেল হানল সুবালার বুকে। তবু অন্যবিধ জিজ্ঞাসায় সে আকুল হল।

— 'মেয়েডার কোনো খোঁজ-খবর পালি বাবা?'

— 'এখনই কিছু বলতে পারছি না মা, আগে ফিরে আসি, তারপর বলব।'

ঘরে ঢুকে যায় শঙ্করা এবং টালির চালের বাতা থেকে ন্যাকড়া জড়ানো বস্তুটিকে নামায় সযত্নে। খুলে ফেলে প্যাঁচানো ন্যাকড়াটাকে। ফুট পাঁচেক লম্বা একটি মসৃণ বাঁশের লাঠি। আপাত-দৃষ্টিতে নিতান্তই নিরীহ এক টুকরো বংশ-খণ্ড। কিন্তু এর অগ্রভাগে সংগুপ্ত রয়েছে ছ'ইঞ্চি লম্বা তীক্ষ্ণমুখ লৌহ-ফলক। সংগুপ্ত ফলাটি কৌশলী হাতের প্রচাপে আত্মপ্রকাশ করে নিমেষেই। তখন তা পরিণত হয় মৃত্যুর উদ্যত জিহ্বায়। একটি সুনির্মিত গুপ্তি।

এ বস্তুটি সে উপহার পেয়েছিল কালুগুণ্ডার কাছ থেকে। মমতা-বশে কালুগুণ্ডা তাকে দলে নিলেও, সতর্ক-পর্যবেক্ষণে রেখেছিল দীর্ঘদিন তাকে। সামান্য বিচ্যুতিতেই দল থেকে বহিষ্কার, এবং পরিণামে জান নিয়ে টানাটানি — এসবের সম্ভাবনা ছিল পুরো মাত্রায়। কিন্তু নিষ্ঠা পরিশ্রম সাহসিকতা আর সততা দিয়ে শঙ্করা অর্জন করেছিল কালুর আস্থা, ভালবাসা। সে সময়েই একটি বিপজ্জনক অপারেশনে সাফল্যের পর মোটা অঙ্কের লাভ হয়, কিন্তু কিছুটা চোট খায় শঙ্কবা। সুস্থ হ'লে কালু তার হাতে গুপ্তিটি ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল।

—'এটা রাখ্ বেটা! বিপদে আপদে দোস্তের কাজ দেবে। ঠিক্‌সে ব্যবহার করতে পারলে বহুত ইমান্‌দার বস্তু এটা।'

জীবনের সেই অতীত দিনগুলো শঙ্করার কাছে আজ নিছকই স্মৃতিমাত্র, সে জীবনেব কোনো কিছুই আজ আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু কালুর দেওয়া এই উপহার-দ্রব্যটি, ভালবাসা আর নির্ভবতার স্মৃতি যার সর্বাঙ্গে জড়িত, আজও রক্ষিত রেখেছে সযত্নে।

দ্রুত হাতে শঙ্করা গুপ্তির ফলকের ওঠানামাটা পরীক্ষা করে নিল।

ছেলের এই ঝটিতি আগমন, রুদ্রমূর্তি এবং ক্রিযাকলাপ, আতঙ্ক জাগায় সুবালার অন্তরে। কিন্তু কোনো প্রশ্ন সে তোলেনা। শুধু শঙ্করার বেরিয়ে যাবার মুহূর্তে, দীর্ণ হয় মমতায়—

— 'সারাডা দিন তো কিছু খালিনা বাবা, কিছু খাইয়ে যা।'

— 'ফিরে আসতে পারি তো খাব মা।'—

শঙ্করা নিষ্ক্রান্ত হয়।

১

এতদঞ্চলের এই বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক পরিকাঠামোটি, চার পাঁচ দশক আগে যা ছিল জনশূন্য ও জঙ্গলাকীর্ণ, এবং বর্তমানে মহতী জনভারে স্ফীত, সঙ্গতভাবেই আর আদি নাম-চিহ্নে এঁটে

উঠছিল না। অঞ্চলটির আদি নামের পাশাপাশি গোটা অঞ্চলটিকে পৃথক পৃথক সীমানা-নির্দেশক উপনামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সমগ্র উপনিবেশটির বাসিন্দারা যেহেতু পূর্ব-বঙ্গীয় দেশত্যাগী উদ্বাস্তু মানুষ, সেহেতু তাদের হৃদয় জুড়ে একাধারে স্বদেশ-ত্যাগের ক্ষোভ এবং স্বাদেশিক চেতনা, বড়ই জোরদার ছিল। কোনো গতিকে বাঁশ টালি বেড়া সহযোগে দখলীকৃত জমিতে একটু আধটু মাথা গোঁজার ঠাঁই নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু সেই বাসস্থানগুলির এক একটি বিভাগকে তুলতুলে স্বদেশিকতায় মণ্ডিত ক'রে দেশের স্বনামধন্য মহাপুরুষদের গরিমান্বিত নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ফলে মহৎ মানুষদের নাম-চিহ্নে গৌরবান্বিত এই উপনিবেশটির উপনামগুলি ছিল এ-ধরনের — বঙ্কিম পল্লী, রবীন্দ্র পল্লী, সুভাষ পল্লী, শরৎ পল্লী, বিধান পল্লী ইত্যাদি।

শরৎ পল্লীটি এ-অঞ্চলের দক্ষিণে প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত। জনবসতি এখনো অপেক্ষাকৃত স্বল্প। জঙ্গল এবং বৃহদাকার গাছ-গাছালির আধিক্য।

শরৎ পল্লীর একেবারে শেষ প্রান্তে এই জঙ্গুলে রূপটা অধিকতর প্রকট। সেই জঙ্গলময় অংশের মাঝখানে একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা, যার গঠন-শৈলী নিশ্চিতভাবে তাকে একটি মসজিদ বলে চিহ্নিত করে। মসজিদটি খুবই জীর্ণ এবং প্রাচীন। পলেস্তারা-খসা দেয়ালের ফাটলে যত্র তত্র পল্লবিত বটগাছ কিম্বা অন্য আগাছার অবাধ বিস্তার। মসজিদ-ভবনটি পরিত্যক্ত এবং জীর্ণ হলেও এখনো এর গঠন-শৈলী অপরূপ। সুউচ্চ ভবনটির বিস্তৃত ছাদের উপর নির্দিষ্ট ব্যবধানে পরপর তিনটি বিশাল গম্বুজ, যা বাড়ী- টাকে বিশেষ একটা গাম্ভীর্য দান করেছে। চার কোণের চারটি কারুকার্যখচিত মিনার সুষমায় মণ্ডিত।

জঙ্গলের মধ্যে এ-হেন বিশালাকৃতি মসজিদটি দেখলে চমক লাগে এবং মনে সমীহ ভাবের উদ্রেক ঘটে। কোনো সুদূর অতীতে যে অঞ্চলটিতে সমৃদ্ধ জন-বসতি ছিল এবং বাসিন্দারা ছিলেন মূলতঃ মুসলিম সম্প্রদায়-ভুক্ত, এটা অনুমান করা যায়। (অবশ্য মসজিদটি আদিতে কোনো হিন্দুমন্দির ছিল কিনা বিতর্কিত বাবরি মসজিদের মতো, খোঁড়াখুড়ি ক'রে এ-ধরনের একটি গবেষণা-মূলক উৎসাহী বিতর্ক সৃষ্টি করা যেতে পারে।) মসজিদটির পাশেই ঝোপ-জঙ্গলে সমাকীর্ণ বিশাল একটি পুষ্করিণী। ভাঙা ঘাটে, ইতস্ততঃ ছড়ানো রাশি রাশি ইঁট — এসবও স্থানটির একদা-সমৃদ্ধি এবং জন-বসতিকে চিহ্নিত করে।

উনিশশ' একাত্তর সালে খান-সেনাদের অত্যাচারে পূব-বাংলা থেকে দলে দলে মানুষ পালিয়ে এসেছিল এদেশে,.পোকা-মাকড়ের মতো আশ্রয় নিয়েছিল যত্র তত্র।

এ-রকমই কয়েকটি হতভাগ্য পরিবার অনিকেত আশ্রয়-হীনতায় বিচরণ করতে করতে এই জঙ্গলের মধ্যে আবিষ্কার করে মসজিদটি এবং মসজিদটিকে অগত্যা তাদের সাময়িক বাসস্থান হিসেবে যথেষ্ট নিরাপদ বলে মনে করে। রাত্রিতে তো বটেই, দিনের বেলাতেও জঙ্গলটি বৃহদাকার শিয়ালের পালের স্বচ্ছন্দ বিচরণ-ভূমি। বিষধর কিম্বা নির্বিষ — নানাবিধ সরীসৃপেরও অভাব নেই। কিন্তু কোনো কিছুতেই পরোয়া না ক'রে এই মরিয়া মানুষগুলো সন্নিহিত জঙ্গলাদি পরিষ্কার ক'রে মসজিদটির দখল নিয়েছিল।

মসজিদটির অভ্যন্তর ভাগের দখল নিয়েও তাদের স্থান-সঙ্কুলানের সমস্যা মেটেনি, স্থান-সম্প্রসারণ অনিবার্য হয়। মসজিদটি সুউচ্চ, ছাদে ওঠার কোনো সিঁড়ি নেই, কিন্তু প্রয়োজন বড় বালাই, ওরা আশ-পাশের বেওয়ারিস বাঁশের ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে মই বানিয়ে তৈরী ক'রে

নেয় ছাদে ওঠার শক্ত-পোক্ত একটি সিঁড়ি। ছাদের উপরে গম্বুজগুলোর ফাঁকে ফাঁকে সমতল স্থানগুলোতে নির্মিত হ'ল কয়েকটা ঝুপড়ি। উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হল পুকুর পাড়ের ইঁট, পুকুরের কাদামাটি, জঙ্গলের বাঁশ এবং অযত্ন-বর্ধিত বেনাঘাস। তাদের দক্ষ হাতের নিপুণতায় ঝুপড়ি ঘরগুলো মোটামুটি বেশ বাসযোগ্য হ'ল। বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে স্বচ্ছন্দ ওঠা-নামায় দিব্যি একটি দোতলা-বাসভবনে বাসের আমেজ।

বেশ কয়েক মাস এখানে তারা দিব্যি সংসার পেতে বসেছিল। তারপর সুবাতাসে একদিন উদ্ভব হ'ল বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির এবং এদেশে আগত শরণার্থীরা ফিরে গেল সেখানে। এই মসজিদটিতে আশ্রয়গ্রহণকারী মানুষগুলোও দলবলের সঙ্গে ফিরে গেল বাংলাদেশে তাদের স্বভূমে। মসজিদের ভিতরে এবং ছাদে তাদের নির্মিত অটুট ঘরগুলি পরিত্যক্ত পড়ে রইল এবং চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকল তাদের এতদিনকার ঘরকন্নার উপকরণগুলি। জঙ্গলের স্বাভাবিক নিয়ম নানা আগাছা আবার গ্রাস করল মসজিদটিকে। জঙ্গলের শিয়ালের পাল এবং সরীসৃপগুলো তাদের স্বচ্ছন্দ বিচরণ-ভূমিব অধিকার ফিরে পেল পুণর্বার।

সেই সর্বনাশা রাতটিতে বিত্তির অপহরণে অংশ নিয়েছিল পলাশ এবং তার চার শাগরেদ। এদের দুজন স্থানীয় এবং দুজন বহিরাগত। এই লাইনেরই দুটি স্টেশন পার হয়ে পরবর্তী স্টেশনের ওদিকের বাসিন্দা তারা। সব কজনই মদ্যপ, অর্থগৃধ্নু, নারী-মাংসলোভী এবং হিংস্র। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা হীরুবাবুর নানা কাজ এবং অকাজ রূপায়ণের বিশ্বস্ত সেনাপতি। সম্প্রতি জলসা উপলক্ষে এরা সমবেত হয়েছে। কাঁচা পয়সা এবং রং-বাজির যথেষ্ট সম্ভাবনার খুশবু পেয়েছিল তাবা।

জলসার রাতটিতে ওরা সব কজনই মহার্ঘ সুরার নেশায় যখন রঙীন হয়ে ছিল, তখন বিত্তি আব শঙ্করাব জুটিটি ওদের চোখে পড়ে।

বিত্তির কাছে একাধিকবার লাঞ্ছনা ও অপমানের প্রাক্তন জ্বালা এবং এই নির্জন রাস্তায় আকস্মিক শঙ্করার সঙ্গে বিত্তিকে দেখে পলাশের মস্তিষ্কে বীররস চাগিযে ওঠে। সুবার নেশায় বিত্তিকে তার রূপালী পর্দার এক মোহময়ী নায়িকা-সম মনে হয়। অপমানেব প্রতিশোধ গ্রহণ এবং বিত্তিকে উপভোগের বাসনাটি চরিতার্থ করার পক্ষে বর্তমান সুযোগটি বড়ই অনুকূল বলে ধারণা জাগে। মদের নেশা, নারীমাংসের লোভ এবং পলাশের প্ররোচনায় যথেষ্ট উদ্দীপনা এবং উৎসাহ অনুভব করে তার শাগরেদ চারটিও। শীত রাত্রির নির্জন রাস্তায় ওরা শঙ্করা আর বিত্তিকে অনুসরণ করে মোটরে চ'ড়ে। গাড়ীটাকে কিছু দূরে সরিয়ে রেখে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা ক'রে থাকে। শঙ্করার চলে যাওয়াটা ওরা লক্ষ রাখে এবং বিত্তির খাওয়া-দাওয়ার পর সুযোগ পাওয়া মাত্রই অপহরণের কাজটি সমাধা করে যথেষ্ট সফলতার সঙ্গে।

মোটরটির স্টিয়ারিং পলাশের হাতে। গাড়ী চালনার বিদ্যাটি সে ইতিপূর্বে সযত্নে আয়ত্ত করেছে — এবং এব্যাপারে এখন তার দক্ষতা প্রশ্নাতীত। অমসৃণ মেঠো রাস্তাটা অতিক্রম ক'রে গাড়ীটাকে এনে সে তুলল পাকা পিচ রাস্তায়। বার কয়েক চক্কর দিল এদিক ওদিক, কিন্তু কোনো জায়গাই গাড়ী থামানোর উপযুক্ত বলে মনে হলনা ওর।

বিত্তির আচ্ছন্নতা কেটেছে কিনা, বোঝা যাচ্ছেনা, কারণ ওর মুখ বাঁধা, টুঁ শব্দ উচ্চারণের সুযোগ নেই, হাত পায়েও দৃঢ় বাঁধন। গাড়ীর এক কোণে কুণ্ডলাকৃতি ওর চাদরে ঢাকা দেহ,

আপাতদৃষ্টিতে কারো সন্দেহ ঘটবার কোনো অবকাশ নেই। তবু সাবধান হ'ল ওরা। বিন্তির কাছে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করাটাও সুবুদ্ধির কাজ হবেনা, এটা অনুমান করল।

অতএব ফিসফাস, অস্পষ্ট গুঞ্জন। মদের খোয়ারি কেটে গেছে সব কটার, শিকার বাগে পাবার আদিম জান্তব উল্লাস এখন ওদের চোখে মুখে।

পলাশের উদ্দেশে ওদের সতর্ক প্রশ্ন—

—'কি গুরু, কোথায় নামাবে?'

— 'যেখানেই নামাও, হুঁশিয়ার, ধরা পড়া চলবে না।'

এ দুটি প্রশ্ন পলাশেরও চিন্তায়। বিন্তিকে নামাতে হবে নিরাপদ জায়গায় এবং কিছুতেই ধরা না প'ড়ে নিঃশব্দে ক্রিয়া-কর্ম হাসিল করতে হবে।

স্থানীয় শাগরেদ দু'টির একটি ফিস্‌ফাস্‌ করে পলাশের কানে।

—'গুরু, আমি একটা জায়গার কথা বলছি। শরৎ পল্লীর শেষ মাথায় জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা মসজিদ আছে। ঐ মসজিদের ছাদের উপর খুপ্‌রি ঘর আছে কয়েকখানা। 'জয়-বাংলা'র শরণার্থীরা বানিয়েছিল। ওদের মধ্যে আমার চেনা ফ্যামিলি ছিল একটা। ওদের সঙ্গে বার কয়েক দেখা করতে গিয়েছিলাম ঐ ছাদের খুপরিতে। চমৎকার জায়গা। এখন সব ফাঁকা পড়ে আছে। মালটাকে ওখানে নিয়ে একবার তুলতে পারলে কারো বাবার ক্ষমতা নেই খুঁজে বের করে।'

পলাশের কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন—'ঠিক বল্‌ছিস তো?'

— 'আলবত গুরু।'

অতঃপর মোটরটি দ্রুতবেগে ধাবিত হয় উদ্দিষ্ট মসজিদটিব অভিমুখে।

।। কুড়ি ।।

প্রশস্ত রাস্তা অতিক্রম ক'রে ওরা সমীপবর্তী হয় জঙ্গলের কিনারায় এবং আরো কিছু অগ্রসর হয়ে মসজিদটির অস্তিত্ব আবিষ্কার করে। ঘন নিকষ-কালো অন্ধকার, ইতস্ততঃ ধাবমান জোনাকি আর নক্ষত্র-দীপ্তিই সামান্যতম আলোর উৎস।

ঝোপঝাড় জঙ্গলের মধ্যে মোটরগাড়ীর অনুপ্রবেশ সম্ভব নয়, সুতরাং ঝোপের আড়ালে দাঁড় করানো হ'ল গাড়ীটাকে। আসার সময় নির্জন পিচ রাস্তার পাশে চোখে পড়েছিল দীর্ঘ একটি মজবুত বাঁশের মই। ওদিকে রাস্তায় ইলেকট্রিক পোস্টে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ চলছিল। ইলেকট্রিক অফিসের লোকেরা কাজ শেষে মইটাকে বেওয়ারিশ ওখানে রেখে গেছে। ভবিষ্যতের প্রয়োজন অনুযায়ী ওটাকে স্থানান্তরিত করবে এই ধারণায়।

ওদের দুজন দ্রুত ছুটে গিয়ে নিয়ে এলো মইটাকে। মসজিদের ছাদে ওঠার সিঁড়ির ব্যাপারটা অনিশ্চিত। কবে কারা তৈরী ক'রে রেখে গেছে, এখনো সেটা অক্ষত থাকবে, এ ভরসার উপর নির্ভর করা যায় না। থাকে ভালই, না থাকলে বিকল্পে, অথবা আপৎকালীন প্রয়োজনে, এ মইটাও কার্যকরী হতে পারবে।

এবার ওরা বিন্তিকে ধরাধরি ক'রে নামায় গাড়ী থেকে। আচ্ছন্নতার ঘোর কেটে গেছে বিন্তির, কিন্তু সমস্ত শরীরে যেন নিদারুণ এক অবসাদ এবং ঘাড় ঘোরাতে গিয়েই অনুভব করে তীব্র যন্ত্রণা। হাত তুলতে যায়, কিন্তু বুঝতে পারে, হাত দুটি আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা এবং পা দু'টিও। সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা হারানোর পূর্বেকার পরিস্থিতির স্মৃতি মনে ভাসে। খেয়ে উঠে উঠোনের কোণে

হাত ধুতে যাওয়া, চার পাঁচটি জান্তব হাতের বেপরোয়া অতর্কিত আক্রমণ, দ্রুত তৎপরতায় মুখ বেঁধে ফেলা, বাধা দানের আপ্রাণ চেষ্টা, এবং তারপরেই ঘাড়ের কাছে নির্মম একটি আঘাত, সংজ্ঞাহীনতা, নিশ্ছিদ্র তমসা।

এখন চেতনা ফিরে আসতেই বিন্তি বোঝে, চূড়ান্ত একটি সর্বনেশে পরিস্থিতির সে সম্মুখীন, এবং সে একান্ত একা, অসহায়, — এই জন্তুগুলোকে মোকাবিলার সাধ্য তার নেই। প্রাণপণে চীৎকার করতে গেল, কিন্তু স্বর-ক্ষেপণ সম্ভব হ'ল না, কারণ তার মুখও দৃঢ়ভাবে বাঁধা।

বিন্তির চোখের কোল বেয়ে অসহায় অক্ষম ক' ফোঁটা অশ্রু নির্গত হয়।

পরিপার্শ্ব জঙ্গলাকীর্ণ, ঘন অন্ধকার, ফলে সম্ভব নয় স্বচ্ছন্দ চলাফেরা। তবু দেশলাই কাঠি জ্বালানো বা অন্য কোনো আলোর ব্যাপারে সতর্ক হ'ল ওরা। লোকালয় দূরবর্তী, তবু গভীর রাত্রে পরিত্যক্ত এই মসজিদটির আলো কোথাও কারো দৃষ্টি-গোচর হ'লে সন্দেহের উদ্রেক ঘটতে পারে। সুতরাং অন্ধকারটা ওদের নিরাপত্তার পক্ষে অনুকূল ব'লে বিবেচিত হ'ল।

বাঁশের মইটাকে ওরা খাড়া ক'রে দাঁড় করালো মসজিদের পিছনদিকের সুউচ্চ দেয়ালে। তারপর বিন্তিকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে গেল মসজিদের অভ্যন্তরে। তৎপর অনুসন্ধানে শরণার্থীদের বানানো মসজিদের সম্মুখবর্তী প্রশস্ত সিঁড়ি-মইটির হদিসও আবিষ্কৃত হ'ল এবং বিন্তিব শরীরটাকে ওরা টেনে তুলল ছাদের উপরে। অনুসন্ধানে এটাও আবিষ্কৃত হ'ল, ছাদের কোণ ঘেঁষে দু'টি ঝুপড়ি-ঘব এখনো যথেষ্ট ব্যবহার-যোগ্য। সদ্য-আহৃত পবম লোভনীয় উপভোগেব বস্তুটাকে এখানে সঙ্গোপনে বন্দী ক'রে রাখতে পারলে নিশ্চিন্তে নিরাপদে ধীরেসুস্থে ধাবাবাহিকভাবে যে বস্তুটিকে উপভোগ করা যাবে, একথা ভেবে পুলক অনুভব করল ওরা।

এসব কাজ সমাধা হবার পব মুক্ত ক'রে দেওয়া হল বিন্তির হাত পা। কিন্তু মুখটাকে আবদ্ধ রাখা হ'ল যথারীতি।

তারপর শুরু হল ওদের কার্য-কলাপের পরবর্তী ধাপ। এর বিস্তৃত ধারা-বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। পৃথিবীর যাবতীয় নারী-ধর্ষণকারী নর-পশুরা এসব ক্ষেত্রে যে সব আচরণ করে, হুবহু পুনরাবৃত্তি ঘটল তার।

বিন্তির শরীবটাকে নিয়ে যদৃচ্ছা ছেঁড়া-খোঁড়া করল পাঁচটি কামার্ত পুরুষ। শ্রমপুষ্ট স্বাস্থ্যবতী ভরা যুবতী বিন্তি, কিন্তু সম্মিলিত এই নারকীয় উদ্দামতা, পাশবিকতা সহ্য করতে সক্ষম হ'ল না তার শরীর, তার চেতনা। ফলে সে সংজ্ঞাহীন হল পূণর্বাব।

ওদের প্রাথমিক উত্তেজনা উপশমিত হ'লে ওরা আবিষ্কার করল বিন্তির সংজ্ঞাহীনতা। বিন্তির দেহটাকে ছেড়ে সম্ভোগ-তৃপ্ত ওরা বসল মসজিদের গম্বুজে হেলান দিয়ে।

একজনের কণ্ঠস্বর —'কি গুরু, মালটা যে আবার টস্‌কে গেল!'

আর একজন গোঙায় —'মালটা বেশ সরেস মাইরি, তা একটুতে যদি এমন টস্‌কে গিয়ে ভড়কি খাওয়ায়, তাহলে ফূর্ত্তিটা জমে কিভাবে বল্‌ত!'

পলাশ নিরুত্তর। কিছু গম্ভীর, কিছুটা বা উদ্বিগ্নও। বলে — 'যা তো একজন, গাড়ীর মধ্যে ব্রাণ্ডির বোতল আছে, নিয়ে আয়।'

একজন নয়, ওরা দু'জন যায় এবং আনীত হয় ব্রাণ্ডির বোতল। বিন্তির মুখের বাঁধন খুলে জোর ক'রে ওর ওষ্ঠাধর উন্মুক্ত করা হয়। পরিমাণ মতো নির্জলা ব্রাণ্ডি পলাশ ঢেলে দেয় ওর মুখ-গহ্বরে। খানিক বাদে উত্তেজক ব্রাণ্ডির প্রভাবে বিন্তির সাড় আসে, পাশ ফিরে শোয়।

নিজের বুদ্ধিমত্তায় পলাশ উৎফুল্ল বলে— 'আজ পালাই চল্, বেশী দেরি হলে ঝামেলা হয়ে যাবে। গাড়ীটা হীরুদার এক মক্কেলের। দেরি হলে ছুঁচোটা আবার খোঁজ-খবর লাগাবে।'

একটু থামে পলাশ, চিন্তা করে ক্ষণকাল, তারপর ফিসফিস ক'রে বলে

—'এটাকে একটু সাবধানে রেখে যেতে হবে। কোণের ঐ ঝুপড়িটার মধ্যে নিয়ে যা। মুখটা আবার বেঁধে রাখ্, যাতে চেঁচাতে না পারে। হাতপা-টাও বাঁধ্— নইলে পালাবে। আস্তে কথা বলিস্, যেন কাউকে চিনতে না পারে।'

অক্ষরে অক্ষরে পালিত হ'ল পলাশের নির্দেশ। বিস্তির নগ্ন শরীরটাকে ওরা জাপটে ধ'রে নিয়ে এসে শোয়ালো খুপরিটার মধ্যে, হাতপা মুখে বাঁধন লাগাল যথারীতি। বন্ধন-কর্মে কাজে লাগান হ'ল বিস্তির পরিত্যক্ত শাড়ীটাকেও। সায়া ব্লাউজ ইত্যাদি বিস্তিব অবশিষ্ট বস্ত্রাদি ওর শরীরের উপর চাপানো হ'ল। তারপর একটি গরম চাদর দিয়ে ওরা ঢেকে দেয় বিস্তির শরীরটাকে।

—'আর দেরি নয়, এবার পালাই চল্।'

হিমেল শীতরাত্রি। বাতাসে তীক্ষ্ণ শৈত্যপ্রবাহ। মসজিদের ছাদে নিরাপত্তাহীন খুপরি ঘরে চেতন-অচেতনে সমাচ্ছন্ন ছিন্নভিন্ন দলিত বিস্তিকে আবদ্ধ ক'রে রেখে পাঁচ বীরপুঙ্গর সদর্পে কিন্তু সতর্কতায় নেমে আসে নিচে।

একটু অগ্রসর হয়েই পলাশের হুঁশিয়ারী — 'কি সব বুদ্ধি তোদের মাইরি! মইটাকে মসজিদের গায়ে খাড়া ক'রে রেখেই চলে এলি, সকালে যে কেউ দেখবে, তাবই তো সন্দেহ হবে।

অতঃপর ওরা মইটাকে নামিয়ে আনে।

পলাশ বলে —'একটু দূরে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখ্। কাল আবার কাজে লাগবে। কোনোদিন বিপদ হ'লে পালানোর দু'টো পথ খোলা রাখতে হবে। আর শোন্, কাল রাত ঠিক দশটার সময় স্টেশনে আস্‌বি। কাল মোটর থাকবে না, হেঁটে আসতে হবে। কিন্তু হুঁশিয়ার, কেউ আগে পবে না, সবাই একসাথে আসতে হবে।'

অতঃপর শেষ প্রহরের নিশুতি রাত্রির অন্ধকার ভেদ ক'রে ওদের মোটর গাড়ীটি প্রত্যাগত হয় স্টেশন ময়দানের জলসার আসরে। সেখানে তখনো সঙ্গীত শিল্পীদের কণ্ঠ-নিঃসৃত সুর-প্রবাহ হিল্লোল তুলছে বায়ু-তরঙ্গে।

দ্বিতীয় দিনেও যথাস্থানে যথাসময় সবাই সমবেত হয়ে সদলে রাত্রির নির্জনতায় উঠে এলো মসজিদের ছাদে। খুপরি ঘরে উঁকি দিযে দেখল, বেপাত্তা হয়নি বস্তুটি, মজুত রয়েছে তাদেব জন্যই।

গতকাল ওরা ছিল প্রস্তুতিহীন, কিন্তু আজ পরিস্থিতিটাকে ধাতস্থ ক'রে, ব্যাপারটাকে দীর্ঘায়িত করার উপযুক্ত প্রস্তুতি নিয়েছে। দুটো কম্বল, একটি জলভর্তি পৃথুলাকার পলিথিনের জলপাত্র, দুখানি শাড়ী, বেদনা-নাশক কিছু কিছু ওষুধপত্র এবং একটি টিফিন-ক্যারিয়ারে পর্যাপ্ত ভাত মাংস। কারণ ওরা বিলক্ষণ বুঝেছে, সম্ভোগের বস্তুটিকে দানাপানি এবং পরিচর্যা সহযোগে সুস্থ-সবল না রাখতে পারলে ভোগটি তৃপ্তিদায়ক হবে না।

এসব উপকরণের সঙ্গে অন্যবিধ আয়োজনেরও ত্রুটি নেই। এসবের সঙ্গে এনেছে পোক্ত তালাচাবি-সংযুক্ত একটি দীর্ঘ শিকল, পেন্সিল টর্চ এবং লিউকোপ্লাস্ট।

বিস্তির সময় কেটেছে আচ্ছন্নে, হতচেতনায়। গতরাত্রে প্রায় ভোর পর্যন্ত পাশব আবেগে উন্মত্ত দাপাদাপি, ওর শরীরটাকে ফালাফালা করা, অজ্ঞান হয়ে গেলে জোর ক'রে মদ গেলানো — এসব পর্ব সাঙ্গ ক'রে ওরা চলে যায়।

বিত্তির হাত পা ছিল বাঁধা, উঠে দাঁড়ানো দূরস্থান, সামান্য নড়াচড়াও ছিল সাধ্যাতীত। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তার মনে ভাসমান হয় একটি দৃশ্যরূপ, নিজের এই অসহায় বন্দীদশার মোক্ষম প্রতিতুলনা।

কাক-ভোরের গাড়িতে বিত্তিরা যখন চাল নিয়ে যায় শিয়ালদায়, ট্রেনের অভ্যন্তর অধিকাংশই তখন ভেণ্ডার কামরায় পরিণত। পা রাখার স্থান-সঙ্কুলান হয়না। আনাজপাতি, তরিতরকারির ঝুড়ির জগদ্দল ঠাস-বুনোট। কলকাতার বাবুদের জন্য মফস্বলেব গাঁ গঞ্জ উজিয়ে আসা টাটকা সতেজ সব্জি। আর সেই সব সব্জির রকমারি ঝুড়িগুলোর পাশে মাঝে মাঝেই লাইলনের দড়ির জাল-ঘেরা অন্য ঝুড়ির সহাবস্থান। সেই ঝুড়িগুলোর স্বল্প পরিসরে পাখনা-বাঁধা অজস্র ধুক্‌পুক্ মুরগীর কেত্‌রে পড়ে থাকা। কি করুণ, অমানবিক এবং নিষ্ঠুব সেই দৃশ্য! কিছু পরেই মুরগীগুলো কলকাতায় নীত হবে, দক্ষ হাতে জবাই এবং তৈরী হযে থলিতে থলিতে পৌঁছে যাবে কলকাতার বা নুদের রসুইখানায়, হোটেল ঘরে এবং পবিণত হবে অতীব সুখাদ্যে।

অসহায় সেই মুরগীগুলোর বন্দীদশার অনিবার্য ছবিটা বারবার এখন বিত্তির চোখে দৃশ্যমান হয় এবং মুরগীগুলোব সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে।

বন্দী অবস্থাতেও ভোবের দিকে কিছুটা নিদ্রা এসেছিল বিত্তির। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গেই বুঝেছিল, প্রচণ্ড জ্বর এসেছে তার, সর্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা, প্রদাহ এবং কাঁপুনি। জীর্ণ ঝুপড়িটার মধ্যে সে শায়িত, কিন্তু বাইরেটা তখন শীতের সকালেব কোমল রৌদ্রে উদ্ভাসিত। কিন্তু সেই আলো বিত্তির চোখে বিস্বাদ, বিবর্ণ। তাব মস্তিষ্কও তখন যেন নিযন্ত্রণহীন।

দিন শেষ হ'ল। সারাদিনের রোদের উষ্ণতায় চাঙ্গা হ'ল কিছুটা শরীর এবং জ্বরটা ছেড়ে গেল সন্ধ্যের দিকে। ক্ষিধে জলতেষ্টা অনুভব করল। প্রাকৃতিক কাজকর্ম সম্পন্ন করারও একটা মৃদু তাগিদ অনুভব করল বিত্তি। কিন্তু এ অবস্থায় সমস্ত ব্যাপারটাই অসম্ভব। কোথায় তাকে বন্দী ক'রে রাখা হযেছে সে সম্পর্কেও কোনো ধারণা কবতে পাবে না সে।

ধীরে ধীরে বাত্রি ঘনায়মান হয। বৃদ্ধি পায় বাত্রিব গাঢ়তাও। এক সময টেব পেল বিত্তি, স্থানটিতে মনুষ্য-সমাগম ঘটেছে। এবং এটাও অনুমান কবা কষ্টকব হ'লনা, আগেব বাত্রের সেই জন্তুগুলোবই পুনবাবির্ভাব ঘটেছে।

ওরা দুজন প্রবেশ করল খুপরির মধ্যে। হাতের ছোটো পেন্সিল-টর্চটা জ্বালায়। স্বল্পলোকে মুক্ত কবল বিত্তিব হাত পাযেব বন্ধনগুলো।

আঃ, কি মুক্তি! প্রাণভবে শ্বাস নিল বিত্তি। রক্তপ্রবাহ প্রায় বন্ধ হয়ে অসাড় হযে এসেছিল হাত পা, এখন বক্তপ্রবাহের সচলতায় কিছু আয়ত্তে এল শরীরটা।

ওরা কিন্তু বিত্তির মুখের বাঁধন মুক্ত করল না। সন্তর্পণে ওকে নিযে এলো বাইরে। দু'পাশে পাহারায থাকল দুজন। তৃতীয় একজন পিছন থেকে ওকে ঠেলতে লাগল সামনের দিকে। এবং এভাবে, ঘটনার প্রতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন, বাঁশেব সিঁড়ি দিযে সে নেমে আসতে বাধ্য হ'ল নিচে।

ওদের উদ্দেশ্যটা বোধগম্য হ'ল না বিত্তির, শুধু পশ্চাতেব সবল হাতের ধাক্কায় অগ্রবর্তী হতে থাকল নির্বিবাদে। পুকুরের ভাঙা ঘাট অতিক্রম ক'রে নিকটবর্তী হ'ল জলের কিনারে। পিছনের মূর্তিটা কানের কাছে মুখ এনে বিকৃত চাপা গলায় বলল—

—'যা ওদিকে, কিন্তু সাবধান, আমরা পাহারায় আছি।'

ইঙ্গিতটা বুঝল বিত্তি। প্রাকৃতিক কাজকর্ম করানোর জন্য ওরা ওকে নামিয়ে নিয়ে এসেছে নিচে।

শরীরগত এ প্রয়োজনটাকে অস্বীকার করতে পারলনা বিন্তি, অন্ধকারে ঝোপের পাশে বসে কিছুক্ষণ এবং পুকুরের জলে শৌচাদি সম্পন্ন করে। একবার পালানোর চিন্তা এসেছিল মাথায়, কিন্তু ওর তিন পার্শ্বে সতর্ক কুটিল প্রহরা, এবং পলায়নের উপক্রমেই যে কি পরিণতি দাঁড়াবে, এটা ভেবে সে নিরস্ত থাকল।

ওরা আবার ওকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো মসজিদের ছাদে, যথাস্থানে। এবার মুক্ত করে দিলো মুখের বাঁধনটাও।

ওর সামনে জলপাত্র এবং টিফিন-ক্যারিয়ারটি খুলে সাজিয়ে দিলো, ক্ষণিকের জন্য পেন্সিল-টর্চের মৃদু ঝিলিক এবং চাপা কণ্ঠের নির্দেশ

—'এগুলো তাড়াতাড়ি খেয়ে নে।'

ক্ষিদে অবশ্যই পেয়েছিল বিন্তির, কিন্তু খাওয়ার প্রসঙ্গেই ওর সমগ্র উদরমূলে যেন চরম বিতৃষ্ণায় পাক দিয়ে উঠল। — নাঃ, এদের আনা খাবার সে কিছুতেই স্পর্শ করবে না।

জেদি ভঙ্গিতে সে বলল — 'আগে তোমরা জবাব দাও, কারা তোমরা?'

অন্ধকারে পাঁচটি মুখ পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে।

হিস্ হিস্ ক'রে ওঠে ক্রুদ্ধ এক বিকৃত চাপা কণ্ঠস্বর—

—'বেশি রোয়াবি দেখাবি না, খেতে না চাইলে সব ফেলে দেব, কিন্তু তোকে ছাড়ব না।'

নিজের অসহায় অবস্থাটার কথা আর একবার বড় মর্মান্তিক ভাবে অনুভব করে বিন্তি। এই মূল্যবান খাদ্য-সামগ্রী ওরা এনেছে কোনো ভালবাসার টানে নয়, এগুলো খাইয়ে তার শরীরটাকে ভোগের উপযোগী এবং সক্ষম রাখার জন্যই এগুলো আনা। খাবার প্রত্যাখ্যান করলে সে-ই অভুক্ত থাকবে, কিন্তু তার অভুক্ত দুর্বল শরীরটাকে রেহাই দেবেনা এই পশুগুলো। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে অকারণ গোয়ার্তুমি বা হঠকারিতা অর্থহীন। বরং অবস্থার প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই দেবার জন্য এবং মুক্তির পথ অনুসন্ধানের জন্য শরীর এবং মন দুটোকেই সক্রিয় রাখা দরকার। এ-জাতীয় ভাবনা-চিন্তায় অতঃপর নিঃশব্দে খাবারগুলো গলাধঃকরণ করল বিন্তি। আর অদূরেই ওরা পাঁচজন মদ গিলে চলল আকণ্ঠ।

অনতিপরেই শুরু হ'ল পরবর্তী পর্ব। গতরাত্রের থেকেও কামার্ত, হিংস্র। এবং কামাচারের পদ্ধতিগুলো অধিকতর দক্ষ, পরিকল্পিত। পাঁচটি নরপশুর ক্রমিক কাম-লালসা। প্রথমে যন্ত্রণা, তারপর শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা যেন শিথিল হয়ে আসে বিন্তির, সে সংজ্ঞাহীন হয়।

এবং এভাবেই অতিক্রান্ত হয় একটি সপ্তাহ।

ঘটনা-গতিতে নতুনত্ব কিছু নেই। রাত্রি কিঞ্চিৎ গভীর হলেই ওদের সতর্ক, দলবদ্ধ আগমন, পুকুরপাড়ে নিয়ে বিন্তির প্রাকৃতিক কাজকর্ম সম্পন্ন করানো, আনীত খাদ্যাদি খাওয়ানো এবং তারপর উপর্যুপরি পাঁচজনে মিলে বিন্তির দেহটাকে নির্মম উপভোগ। প্রতিদিনের বাঁধা রুটিন।

তবে এখন ওরা রাত্রে যাবার সময় অনাবশ্যক-বোধে পা বাঁধেনা বিন্তির, একটি দীর্ঘ শিকলের প্রান্ত বিন্তির কোমরে বেষ্টন ক'রে তা তালাবদ্ধ রাখে প্রান্তবর্তী একটি মিনারের গায়ে। এতে সীমিত পরিসরেও বিন্তির চলাফেরা কিছু স্বচ্ছন্দ থাকে, কিন্তু বাঁধা থাকে হাত দু'টি এবং বিন্দুমাত্র চীৎকার বা শব্দ-সৃষ্টির পথ রোধ করতে ওর ঠোঁটে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ক'রে দেয় লিউকোপ্লাস্ট।

মাঝেমাঝে নতুন শাড়ী দিয়ে ওর শরীরটাকে আবৃত করে। বিন্তির হতচেতন দেহটাকে যাবার

সময় কম্বল চাপা দিয়ে যায়। বেদনা-নিবারক ট্যাবলেটের চূর্ণ মিশ্রিত ক'রে রাখে জলপাত্রে, বিন্তির শরীর-যন্ত্রটি যাতে নিয়ত সক্ষম এবং সহিষ্ণু থাকে।

এ প্রশ্ন অবশ্যই উত্থাপন করা যেতে পারে, রাতের পর রাত এ-ধরনের গণ-ধর্ষণ, শীতল মস্তিষ্কে একই নারীতে এরূপ সম্মিলিতভাবে উপগত হওয়া—এটা কতখানি বাস্তব?

সুস্থ স্বাভাবিকতায় এই সম্মিলিত বলাৎকার, কামাচার — অবশ্যই ন্যক্কারজনক এবং পরিহার্য। কিন্তু মানুষের মধ্যেই যখন পশুপ্রবৃত্তি প্রবলাকার হয়, তখন তার বিকৃত উল্লাস কোনো স্বাভাবিকতার ধার ধারেনা, যাবতীয় বিকৃতিতেই তার উল্লাস। আদিম গুহামানবদের যূথবদ্ধ শিকার-প্রক্রিয়া বিশ শতকের শেষ পাদে এই কামার্ত মানুষগুলোর যূথবদ্ধ মিথুন-ক্রিযায় বুঝি বা রূপান্তরিত। এবং এই অপ-মানুষগুলির উদ্ভব ঘটেছে এই সমাজ থেকেই, এই সমাজেরই কোনো সংগোপন অন্ধকার কোণ থেকে, যেখানে তিলে তিলে ক্ষয় এবং অবক্ষয় থেকে বিষ-বাষ্পসঞ্চিত হচ্ছে। এরা সমাজ-বিরোধী, পরিবার-বিরোধী, যাবতীয় শুচিতার বিরোধী।

অথচ বিশ শতকের এই প্রান্তিক সময়সীমার অন্ধ তমসার মধ্যেও তো প্রেম-ভালবাসার অস্তিত্ব বহমান, মানুষের প্রতি বিশ্বাস এবং এই সাতেব দশককে ঘিরে এদেরই সমবয়সী কত তরুণের ভিন্নতর চেতনায় কি মহৎ আত্মত্যাগ!

সপ্তাহ খানেক অতিক্রান্ত হবার পব একটি রাত্রির চিত্র।

যথাসময়ে যথারীতি ওদের আগমন ঘটল। তবে আজ দলটি কিছু সংক্ষিপ্ত, পাঁচজন নয়, তিন জন। স্থানীয় এলাকার বহির্বর্তী দুজন অনুপস্থিত।

বিন্তির খুপ্রিতে যথানিয়মে আবদ্ধ বিন্তি। খড়ি-ওঠা শরীবে শীর্ণতা রুক্ষতা ক্লান্তি আর অবসাদ। রাত্রিতে অনিচ্ছাকৃত একবার নিয়ম-রক্ষায় আহার, গত দু'দিন থেকে আহারের পর প্রবল বমন-বেগ এবং সপ্তাহব্যাপী এই পীড়ন-পেষণের অনাচার স্বাভাবিক ভাবেই বিন্তির জীবন-শক্তিকে বহুল পরিমাণে শোষণ ক'রে নিয়েছে।

মসজিদের ছাদের কোণে ওরা তিনজন প্রতীক্ষারত। অবশিষ্ট দু'জনের আগমনের অপেক্ষা। ওরা আসেনা।

পলাশের চাপা স্বর—'ছুঁচো দুটো ভয় পেয়েছে। আজ আর এলোনা।'

এরপর পারস্পরিক সংলাপ—

—'সত্যিই গুরু! তবে, ভয় তো পেতেই পারে! মনে হচ্ছে, হীরুদা কিছু সন্দেহ করেছে। আমাকে কাল সকালে উল্টো-পাল্টা নানা কথা জিজ্ঞাসা করছিল।'

— 'জানাজানি হ'লে কিন্তু কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।'

পলাশ নিরুত্তর। পাত্রে মদ ঢালে। পান করে। গম্ভীর।

স্তব্ধতার পর তার উক্তি — 'কি করতে বলিস্ তাহলে তোরা? ওটাকে কোথায় সরানো যায়?'

পলাশের প্রশ্নের উত্তরে দুই শাগরেদের দুই অভিমত—

—'একদিন চলো, বেশি রাত্রে ওটাকে নিয়ে কোথাও ফেলে রেখে আসি। আর ভাল লাগছে না মাইরি—।'

— 'ধুর, ওসব কেত্তন করতে গিয়ে ধরা পড়ি আর কি! পিঠের ছাল আস্ত থাকবে না। তার চেয়ে হাপিস্ ক'রে দিলেই হয়। রোজই তো গণ্ডায় গণ্ডায় কত হাপিস্ হয়ে যাচ্ছে।'

অতিরিক্ত মদ্য-পানে পলাশের মধ্যে মত্ততা, কিন্তু কণ্ঠস্বরে ভিন্নতর এক গাম্ভীর্য—

—'বাতেলা ছাড় ব্যাটা ভ্যাড়া, একটা মেয়েমানুষ হাপিস্ ক'রে খুব রুস্তমী চালাতে চাইছিস্? আমি যদি বাপের ব্যাটা হই তো, যেখান থেকে ওটাকে এনেছি সেখানেই ওটাকে রেখে আসব।'

পিছন প্রান্তে ছাদের উপর প্রগাঢ় অন্ধকারে অকস্মাৎ একটি ভারি বস্তু-পতনের শব্দ হ'ল।

।। একুশ ।।

অস্ত্র-গর্ভ যষ্টি হাতে, যেন এক দুরন্ত আবেগ, গন্তব্যের স্থির অবিচল লক্ষ্যে দ্রুত ছোটে, অবিরাম ছুটতে থাকে শঙ্করা। পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে যেন চেতনাহীন, ধাবমান, অন্তহীন গতিই এখন একমাত্র কাঙিক্ষত।

দ্রুত পদ-চালনায় ওর যাত্রাপথ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয় প্রস্তর-খণ্ড, ধূলিকণা, শরীর হয় স্বেদ-সিক্ত। নির্জন অন্ধকারে সংলগ্ন জলা-জঙ্গলের দু'টি নিশাচর শৃগাল রাস্তা অতিক্রম করতে গিয়ে অকস্মাৎ মুখোমুখি হয় শঙ্করার। বন্য প্রাণী দুটিও ঝটিতি থম্‌কে যায়, ভয়ার্ত চোখে তাকায় শঙ্করার সেই দানবীয় প্রতিরূপের দিকে, এবং দ্রুত সরে যায় ওর সম্মুখ থেকে। বায়ুভূত, বিচরণশীল, বিদেহী আত্মারাও বুঝি শূন্যপথে এই সংশপ্তককে দেখে, মন্দীভূত হয় ক্ষণকাল, এবং নিমেষে বিসর্পিত হয় পরিবর্তিত দিক-পথে।

সতীহারা মহাদেবের পৌরাণিক চিত্রকল্পটিকে পাঠক যদি ক্লিশে বা বহু ব্যবহারে জীর্ণ বিবেচেনা না করেন, তাহলে এ-মুহূর্তের শঙ্করার সঙ্গে উপমাটি যথার্থই লাগ্‌সই হতে পারে।

কিছুক্ষণ পরেই শঙ্কবা উপনীত হয় বরুণ নির্দেশিত শরৎ-পল্লীর উপান্তে জঙ্গল-ভূমিটির সন্নিকটে। বসতিহীন জঙ্গল-ভূমি—আগাছা, লতাগুল্ম, বট তেঁতুল ডুমুর কিম্বা অন্যবিধ গাছ-গাছালির সন্নিবেশ। অন্ধকারে যেন এক ভৌতিক পরিবেশ। শীতরাত্রির শান্ত শীতলতায় বৃক্ষগুলি নিস্পন্দ, সমাহিত। শুধু রাত্রির এই নিভৃতিতে তাদের শ্বসন-ক্রিয়ায় পাতার ছিদ্রপথে বাতাসে অবিরাম সঞ্চালিত হয়ে চলেছে কার্বণ ডাই অক্সাইড।

জঙ্গল আর বনের সংলগ্নতায় থমকে দাঁড়ানো শঙ্করার সেই উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তিটিব দিকে যেন পলকহীন দৃষ্টিপাত করে সন্নিহিত বৃক্ষগুলিও।

মাথার উপরে আদিগন্ত প্রসারিত আকাশ, স্বচ্ছ মেঘহীন। আকাশের তারাগুলো কখনো প্রজ্জ্বলন্ত, কখনো নির্বাপিত, — তাদের ঔজ্জ্বল্যের বদল ঘটছে ক্ষণে ক্ষণে। সে তারার আলোককে আসতে হচ্ছে নানা তাপ ও ঘনত্বের গ্যাস স্তর অতিক্রম ক'রে, নানাবিধ প্রতিসরণের মধ্য দিয়ে। বায়ুমণ্ডলের সদা-গতিশীল অজস্র অবতল আর উত্তল লেন্সের মধ্য দিয়ে আসতে গিয়ে আলো নিয়ত হারাচ্ছে ঋজুতা, সরে যাচ্ছে সোজা পথ থেকে, কখনো তা অভিসারী, কখনো প্রতিসারী। ক্ষণে ক্ষণে পরিব্যাপ্ত আকাশে রং বদলের মায়াময় বিভ্রম। আকাশের কোথাও বা আপাত-শূন্যতায় ছায়াপথ জুড়ে বিশাল নীহারিকা-পুঞ্জ। অগণিত আলোক-বর্ষ অতিক্রম ক'রে মহাকাশের কোটি কোটি ছায়াপথ থেকে আলোর আগমন ঘটছে পৃথিবীতে। আকাশের পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত আকাশগঙ্গা ছায়াপথ, যেন বা একখণ্ড সাদা মেঘের ফালি, বড়ো মমতায় ধারণ করে রেখেছে পৃথিবীকে।

এই শান্ত জঙ্গলভূমি, উদাস নিস্পন্দ বৃক্ষরাজি, শব্দহীন নির্জনতা, মাথার উপরের মহাকাশ, ব্যাপ্ত তারার পুঞ্জ, নীহারিকা এবং ছায়াপথের অমল গাম্ভীর্য, আবিষ্ট অভিভূত করে শঙ্করাকে।

পলকহীন তাকিয়ে থাকে সুদূর আকাশের অন্তহীনতায়। বিষন্ন উদাস এক দীর্ঘশ্বাস নির্গত হয় তার বক্ষপঞ্জরকে দলিত, দীর্ণ ক'রে। সাত-সাতটা দিন অতিক্রান্ত, এখনো বিত্তি নিরুদ্দিষ্ট, জীবিত না মৃত, সে সংবাদটুকুও অজানিত, জীবিত থাকলেই বা কোন্ জীবন সে যাপন করছে, কোন্ অন্ধকারে, কোন হতাশ্বাস শূন্যতায়?

দূরবর্তী কোনো লোকালয় থেকে আকস্মিক বায়ুপথে বাহিত হয়ে আসে কুকুরের ডাকের বিলম্বিত ধ্বনি, এবং এক ঝলক হিমেল বাতাসে শিহরিত হয়ে ওঠে গাছের পাতাগুলি। যে জোনাকিপুঞ্জ থোকায় থাকায় গাছগুলির গায়ে ইতস্ততঃ ছিল নৃত্যশীল, বায়ুভরে, আগুনের ফুলকির মতো সেগুলি ছিটকে পড়ে নিচে, ভূমিতলে, অথবা বৃক্ষ-লগ্ন লতা-ঝোপে।

নিমেষে শঙ্করা যেন সম্বিৎ ফিরে পায়, টান্ টান্ হয়ে ওঠে নির্মম হিংস্রতায়, স্নায়ু শিরা উপশিরা এবং তার সমগ্র চিন্তা-চেতনা সংহত হয় একটিই কর্তব্যকর্মে — যেমন ক'রে হোক বিত্তির উদ্ধার চাই।

কিন্তু এই ব্যাপ্ত অন্ধকার জঙ্গলভূমি, এখানে শঙ্করা কোথায় খুঁজবে বিত্তিকে?

তবু ঝোপঝাড় মাড়িয়ে, নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে সজাগ থেকে, দ্রুত অগ্রসর হয় শঙ্করা। এই জঙ্গলের মধ্যে বরুণ একটি ভাঙা মসজিদের কথা বলেছিল। সেখানে নাকি পলাশ আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের সন্দেহজনক উপস্থিতি দেখা গিয়েছে ভোর রাতের অন্ধকারে। সুতরাং মসজিদটির অস্তিত্ব আগে খুঁজে পাওয়া জরুরি।

ভিন্ন চিন্তাও এ-সময় সক্রিয় হয় শঙ্করার মনে। পলাশ আর তাব শাগরেদদেব এখানে দেখা যেতেও পারে, কিন্তু সেটাই কি অকাট্য প্রমাণ, যে বিত্তিকে তারাই ধবে এনেছে? বা লুকিয়ে রেখেছে?

পলাশকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না শঙ্করা। শঙ্করা একদা আশ্রিত ছিল তাদেরই বাড়ীতে, কিন্তু বর্তমানে সে উপার্জনশীল, সক্ষম, পেশীশক্তির অধিকারী, কিন্তু ন্যায়-পরায়ণ, চারপাশে একদল অনুগত মানুষ, এমন কি তার বাবা স্বয়ং নিবারণ পর্যন্ত তাকে সমীহ করে, — এসব ব্যাপারগুলো আদৌ পছন্দ করেনা পলাশ। কিন্তু সরাসরি, প্রত্যক্ষে শঙ্করার কোনো ক্ষতিসাধনের হিম্মত পলাশের নেই। তার গাত্রদাহ এবং শঙ্করার প্রতি ঘৃণামিশ্রিত বিদ্বেষের মূল কারণ এটাই।

বাপের পয়সায় বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত এবং অধুনা নানাবিধ অসৎ উপায়ে বিস্তর অর্থাগমে পুষ্ট পলাশের চরিত্রহীনতা এবং লাম্পট্য এ অঞ্চলে বিদিত। বিত্তির প্রতি তার সবিশেষ দুর্বলতা আছে, এবং সে দুর্বলতা প্রকাশ করতে গিয়ে কখনো লাঞ্ছিত হতে হয়েছে বিত্তির বাবার কাছে, শঙ্করার কাছে, কখনো বা স্বয়ং বিত্তির কাছে। অত্যন্ত হীনচেতা, সুতরাং যে কোনো উপায়ে একটা প্রতিশোধ-গ্রহণের স্পৃহা অবশ্যই বলবতী হতে পারে পলাশের মধ্যে। কিন্তু তার পদ্ধতি কি এই? বিত্তিকে অপহরণ? তাকে গোপনে কোথাও আবদ্ধ রাখা? কিম্বা অন্য কিছু?

এসব বিতর্কে দ্বিধান্বিত হয় শঙ্করা, বৃদ্ধি পায় ওর মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের জটিলতা।

কিন্তু তবু তাকে খুঁজতেই হবে, এবং এখন এই অন্তহীন খোঁজা ছাড়া তার আর কোনো বিকল্প নেই।

গত সাতদিনে বিত্তির নিরুদ্দেশের সম্ভাব্য সব জায়গাতেই সে তন্ন তন্ন করেছে, বিত্তির অন্তর্ধানের সূত্র সন্ধান করেছে নানা জনের কাছে। কিন্তু নিষ্ফলতা, অবিমিশ্র নিষ্ফলতা ছাড়া কোনো সারবস্তু লাভ হয়নি। বরুণ তাকে একটি উড়ো খবর দিয়েছে, হয়ত এর মূলটি ভিত্তিহীন, নির্দায়, — তবু এই সূত্র ধ'রেই তার অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় কি?

গাছপালা ঝোপঝাড়ের মধ্যে ইতস্ততঃ কিছু বিচরণের পর, বিশাল মসজিদ বাড়ীটি অন্ধকারে অকস্মাৎ প্রাগৈতিহাসিক একটি বৃহদাকার জীবের মতো প্রতিভাত হয় সামনে। বাড়ীটির জীর্ণ দেয়ালের গায়ে ঘনীভূত জমাট অন্ধকার, যেন অলৌকিক অজাগতিক এক সত্তা।

অন্ধকারের মধ্যে যতখানি দেখা সম্ভব, বাড়ীটাকে ভাল ক'রে দেখে শঙ্করা এবং তারপর সন্তর্পণে প্রদক্ষিণ ক'রে আসে চারিপাশ। কিন্তু সন্দেহের অবকাশ ঘটাতে পারে, এমন কোনো কিছুই তার দৃষ্টি-গোচর হ'ল না।

কিন্তু বাড়ীটার পিছন দিকে এসেই শঙ্করা থমকে দাঁড়ায় অকস্মাৎ। একটি সুউচ্চ মই। প্রায় কুড়ি ফুট উচ্চতার মসজিদের পশ্চাৎবর্তী এই দেয়ালটি জানালা-গরাদহীন, সটান গেঁথে তোলা। এবং সেই দেয়ালটির গায়ে সংলগ্ন রয়েছে বাঁশের সুদীর্ঘ মইটি। মইটি যে ইলেকট্রিক অফিসের, এটি সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ, রাস্তার সুউচ্চ ইলেকট্রিক পোস্টগুলিতে বিদ্যুতায়নের নানাবিধ কাজে এ ধরনের মইয়ের ব্যবহার এতদঞ্চলে বহুল প্রচলিত। কিন্তু এখানে, এই নির্জন জঙ্গলভূমিতে, জীর্ণ মসজিদ বাড়ীটার গায়ে এমনভাবে দীর্ঘ মইটাকে কে সংযুক্ত ক'রে রাখল?

শঙ্করার ইন্দ্রিয়গুলি প্রখর হয়ে উঠল এবং সেই সঙ্গে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নামক বস্তুটিও সক্রিয় হয়ে উঠল তার চেতনায়। সহজেই এমত সিদ্ধান্ত তার সুদৃঢ় হ'ল, এই মসজিদ-বাড়ীটাতেই বিন্তির অন্তর্ধানের কোনো সূত্রের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

শঙ্করার সমস্ত মনোযোগ এবার সংবদ্ধ হ'ল মইটার উপর। ঝোপ-ঝাড়ের উপর লম্বিত একটি লতার সাহায্যে গুপ্তি লাঠিটাকে পিঠের সঙ্গে সতর্কতায় সংযুক্ত রেখে সন্তর্পণে মই বেয়ে উঠে যেতে লাগল উপরে। ভারসাম্য নষ্ট হলেই মইটা ভূমিসাৎ হবে, এবং তাতে যে যে-কোনো ধরনের বিপদের আশঙ্কা, এ-বিষয়ে যথাসাধ্য সজাগ থাকল শঙ্করা। মসজিদের ছাদের উপরেই বা কোন্ অভিজ্ঞতা তার জন্য অপেক্ষা করছে, সেটাও অজানা। সুতরাং সর্ববিধ সতর্কতাই এখন গ্রহণীয়।

ধীরে ধীরে সন্তর্পণে শঙ্করা উপনীত হ'ল মইয়ের শেষ প্রান্তে মসজিদের ছাদের সমান্তরালে। ছাদের উপর জমাট অন্ধকার, সব কিছু অস্পষ্ট, গম্বুজগুলির কোল ঘেঁষে সে অন্ধকার অধিকতর প্রগাঢ়।

ছাদের সমতলে এসে শঙ্করা মই থেকে লাফ দিয়ে সশব্দে নামল ছাদের উপর। দ্রুত হাতে উন্মুক্ত করল গুপ্তির ফলক এবং শরীরের সমস্ত শক্তিকে সংহত ক'রে বাগিয়ে ধরল উদ্যত-মুখ গুপ্তিটাকে।

অতঃপর কয়েকটি খণ্ড মুহূর্ত এবং অতি দ্রুত সংঘটিত হ'ল কয়েকটি ঘটনা।

ছাদের উপর আকস্মিক এই শব্দ চমকিত করল পলাশ এবং তার দুই শাগরেদকে। তিনজনই মদ্যপানে কিছু বেসামাল কিন্তু সক্রিয়তায় অক্ষম নয়।

দুই শাগরেদ এগিয়ে এলো ছাদের এ-প্রান্তে শব্দের উৎস অনুসন্ধান করতে। শঙ্করার মুখোমুখি হতেই শঙ্করা গুপ্তির দীর্ঘ লাঠিটাকে বৃত্তাকারে কয়েকটা পাক দিল ওদের মাথা এবং শরীরকে কেন্দ্র ক'রে। লাঠি ওদের শরীর স্পর্শ করল না, কিন্তু সেই ঘূর্ণিত লাঠির গতি ভীতি জাগানোর পক্ষে যথেষ্ট।

অপরাধীর সহজাত যে স্বাভাবিক ভীতি, সেটা ওদের মধ্যে সক্রিয় ছিল, তার উপর শঙ্করার লাঠির এই প্রচণ্ড আস্ফালন ওদের মানসিকতায় ভাঙন ধরাল, এবং এসব ক্ষেত্রে পলায়নই যে শ্রেষ্ঠ পথ, একথা বিস্মৃত হ'লনা তারা। ফলে দ্রুত পাশ কাটিয়ে ওরা মসজিদের অভ্যন্তরবর্তী বাঁশের সিঁড়ি-পথে নিষ্ক্রান্ত হ'ল নিচে।

অতঃপর দ্বিতীয় পর্ব। কয়েক পা অগ্রসর হতেই শঙ্করা এবার মুখোমুখি হয় পলাশের। অন্ধকারেও পলাশকে নিঃসংশয় শনাক্তকরণে বিলম্ব ঘটে না শঙ্করার।

পলাশেরও দীর্ঘ বলশালী অবয়ব, প্রকৃতিটিও হিংস্র। দুই শাগরেদের পলায়ন-দৃশ্য দেখল, কিন্তু নিজে দাঁড়িয়ে রইল অবিচল। ভিতরে ভিতরে হয়ত বা শঙ্করার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি।

গুপ্তিটাকে পলাশের অভিমুখী করল শঙ্করা এবং স্থির নির্নিমেষ লক্ষ্যে নিক্ষেপের প্রস্তুতি নিল।

পলকে তার মনের কোণে উদ্ভাসিত হ'ল নিবারণের মুখ, শান্ত পরোপকারী স্নেহ-প্রবণ সেই মানুষটি, এবং পলাশ যার একমাত্র পুত্র-সন্তান।

শঙ্করার মনঃসংযোগ নষ্ট হ'ল এবং সে সুযোগটির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল পলাশ। অতর্কিত বিপদ সম্পর্কে সে অসতর্ক নয়, কোমরে সংগোপনে নিবদ্ধ ছোরাটা দ্রুত উঠে এলো তার হাতে এবং নিপুণ সামর্থ্যে ছোরাটাকে নিক্ষেপ করল শঙ্করার দিকে।

শঙ্করার বাহুমূলে এসে ছোরাটা আঘাত করল, বিদ্ধ হ'ল না, কিন্তু অনেকটা মাংস ছিঁড়ে ছোরাটা ছিটকে পড়ল মাটিতে।

আকস্মিক এই আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিল না শঙ্করা। পাশে হেলে সচেষ্ট হয়েছিল সরাসরি নিক্ষিপ্ত ছোরাটির ভেদ্যতা থেকে শরীরকে বাঁচাতে, কিন্তু ভারসাম্য বজায় রাখতে অপারক হ'ল এবং কাত হয়ে পড়ে গেল ডান পাশে।

এই সুযোগে লাফ দিয়ে তাকে টপকে পালানোর চেষ্টা করল পলাশ।

আঘাত, পতন এবং রক্তপাত মনের সাময়িক দুর্বলতাকে কাটিয়ে দিল শঙ্করার। পলায়নোদ্যত পলাশকে লক্ষ ক'রে অর্ধ-শযান অবস্থাতেই যুক্ত পায়ের সম্মিলিত শক্তিতে লাথি হানল পলাশের বুকে, এবং সেই প্রচণ্ড আঘাতকে সামাল দেবার মতো শক্তি ছিল না সুরামত্ত পলাশের।

ন্যাড়া ছাদের প্রায় প্রান্তদেশে সে ছিল অবস্থিত, শঙ্করার প্রবল পদাঘাতে সে ছিটকে গেল, এবং সশব্দে আছড়ে পড়ল নিচে — ইঁটের ভগ্নস্তূপের উপর।

এই মুহূর্তে এ-সব ঘটনার প্রতি আর ভ্রূক্ষেপ করার অবকাশ ছিলনা শঙ্করার।

দ্রুত উঠে দাঁড়াল সে, ছাদের এ-পাশে, ও-পাশে, গম্বুজগুলোর নিভৃত আড়ালে, আতিপাতি খুঁজল। কিন্তু কোথাও বিন্তি নেই।

কিছু অগ্রসর হতেই ছাদের প্রান্তদেশে লক্ষ করল দুটি ঝুপ্‌ড়ি। প্রথমটিতে প্রবেশ করল। অন্ধকারে হাতড়ে বুঝল, খুপরিটি শূন্য। দ্বিতীয়টিতে প্রবেশ করল। প্রবেশমাত্রই বুঝল, এখানে মানুষের অস্তিত্ব রয়েছে।

কোমরে শিকল-বদ্ধ, লিউকোপ্লাস্টে বাক্‌রুদ্ধ, বিন্তি শুয়ে ছিল অন্ধকার খুপরিতে এবং বাইরের ঘটনাবলী কিছুই অনুধাবন করতে পারছিল না। কিছু আগেই শুনেছে ফিস্‌ফিস্ এবং কয়েকটি অনুচ্চ কণ্ঠস্বর। তারপর কিছু দুপ্‌দাপ্ শব্দ, ঝটাপটি। এসবের কোনো কিছুই বোধগম্য হচ্ছিল না তার।

কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলীর জন্য, যা একান্ত অপরিহার্য, এবং সে নিরুপায়, অসহায়—মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছিল। প্রাকৃতিক কাজকর্ম সম্পন্ন করার জন্য অতঃপর তাকে নামিয়ে নেওয়া হবে পুকুর পাড়ে, তারপর ফেরত এনে টিফিন ক্যারিয়ারের খাবার দেবে, সে অনিচ্ছায় সেগুলো গলাধঃ-করণ করবে, এবং তারপর দীর্ঘ সময় জুড়ে, যতক্ষণ না সে সংজ্ঞাহীন হবে, পশুগুলো ওকে খুবলে খাবে।

এই সব আশঙ্কা নিয়ে বিন্তি দুর্বল অশক্ত-দেহে আড়ষ্ট হয়ে অপেক্ষা করছিল ঝুপ্‌ড়িটার কোণ ঘেঁষে।

অকস্মাৎ সেই অন্ধকারে দুটি ব্যগ্র ব্যাকুল হাত তাকে স্পর্শ করল এবং কানের কাছে ধ্বনিত হ'ল এক মর্মছেঁড়া আর্তনাদ

— 'বিন্তি — বিন্তিরে—'

নিজের শ্রুতিকে যেন বিশ্বাস পায় না বিন্তি, দু' চোখ ফেটে জলধারা নামে সহসা। কিন্তু লিউকোপ্লাস্টে মুখ তার বন্ধ। কোনো শব্দ উচ্চারণের সামর্থ্য নেই।

শঙ্করা বুঝতে পারে, বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে বিন্তিকে। দ্রুত হস্ত-সঞ্চালনে বন্ধনের কেন্দ্রগুলো আবিষ্কার করল। মিনারের সঙ্গে সংযুক্ত শিকল ধ'রে সজোরে কয়েকটা ঝাঁকুনি দিতেই শিথিল হয়ে গেল বন্ধ-তালাটা। শাড়ির পাকে আবদ্ধ ছিল বিন্তির দু'টি হাত। সেটি মুক্ত করল শঙ্করা। খুপ্‌রি থেকে পাঁজাকোলা ক'রে, অসীম মমতায়, বাইরে আনে বিন্তির নিরক্ত হাল্‌কা দেহটি। বিন্তির আবদ্ধ মুখটাকেও মুক্ত করল শঙ্করা।

এবং পুনরায় সেই মর্মবিদারক আহ্বান—'বিন্তি — বিন্তিরে—'

বিন্তির চারিপার্শ্বে শুধু শূন্যতা,— অমোঘ এক হাহাকার, সেই হাহাকারে ভেঙে খান্ খান্ হয় সে, দীর্ণ হয় তার কণ্ঠস্বর —'তুমি এসেছ, তুমি এসেছ শঙ্করাদা — !'

উদগত অশ্রু ঠেলে শঙ্করার প্রত্যয়ী কণ্ঠ—

— 'ভয় নেই বিন্তি, আমি এসেছি, আর কোনো ভয় নেই তোমার!'

— 'তুমি এসেছ শঙ্করাদা? কিন্তু এত দেরি ক'রে তুমি কেন এলে — কেন এলে তুমি এত দেরি ক'রে? এ কি দেখতে এলে তুমি?'

শঙ্করার দুটি বলিষ্ঠ বাহুর মাঝখানে, আর্ত পক্ষিণীর মতো, থর থর কাঁপে বিন্তির সমর্পিত শরীরটি।

ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে রাত্রির গভীরতা। হাতের ক্ষত থেকে নির্গত রক্তস্রোতে শরীর সিক্ত, পোশাক-পরিচ্ছদও রক্তাক্ত, কিন্তু এখানে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান যে নিরাপদ হবে না, সেটা অনুমান করে শঙ্করা।

বিন্তিকে পাঁজাকোলা ক'রে ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে নামিয়ে আনল নিচে এবং ঝোপঝাড়, দুর্গমতা পেরিয়ে এসে পৌঁছাল বড় রাস্তায়, লোকালয়ে।

কিন্তু এখন কি তার করণীয়? বাহুমূলের ক্ষত থেকে এখনো চুইয়ে নামছে রক্তধারা এবং ইতিমধ্যেই সেখান থেকে রক্তক্ষরণ ঘটেছে বিস্তর। ফলে শরীরে কিঞ্চিৎ দুর্বলতার আভাস, এবং এভাবে কতদূরই বা বহন ক'রে নিয়ে যাবে বিন্তিকে?

বিন্তির ক্ষীণ কণ্ঠস্বর — 'আমাকে এবার নামিয়ে দাও শঙ্করাদা, আমি এখানে হাঁটতে পারব।'

বিন্তিকে ধীরে ধীরে পাঁজাকোল থেকে নামায় শঙ্করা। শঙ্করাকে জড়িয়ে ধ'রে সোজা হয়ে দাঁড়ায় বিন্তি। শঙ্করার শরীরের জমাট-বাঁধা রক্তের স্পর্শ লাগে বিন্তির হাতে।

এবার শঙ্করার জন্য তার উদ্বেগ — 'একি, এত রক্ত, কোথায় লেগেছে তোমার?'

— 'এখন ওসব ভেবোনা বিন্তি, এখন চলো, যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, এ-জায়গাটা আমাদের ছেড়ে যেতে হবে।'

দু'টি আহত মানুষ, পরস্পরের উপর নির্ভরতায়, রাস্তা অতিক্রম করে। এদিকটায় ঘন-বসতি

না থাকলেও, জন-বিরল নয়। শীতের হিম-রাত্রি, অধিকাংশ বাড়ীই নিষ্প্রদীপ, কিন্তু মাঝে-মধ্যে দু'একটি অর্গল-বদ্ধ গৃহের ফাঁক-ফোকরে আলোর আভাস।

বিত্তির এই অবসন্ন দুর্বল শরীরে, দীর্ঘ রাস্তা হেঁটে অতিক্রম করা সম্ভব নয়, কিন্তু বিকল্প কোনো উপায়েরও হদিস পায়না শঙ্করা। শরৎ পল্লীর এদিকটায় তার যাতায়াত, গতিবিধি কম। তেমন কেউ নেই, যার কাছে সাহায্য-প্রার্থী হওয়া যায়। তবু একজনের কথা তার মনে এলো। কেষ্ট দাস। এক সময় তার দলে ছিল, চাল-চালানের কাজ করত। সে সময় একদিন, কেষ্ট বসন্তে আক্রান্ত হ'লে, ওর বাড়ীতে এসেছিল শঙ্করা ওকে দেখতে। ব্যাঙ্কের লোন পেয়ে সম্প্রতি একটি ভ্যান-রিকসা কিনেছে কেষ্ট, এবং ভ্যান চালিয়ে পরিবারের ভরণ-পোষণ করে। কেষ্টর সঙ্গে এখন ওর দেখা-সাক্ষাৎ স্বল্প, কিন্তু ছেলেটি ভদ্র বিনয়ী, কখনো-সখনো রাস্তায় সাক্ষাৎ হ'লে হেসে কথা বলে, কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে।

সামান্য চেষ্টাতেই শঙ্করা চিহ্নিত করতে পারে কেষ্টর বাড়ীটাকে। বড় রাস্তা থেকে স্বল্প ব্যবধানে, গাছ-গাছালির ফাঁকে কেষ্টর বাঁশ-টালির গৃহস্থলী। বাড়ীর সামনে দাঁড় করানো একটি ভ্যান-রিক্‌সা। ভ্যান-রিক্‌সাটি কেষ্টর বাড়ীতে অবস্থানের নির্দেশক।

— 'কেষ্ট, ও কেষ্ট, কেষ্ট বাড়ী আছিস্?' —উচ্চকণ্ঠে ডাকে শঙ্করা।

— 'কে ?' — অন্ধকারে ভিতর থেকে তন্দ্রাজড়িত একটি স্বর।

— 'একবার বাইরে আয়তো! আমি শঙ্করা।'

কেষ্ট বাইরে আসে এবং এমতাবস্থায় বিত্তি আর শঙ্করাকে দেখে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হয়।

— 'বিত্তিদি? শঙ্করাদা? কি ব্যাপার? বিত্তিদিকে কোথায় পেলে?'

— 'ওসব কথা এখন থাক কেষ্ট। তুই একটা কাজ করে দিতে পারবি? আমাদের একটু বাড়ী পৌঁছে দিবি?'

তীব্র শীতের রাত্রি। সারাদিন ভ্যান চালিয়ে কেষ্ট ক্লান্ত, নিদ্রাতুর। এবং এখান থেকে শঙ্করার বাড়ীটাও বেশ কয়েক মাইলের ব্যবধানে। তবু সম্মত হ'ল কেষ্ট। দুঃসময়ের দিনগুলোতে শঙ্করার সহৃদয়তার কথা এখনো সে ভোলেনি।

— 'তোমরা ভ্যানে ওঠো। আমি সোয়েটারটা গায়ে দিয়ে, একটা আলো নিয়ে আসি।'

বিত্তি আর শঙ্করাকে নিয়ে কেষ্টর ভ্যান যাত্রা শুরু করে।

স্টেশনের সন্নিকটবর্তী হয়ে বাঁ দিকে বাঁক নেয় ভ্যান-রিকসা এবং অদূরে ঘন-বসতিপূর্ণ এলাকায় দৃশ্যমান হয় নিবারণ দাসের দ্বিতল পাকা বাড়ীটা।

— 'একটু দাঁড়া তো কেষ্ট, আমি একবার দাস মশায়ের বাড়ীটা ঘুরে আসছি।'

।। বাইশ ।।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ হ'লে, একটি সিগারেট ধরিয়ে, ব'সে ব'সে কিছুক্ষণ আয়েশ করে নিবারণ। এটুকুই তার একমাত্র বিলাস। রাতের নিরিবিলিতে তার নিজস্ব ভাবনা, একান্ত চিন্তার অবসর। ভোরে শয্যাত্যাগ করে। প্রাতঃকৃত্য স্নানাদির পর্ব সমাপ্ত ক'রে পুজোর ঘরে প্রবেশ করে এবং সেখানে প্রায় ঘন্টাধিক সময় অতিবাহিত হয়। দ্বিতল বাড়ীর একটি বিশেষ কক্ষে সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠা করেছে গৃহদেবতা রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তি এবং প্রত্যহ সকালে সে ভক্তি-যুক্ত হয়ে নিজেই পুজো-পাঠের ব্যবস্থাদি করে। তার পরই শুরু হয় তার দিবস-ব্যাপী কর্মকাণ্ডের প্রবাহ। সকালে পুজো সাঙ্গ ক'রে, জলখাবার খেয়ে, অধিষ্ঠিত হয় দোকানে গিয়ে।

বাজারে তার দু'টি দোকানই চলছে রম্‌রম্ ক'রে। 'সততাই নিবারণের দোকানের মূলধন'— এ-জাতীয় একটি বিশ্বাস খরিদ্দারদের মধ্যে প্রচলিত থাকায় ভিড় লেগে আছে সর্বক্ষণই। প্রতিযোগিতার বাজারে এ-জাতীয় সুনাম অর্জন যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক, এবং নিবারণ সেখানে সর্বাংশে সফল।

এজন্য তাকে অবশ্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, যথাসাধ্য দোকানের তদারকি করতে হয় নিজেকেই। বেশ কয়েকজন বিশ্বাসভাজন, পরিশ্রমী এবং অনুগত কর্মচারী এ-বিষয়ে সহায়তা করে তাকে। দূর সম্পর্কের একটি ভাগ্নে এবং একজন পুরোনো কর্মচারী এখন ওব বাড়ীতেই অবস্থান করে। নিবারণের সাময়িক অনুপস্থিতিতে ওরাই দোকানের হিসাবপত্র এবং খরিদ্দার সামলায়।

তবে দুপুরে কিছুক্ষণ বাড়ীতে খেতে আসা ছাড়া, তেমন কোনো বিশেষ কারণ ব্যতীত, দোকানে নিবারণের অনুপস্থিতি প্রায় দুর্লভ। বেশ কিছুটা রাত্রি পর্যন্ত দোকানের কর্মকাণ্ড চলে। তারপর আয়-ব্যয়ের হিসাব-পত্র মিলিয়ে, সাবধানে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ ক'রে, বাড়ীতে আসাব সুযোগ ঘটে নিবারণের।

নিবারণের গৃহিণীটিও পরিশ্রমী ঃ সংসার-ধর্মের বাইরে তার আর কোনো নিজস্ব জগৎ নেই। বাড়ীতে কয়েকটি গৃহপালিত গরু আছে, গৃহদেবতা আছেন, তার উপর এতগুলো লোকের রান্নাবান্না, দেখাশোনা। কিন্তু নিবারণ-গৃহিণী সম যত্নে, সম আদরে, বাড়ীর গরু মানুষ এবং গৃহদেবতার সেবা করে।

নিবারণের আয়-উন্নতি যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে সাংসারিক দায়-দায়িত্ব, ভাবনা-চিন্তা। দু'টি মেয়ের বিবাহ এখনো বাকি, তাদের সৎপাত্রে সমর্পণ করা একটা বড় দায়িত্ব। এ-কাজটি শুভযোগে সম্পন্ন করতে পারলে, অনেকখানি দায়মুক্ত, ঝাড়া-হাত পা হতে পাবে। নিবারণ স্বভাবতঃই ধর্মভীরু মানুষ, তার উপর গৃহে গৃহদেবতার প্রতিষ্ঠার পর নিয়মিত পূজার্চনার মাধ্যমে তার অন্তরটিতে আধ্যাত্মিক ভাবনায় ভাবিত থাকার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিষয়-কর্মে লিপ্ত থেকে আয়-উন্নতি, অর্থাগম—সব কিছু করায়ও করেও মাঝে মাঝে তার এমত মনে হয়, জীবনটা বুঝি বৃথা গেল! শেষ জীবনে রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ-পর্যটনের আকাঙক্ষাটি ক্রমশঃই প্রবলতর হচ্ছে।

তবে, বেশ কিছুটা দুশ্চিন্তায় ভুগতে হয় পলাশকে কেন্দ্র ক'রে। পলাশ, তার একমাত্র পুত্র, বংশের শিবরাত্রির সল্‌তে। বিদ্যাশিক্ষা ইস্কুলের মধ্যবর্তী-গণ্ডী অতিক্রম করল না, প্রয়োজনও নেই, কারণ সার্টিফিকেট ভাঙিয়ে চাকরী-বাকরীর ভাবনা ভাবতে হবে না পলাশকে। দু'টি দোকানেই লক্ষ্মীর স্বর্ণাসন সুপ্রতিষ্ঠ। এবং পলাশই তার একমাত্র উত্তরাধিকারী। তবে অধুনা নানা জনের কাছ থেকে নানারকম অভিযোগ আসে পলাশের নামে, কিছু তার মিথ্যা, কিন্তু অধিকাংশই সত্য।

প্রথম দিকে নিবারণ এসব অভিযোগের উত্তর দেবার চেষ্টা করত, কিন্তু সম্প্রতি এর অসারত্ব অনুধাবন ক'রে, অভিযোগকারীকে পুত্রের সাবালকত্বের কথা স্মরণ করিয়ে, পলাশ-সম্পর্কিত দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করে। বাড়ীতে আসা, থাকা কিম্বা খাদ্যগ্রহণ — সবই পলাশের ইচ্ছাধীন। অর্থ, নারী এবং নেশা — তিনটি ব্যাপারেই পলাশ এখন সিদ্ধ হস্ত। সম্প্রতি একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং রাজনৈতিক আশ্রয়-পুষ্ট হয়ে অধিকতর বলবান হয়েছে তার এসব কুক্রিয়া। বিগত কয়েক মাস স্টেশন-মাঠের জলসাকে কেন্দ্র ক'রে পলাশের রবরবা সমধিক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এসব ক্ষেত্রে নিবারণের পক্ষে নিরুপায় দর্শকের ভূমিকা পালন করা ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা নেই।

তবে একমাত্র পুত্রের এবম্বিধ আচরণে নিবারণ দুশ্চিন্তা বোধ করলেও, খুব একটা গায়ে মাখে না। পলাশের এ-হেন বার-টান, বহির্মুখিতা,— এ-সবই বয়োধর্মের ফল, এবং পরিণত বয়সোচিত ভার-বুদ্ধির বিকাশ ঘটলেই এসব বয়সের দোষ বা সাময়িক বাই কেটে যাবে, — নিবারণ এমত ধারণা প্রবল ভাবে পোষণ করে।

সিগারেটে মৃদু মৃদু সুখ-টান দিচ্ছিল আর এসব বৃত্তান্তই মনে মনে ওলট-পালট করছিল নিবারণ। পলাশের এই বয়সটা যে বিপজ্জনক এবং এই বয়সে একটু আধটু নেশা-টেশা করা, বা মেয়েদের প্রতি কৌতূহলী হওয়াটা যে বিচিত্র নয়, এবং তার নিজের জীবনেও এসব একটু আধটু ঘটেছিল বইকি; এসব কথা স্মরণ ক'রে মনে মনে একটু গুজগুজে হাসিও হাসে নিবারণ।

ভাল পাত্রীর তত্ত্ব-তালাস নিচ্ছে, লক্ষ্মী-সদৃশা একটি রূপবতী গুণবতী কন্যার সন্ধান পেলেই নিবারণ তাকে পুত্রবধূ ক'রে ঘরে নিয়ে আসবে এবং তখন দেখা যাবে ব্যাটাচ্ছেলের কেরামতি কতখানি। বছর খানেকের মধ্যেই নাতির মুখ-দর্শন করবে নিবারণ এবং তখন তার পুত্রটি ঘোরতর সংসারী হয়ে তার মতোই বিষয়-বুদ্ধি সম্পন্ন হবে, — এসব মনোরম ভাবনায় ভাবিত হয়ে আর এক প্রস্থ গুজগুজে হাসি হাসে নিবারণ। এবং এভাবেই সব দুর্ভাবনাকে সে পাশ কাটাতে চায়।

অকস্মাৎ তার এই নিভৃত আয়েশী চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটে বাইরের একটি উচ্চকণ্ঠ আহ্বানে—

— 'দাসমশায়, বাড়ী আছেন?'

এত রাত্রে, কে ডাকে তাকে?

হিম এবং শীত প্রতিরোধের জন্য দরজা জানালা ভিতব থেকে অর্গল-বদ্ধ, নিরাপত্তার জন্য বাড়ীতে প্রবেশ-মুখের দরজা এবং বাইরের গেট—উভয়ই যথেষ্ট সতর্কতায় তালাবদ্ধ। দিনকাল আদৌ ভাল নয়, নকশালী আন্দোলনে অন্যান্য হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ব্যবসায়ী-হত্যার রোমহর্ষক সংবাদাদিও প্রায়শঃই প্রকাশিত হয় সংবাদ-পত্রে। কিছুদিন আগের সেই উড়ো চিঠিটা তাকে যথেষ্টই দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল, কিন্তু পরে অবশ্য নিবারণ জেনেছিল, ওটি তারই সুপুত্রের কাজ, এবং নিজেদের অন্তরঙ্গ আলোচনায় এ-নিয়ে তারা হাসি-মস্করাও করেছিল। কিন্তু দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিটি যে জটিল এবং তার সমৃদ্ধি ও উন্নতিতে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে কারো পক্ষে তার অনিষ্ট-সাধন কবা যে বিচিত্র নয়, এ-সম্পর্কে নিবারণ অধুনা যথাসাধ্য সতর্ক থাকে।

সুতবাং বাইরের ঐ উচ্চকণ্ঠ আহ্বান তাকে চমকিত করল এবং চোখে মুখে ঘন হ'ল কূট সন্দেহ।

বাইরে গেটে ঝাঁকুনি এবং পুনরায় সেই উচ্চকণ্ঠ আহ্বান—

— 'দাসমশায়, ও দাসমশায়—।'

সন্তর্পণে ঘরের দরজা উন্মুক্ত ক'রে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় নিবারণ। ডাকাডাকিতে আকৃষ্ট হয়ে দোকানের কর্মচারীটি এবং নিবারণের ভাগ্নে এসে সমবেত হয় নিবারণের পার্শ্বে।

নিবারণ দেখল, আগন্তুক দলবদ্ধ নয়, একক একটি মনুষ্য-মূর্তি, অন্ধকারে বাইরের গেট ধ'রে দণ্ডায়মান।

নিবারণ গাম্ভীর্য বজায় রেখে প্রতি-প্রশ্ন করল—

— 'কে?'

— 'আমি শঙ্কর।৷ দরজা খোলেন দাসমশায়।'

নিবারণের কণ্ঠে এবার অপরিসীম ব্যস্ততা—'শঙ্করা? ওরে তোরা শীগ্‌গীর দরজা খোল্‌। আয় শঙ্করা, ভেতরে আয়।'

প্রবেশ-মুখের দরজা এবং বাইরের গেটের তালা উন্মুক্ত হ'ল। বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হ'ল বারান্দাটি এবং ভিতরে প্রবেশ করল শঙ্করা।

শঙ্করার দিকে তাকিয়ে যুগপৎ ভীত এবং উদ্বিগ্ন হ'ল নিবারণ —

— 'একি চেহারা হয়েছে তোর? জামা-কাপড়ে এত রক্ত কেন? হাতে কি হ'ল তোর?'

— 'ওসব কথা পরে শুনবেন দাসমশায়। লোকজন নিয়ে শরৎ পল্লীর ভাঙা মসজিদে চলে যান আগে। ওখানে গেলেই সব জানতে পারবেন।'

অতঃপর দ্বিরুক্তিহীন, সকলকে বিস্মিত এবং বিমূঢ় ক'রে নিষ্ক্রান্ত হয় শঙ্করা।

আপৎকালে কেষ্টর ভ্যানগাড়ীটা যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা নিল। শঙ্করা এবং বিস্তিকে বহন করে নিয়ে এল বিস্তিদের বাড়ী পর্যন্ত। ক্লিষ্ট শরীর নিয়ে বিস্তির পক্ষে দীর্ঘক্ষণ স্থির থাকা সম্ভব ছিলনা, অবিলম্বে সে ভ্যান-রিক্‌সাটার উপর লুটিয়ে পড়েছিল।

উমাপতি শুয়ে ছিলেন, কিন্তু নিদ্রাহীন। কিছুদিন থেকে নিদ্রাহীনতায় ভুগছিলেন, বিস্তি নিরুদ্দেশ হবার পর এখন প্রায় বিনিদ্র রাত কাটান। প্রতিবেশী একজন বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ মহিলা, প্রতিবেশী-সুলভ হৃদ্যতায়, মাঝে-মধ্যে দু'টো ভাতে ভাত ফুটিয়ে দেয, এবং তাতে কোনো মতে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয উমাপতির।

কেষ্ট অগ্রবর্তী থেকে আলো দেখায় এবং শঙ্করা ধীরে ধীবে বিস্তিকে হাঁটিয়ে নেয় বাড়ীর দিকে। উমাপতিকে ডাকে না শঙ্করা, কিন্তু বাড়ীর মধ্যে লোক-সমাগমে উমাপতি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। উমাপতি দেখেন, শঙ্করার শরীবে ভর রেখে ক্ষীণদেহে টলমল অশক্ত পায়ে হেঁটে আসছে বিস্তি। স্তব্ধ বিমূঢ়তায় সে দৃশ্য দেখেন উমাপতি।

বিস্তির শয্যায় এনে ওকে শুইয়ে দেয় শঙ্করা। বেড়ার দিকে মুখ ফিবিযে, নিজেকে লুকোনোর আপ্রাণ চেষ্টায়, মৃতের মতো নিস্পন্দ শায়িত থাকে বিস্তি।

শঙ্করা বলে — 'মাস্টার মশায়, আপনি কিছুক্ষণ বিস্তির পাশে বসেন, আমি দেখি ডাক্তারবাবুকে একবার ডেকে আনতে পারি কিনা।'

কিছু বলতে যান উমাপতি, কিন্তু কোনো শব্দ, কোনো প্রশ্নই উচ্চারিত হয় না তার কণ্ঠ থেকে। নিঃশব্দে বসেন বিস্তির শয্যাপার্শ্বে।

শঙ্করা এবং কেষ্ট নিষ্ক্রান্ত হয় ঘর থেকে।

দলিত মালার ন্যায় শায়িত থাকে বিস্তি, উমাপতি বারেক কন্যার মাথার উপর সস্নেহ হাতখানি রাখতে যান, কিন্তু শিথিল হাতখানি থরথর কাঁপে, হাত নামিয়ে আনেন উমাপতি। বসে থাকেন স্থাণুবৎ, শোক বিষাদ ছাপিয়ে তাকে বিদ্ধ করতে থাকে অপমান ও কলঙ্কের জ্বালা।

বাইরে এসে পকেট হাতড়ে শঙ্করা খুঁজে পায় একখানা কুড়ি টাকার নোট। নোটখানা প্রসারিত করে ধরে কেষ্টর সামনে—

— 'এটা তুই রাখ কেষ্ট।'

— 'না শঙ্করাদা, আমি তোমার কাছ থেকে টাকা নিতে পারব না।'

— 'কেষ্ট, তুই আমাকে অনেক সাহায্য করেছিস্‌ ভাই। পরিশ্রম করেছিস, টাকাটা রাখ্‌।'

কেষ্ট অবিচল —'না শঙ্করাদা, সে হয়না। তোমাদের এত বড়ো বিপদের দিনে আমি টাকা

নিতে পারব না। আর, টাকা যদি নিতেই হয়, পরে নেবো। ডাক্তারবাবুর বাড়ী যাওয়ার কথা বল্‌ছিলে না? ভ্যানে ওঠো, আগে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনি চলো।'

শঙ্করা কথা বলেনা। গভীর কতৃজ্ঞতায় রক্ত-ক্ষরিত হাতখানি শুধু একবার ন্যস্ত রাখে কেষ্টর হাতের উপর, তারপর গিয়ে বসে ভ্যান-রিক্‌সায়।

অন্ধকার রাস্তায় শঙ্করার পথ-নির্দেশে ভ্যান-রিকসাটি উপনীত হ'ল ডাক্তার বাবুর বাড়ীর সম্মুখে। স্বল্পায়তন, একতলা বাড়ী। দরজা-জানালা রুদ্ধ, কিন্তু ভিতরের কামরা আলোকহীন নয়। ডাক্তারবাবুর অধ্যয়নের নেশা আছে, গভীর রাত্রি পর্যন্ত বিনিদ্র থেকে পড়াশুনা করেন।

বারান্দায় উঠে শঙ্করা সজোরে হাঁক দেয় —'ডাক্তার বাবু—।'

রাত-বিরেতে এ-জাতীয় 'কলে' ডাক্তারবাবু অভ্যস্ত। ফলে বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে মুখ তোলেন নিরুদ্বেগে, অন্যবিধ প্রশ্নের অবতারণা না ক'রে সরাসরি জিজ্ঞাসা — 'এখানে হবে, না বাড়ী?'

অর্থাৎ, রোগীকে কি এখানে আনা হয়েছে, অথবা ডাক্তারকে বাড়ী পর্যন্ত যেতে হবে?

রোঁয়া-ওঠা ভারী কম্বল-চাদরে আপাদ-মস্তক জড়িত ডাক্তারবাবু বাইরে এসে দাঁড়ান এবং বারান্দার বিদ্যুতের আলোটি জ্বালেন।

— 'আমি,— আমি শঙ্করা ডাক্তারবাবু।'

— 'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তা, কি ব্যাপার? এতরাত্রে হঠাৎ শুভাগমন!'

শঙ্করা কোনো জবাব দেবার পূর্বেই ডাক্তারবাবুর দৃষ্টিপাত ঘটে শঙ্করার ডান হাতের ক্ষত স্থানটির উপর। অভিজ্ঞ দৃষ্টিপাতেই বুঝলেন, ক্ষত-স্থানটি গভীর এবং কোনো তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাতে সৃষ্ট।

— 'বাঃ, বেশ ভালো জিনিসটি বাধিয়ে এনেছো তো! তা, দিনরাত এসব খুনোখুনি, গুণ্ডামি করে না বেড়ালে কি পেটের অন্নগুলো হজম হয়না?'

— 'আমি কিন্তু নিজের জন্য আসিনি ডাক্তারবাবু। আমি এসেছি—'

শঙ্করার উক্তি অসমাপ্ত থেকে যায় ডাক্তারের বিষম ধমকে —'তুমি থামোতো ছোক্‌রা। নিজের জন্য আসোনি — পরোপকার করতে এসেছ? নিজে যেটা বাধিয়েছ, সেটা আগে সামলাও, তারপর পরোপকার হবে!'

নিজস্ব হেপাজত থেকে তুলো, ডেটল, ব্যান্ডেজ প্রভৃতি ক্ষত-চিকিৎসার প্রাথমিক দ্রব্যাদি বের করলেন ডাক্তার এবং স্টোভ জ্বালিয়ে জল গরম করলেন স্বহস্তে।

ডাক্তারবাবু নিঃসন্তান, স্ত্রী বাতে পঙ্গু, শয্যাশ্রয়ী।

সযত্নে শঙ্করার ক্ষতস্থান পরিষ্কার এবং শোধন ক'রে দিলেন ডাক্তার, প্রয়োজনীয় ওষুধ-পত্র লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধলেন—

—'আপাতত এটাই থাক, কাল সকালে ওষুধ এবং ইন্‌জেক্‌সন দিতে হবে। এখন বলো, কি জন্য এসেছিলে?'

নতমুখ বিষণ্ণ শঙ্করা — 'আপনাকে একবার যেতে হবে ডাক্তারবাবু।'

—'আরে, কার কি হয়েছে, কোথায় যেতে হবে, সেটা আগে বলো।'

শঙ্করার বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর

—'বিস্তিকে একবার দেখতে যেতে হবে ডাক্তারবাবু।'

ডাক্তারের কণ্ঠে উদগ্র জিজ্ঞাসা, বিস্ফোরণ—

— 'বিস্তি? বিস্তিকে কোথায় পেলে? খুঁজে পেয়েছো বিস্তিকে?'

বিষণ্ণতায় বেদনায় আপ্লুত শঙ্করার পুণর্বার উচ্চারণ —

— 'আপনি গেলেই সব বুঝতে পারবেন ডাক্তারবাবু—!'

ডাক্তার হঠাৎ কেমন যেন বিহ্বল, অপ্রস্তুত হয়ে যান, কি এক শঙ্কা যেন তাকে তাড়িত করে—

— 'হ্যাঁ, হ্যাঁ —যেতে তো হবেই, যেতে তো হবেই! তোমরা একটু অপেক্ষা করো শঙ্করা, আমি তৈরি হয়ে আসছি।'

স্বল্প সময়েই ডাক্তারবাবু তৈরী হয়ে আসেন, হাতে ওযুধের ব্যাগ এবং যথারীতি তাঁর সাইকেল যানটি বের করার উপক্রম করেন।

শঙ্করা বলে —'ভ্যান-রিক্সা নিয়ে এসেছি, আপনার যদি অসুবিধা না হয় ভ্যানে, যেতে পারেন ডাক্তারবাবু!'

— 'অসুবিধা আর কি, তাই চলো! শীতের মধ্যে সাইকেল চালানোর হ্যাপা বাঁচল।'

সসম্ভ্রমে ডাক্তারবাবুর ব্যাগটি হাতে নিয়ে শঙ্করা গিয়ে দাঁড়ায় ভ্যানের পার্শ্বে। অনভ্যস্ত ডাক্তারের ভ্যানে আরোহণে কিছু বা অস্বস্তি, কিন্তু আরোহণ-পর্বটি নিরাপদে সম্পন্ন হ'লে জুতসই ক'রে উপবেশন করলেন। সম্মানজনক দূরত্বে শঙ্করাও উঠে বসল ভ্যানের পাটাতনে।

ভ্যান-রিকসাটি কেষ্টর সুদক্ষ চালনায় দ্রুত অগ্রসর হয়।

উমাপতির গৃহে প্রবেশ ক'রে ডাক্তারবাবু সোচ্চারে ডাকেন —

—'মাস্টারমশাই জেগে আছেন?'

উমাপতি বেরিয়ে আসেন, কিন্তু কোনো প্রত্যুত্তর করেন না, নিঃশব্দে দেখিয়ে দেন বিন্তির শয্যা-স্থানটি।

বিন্তি তখনো, নিথর নিস্পন্দ মৃতবৎ, বেড়ার দিকে মুখ ঘুরিয়ে শায়িত ছিল।

হ্যারিকেনের ঘোলাটে আলোয় ডাক্তাবাবু ওকে ভাল ক'রে পর্যবেক্ষণ করেন।

— 'এদিকে একবার ফেরো তো বিন্তি!'

বিন্তি পূর্ববৎ স্থির নিশ্চল।

— 'বিন্তিমা, আমি তোমাদের ডাক্তারবাবু। আর কোনো ভয় নেই তোমার। এদিকে পাশ ফিরে শোও — সব শুনি আমি।'

ধীরে পাশ ফেরে বিন্তি।

বিন্তিকে দেখে শিহরিত হ'ন ডাক্তার।

যা আশঙ্কা করেছিলেন, সেটাই বর্ণে বর্ণে সত্যে পরিণত।

স্বাস্থ্যবতী প্রাণোচ্ছলা মেয়ে বিন্তি, কিন্তু একটি সপ্তাহে তার শরীরের এ কী পরিণতি! শীর্ণ বিধ্বস্ত ফ্যাকাসে ম্লান এক বিষাদ-মূর্তি। ঠোঁটে গালে বাহুতে দংশনের ক্ষত, শরীরের দৃশ্যমান স্থানগুলিতেই যখন এই অবস্থা, ওর গুপ্ত অঙ্গগুলিতে নারকীয় পাশবিকতার তাহলে কি ভয়ঙ্কর প্রকাশ ঘটেছে ! মেয়েটা যে এখনো জীবিত আছে, এটাই ঢের।

ডাক্তার ওর পাশে বসেন, সস্নেহ হাত রাখেন ওর ললাটে। বিন্তির এ-তাবৎকালীন শুষ্ক চোখে অশ্রুধারা নামে অঝোরে।

বিন্তির মনিবন্ধে হাত রেখে অভিনিবেশে নাড়ী পরীক্ষা করেন ডাক্তার। দুর্বল নাড়ী, জীবনীশক্তি ক্ষীয়মাণ।

ডাক্তারবাবুকে ঘিরে উমাপতি শঙ্করা এবং কেষ্টর সাগ্রহ প্রতীক্ষা।

ঘটনার অভিঘাতে ডাক্তারও বিচলিত, গম্ভীর হয়ে বসে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর বলেন—

—'হাসপাতালে নিতে পারলে ভালো হ'ত। কিন্তু ওর শরীরের যা অবস্থা, বেশী টানাটানি না করাই ভালো। ঘুম আর বিশ্রাম দরকার। একটা ইন্‌জেক্‌সন দিয়ে যাচ্ছি — কাল সকালে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।'

আনুষঙ্গিক কাজ-কর্মাদি সমাপ্ত হ'লে ডাক্তারবাবু উমাপতিকে নিয়ে ওঁর শয্যায় এসে বসেন। ঘটনার এই শোকাবহ পরিণতিতে উমাপতি বিভ্রান্ত, বিমূঢ় এবং উমাপতির এই বিপর্যস্ত মূর্তি বিচলিত করে ডাক্তারকেও —

—'ভেঙে পড়বেন না মাস্টারমশাই, মনকে শক্ত করুন।'

স্তব্ধতার ঘোর কাটিয়ে যেন এক আত্মগত উচ্চারণ, উমাপতি বলেন —

— 'আমার এ কি সর্বনাশ হ'ল ডাক্তারবাবু! বামুনের ঘরের মেয়ে, আর হেঁসেলের হাঁড়ি, একবার এঁটো হ'লে, তাকে যে আর ঘরে রাখা যায় না! কোন্ পাপে আমার এত বড়ো সর্বনাশ হ'ল ডাক্তারবাবু!'

আন্তরিক সহমর্মিতা ডাক্তারবাবুর কণ্ঠে—

—'আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝি মাস্টারমশাই। কিন্তু ভেঙে পড়লে তো চলবে না। সমাজে তো শুধু মানুষ বাস করে না, জন্তুও বাস করে। আমি বনের জন্তুর কথা বলছিনা, সমাজে যে সব দোপেয়ে জন্তু দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের কথা বলছি। এদের সঙ্গে লড়াই ক'রেই আমাদের বাঁচতে হবে।'

অতঃপর ডাক্তারবাবু এসে ভ্যানে ওঠেন। ব্যাগ হাতে শঙ্করা তার অনুবর্তী হয়।

ভ্যান বাড়ীতে উপনীত হ'লে, ভ্যান থেকে নামেন ডাক্তারবাবু এবং একখানা হাত রাখেন শঙ্করার পৃষ্ঠে —

—'লড়াইটা শক্ত লড়াই। কিন্তু লড়াইটা আমাদের চালাতে হবে শঙ্করা। মনে রেখো, লড়াইটা তোমার মতো আমারও।'

ডাক্তারবাবু অন্য কোনো প্রসঙ্গের অবকাশ না রেখেই দ্রুত প্রবিষ্ট হয়ে যান গৃহের অভ্যন্তরে।

মধ্য রাত্রি অতিক্রান্ত — জীবজগৎ নিদ্রায় আচ্ছন্ন, কেষ্টর ভ্যান গাড়ীটা অতঃপর উপস্থিত হয় শঙ্করার বাড়ী।

ভ্যানের শব্দে দ্রুত ঘর থেকে বহির্গত হয় সুবালা।

শঙ্করার যাওয়া-অবধি, এখন রাত্রির এই মধ্য যাম, অপরিসীম দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত হয়েছে তার প্রতিটি মুহূর্ত, প্রার্থনায় আনত হয়েছে বারংবার — 'ঠাউর, আমার ছেলেডারে তুমি ভালোয় ভালোয় ফিরেয়ে আনো।'

ভ্যান থেকে নেমে, সোৎসাহে, মা-কে লক্ষ ক'বে শঙ্করা বলে—'মা, আমি ফিরে এসেছি মা!'

শঙ্করার ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত, উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, উদ্বেগে ব্যাকুল করে সুবালাকে —'তুই কেমন আছিস বাবা?'

— 'ভয় নেই, আমি ভালো আছি মা।'

— 'আর বিন্তি? বিন্তির কোনো খোঁজ জান্‌তি পারলি?'

— 'বিন্তিরে নিয়ে এসেছি মা, তুমি তাড়াতাড়ি চলো।'

দ্রুত হাতে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে, ভীষণ ব্যগ্রতায়, কেষ্টর ভ্যানে এসে চড়ে সুবালা।

ভ্যান থেকে নেমে, যেন এক ব্যাকুলা উন্মাদিনী, সুবালা ছুটে আসে বিন্তির শয্যাপার্শ্বে

— 'বিন্তি, তুই ফ্রিরে আইছিস্ মা? বাঁ'চে ফিরে আইছিস্ তুই?'

ধীরে ধীরে মাথা তোলে বিন্তি, নিমজ্জমান মানুষ অকস্মাৎ ডাঙার স্পর্শে জীবনের স্বাদ পায়, সুবালার কোলে মাথা গুঁজে, নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের নির্ভরতায়, যেন সমর্পিত, বিলুপ্ত ক'রে দিতে চায় বিন্তি নিজেকে।

।। তেইশ ।।

শঙ্করার দ্রুত প্রস্থানের পরই যেন সম্বিৎ ফিরে পেল নিবারণ।

শঙ্করার সঙ্গে কথোপকথন-কালীন নিবারণ বিষয়টার উপর তেমন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেনি। এতটা রাত্রে অপরিচিত কোনো আগন্তুকের মুখোমুখি হতে শঙ্কাগ্রস্ত হচ্ছিল নিবারণ, কিন্তু বিপজ্জনক কোনো অপরিচিত আগন্তুকের পরিবর্তে স্নেহভাজন পরিচিত শঙ্করাকে দেখে তার শঙ্কা দূরীভূত হয় এবং স্বচ্ছন্দ ও হালকাভাবেই আলাপচারী করছিল।

কিন্তু শঙ্করার আকস্মিক প্রস্থানের পরই, তার উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, রক্তাক্ত হাত এবং রহস্যময় কতাবার্তা মহাভয় সঞ্চার করল নিবারণের অন্তরে। অমন আকস্মিক রহস্যময়তায় শঙ্করা চলে গেল কেন? কি ব'লে গেল সে? শরৎ পল্লীর ভাঙা মসজিদের কাছে গেলেই সব জানা যাবে।

— কি জানা যাবে? কিসের ইঙ্গিত দিয়ে গেল শঙ্করা?

শঙ্করার বক্তব্য যে গুরুত্বহীন নয়, এবং অকারণে ভয় দেখানোর পাত্র যে শঙ্করা নয়, এটা সম্যক অনুধাবন করে নিবারণ।

নিবারণ ভাগ্নেকে হুকুম করে — 'ওরে, তাড়াতাড়ি হ্যাজাক দু'টো জ্বাল্‌তো, আর পাড়ার কয়েক জনকে খবর দে, শরৎ পল্লীর ভাঙা মসজিদটা একবার দেখে আসি সবাই কি হয়েছে।'

লোডশেডিং বা বিদ্যুতের আলোর স্থায়ীত্বের অনিশ্চয়তার দরুণ, বিকল্প হিসেবে দুটো হ্যাজাক-লণ্ঠন প্রস্তুত থাকে সর্বদা। নিবারণের আদেশে সেগুলে জ্বালানো হ'ল। নিবারণের ভাগ্নে পাড়া থেকে কয়েকজন যুবক ছেলেকে ডাকল, তারা দ্রুত তৈরী হয়ে এলো, কারণ পাড়ার উঠ্‌তি ধনী, কিন্তু সজ্জন, নিবারণকে তারা সমীহ করে।

বিপদ কালে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে দু'-একখানা লাঠি - জাতীয় বস্তু-ও সংগৃহীত হ'ল, এবং কিছুক্ষণেই সাত আট জনের একটি দল দ্রুত ছুটে চলল অকুস্থলে।

জীর্ণ মসজিদ-বাড়ীটা এবং তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এখন অধিকতর নিস্তব্ধ, নিঝুম এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ঘন্টা কয়েক পূর্বেও যে এখানে এত সব কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, সেটা অনুমান করা কঠিন।

ওরা মসজিদ বাড়ীটায় উপনীত হতেই হ্যাজাকের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত, সচকিত হয়ে যায় পারিপার্শ্ব।

বিস্তর অনুসন্ধানের কোনো প্রয়োজন হয়না, মসজিদটা একবার প্রদক্ষিণ করতেই আবিষ্কৃত হ'ল ঘটনা-কেন্দ্রটি।

মসজিদের নিম্নদেশে দেয়াল ঘেঁষে ভূমিতে ইতস্ততঃ- পরিকীর্ণ একটি ইঁটের স্তূপ। তার উপর উপুড় হয়ে শায়িত পড়ে আছে একটি দীর্ঘ দেহ-নিথর, নিস্পন্দ।

ওরা দ্রুত দেহটিকে ধরাধরি ক'রে পার্শ্ব-পরিবর্তন করাতেই, ওটা যে পলাশের দেহ, সে বিষয়ে কোনো সংশয় রইল না।

মাথা এবং মুখের একটি পাশ ইঁটের উপর পতনজনিত আঘাতে বিচূর্ণিত, থ্যাঁতলানো, আশপাশ রক্তে যেন ভাসমান, এবং এ-রক্তপাত শুধু ক্ষত-জনিত নয়, ঠোঁট-মুখের রক্তলিপ্ততা

দেখে বোঝা যায়, শরীরের অন্য কোথাও প্রবল আঘাত-জনিত কারণে রক্ত-বমনও ঘটেছে বিস্তর। রক্তের গন্ধের সঙ্গে মৃদু এ্যাল্‌কোহলের গন্ধের মিশ্রণ।

জীবিত অথবা মৃত — বোঝা দুষ্কর, কিন্তু পলাশকে যে অতি দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা দরকার, এ বিষয়ে কোনো দ্বিধাব অবকাশ ছিল না। ওরা পলাশের দেহটা ইঁটের স্তূপ থেকে উদ্ধার করে, ধরাধরি ক'রে জঙ্গলের বাইরে আনে এবং অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন সমতল জায়গায় শায়িত করায়। এখনও রক্তপাত অব্যাহত রয়েছে শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে।

প্রতিবেশী ছেলেদের দু'জন দ্রুত ছুটে যায় একটি মোটরের জন্য, পাশের পল্লীতে তাদের পরিচিত জনৈক ভদ্রলোকের একটি প্রাইভেট মোটর-গাড়ী আছে, সেটাই ওদের লক্ষ্য।

ধুলো এবং রক্তে মাখামাখি, পলাশের বিচূর্ণিত থ্যাঁতলানো মাথাটার পাশে ভূমিতে বসে থাকে নিবারণ। সমস্ত ঘটনাটিকে তার কেমন অবাস্তব, অলীক বলে বোধ হয়!

এই যে দীর্ঘদেহী সুপুরুষ ছেলেটি তার পাশে শুয়ে আছে, রক্তাক্ত শরীর, জীবিত না মৃত, বোধগম্য হচ্ছে না, — এ কে? এ কি তার একমাত্র ছেলে, তার বংশের প্রদীপ পলাশ?

কিন্তু তার তো এভাবে, এই ধুলো ময়লায়, এই রক্তে ক্লেদে, এভাবে শায়িত থাকার কথা নয়। কি করেছে সে, কেন সে এখানে এভাবে পড়ে আছে?

নিবারণের সমস্ত মস্তিষ্কে যেন মহাশূন্যের হাহাকার, সেখানে কোনো তল নেই, ভার নেই। স্থির-নিবদ্ধ বিহ্বল দৃষ্টিতে পলকহীন শুধু তাকিয়ে থাকে পলাশের শায়িত দেহটির দিকে!

দীর্ঘদিন ছেলের সঙ্গে বাক্যালাপ, সাক্ষাৎ-দর্শনাদি নেই। কতদিন — কতদিন যে ছেলের মুখখানাকে এত কাছ থেকে দেখে না নিবারণ!

ইদানীং ছেলের দুষ্কর্মের নিন্দায় চারিদিকে কান পাতা ভার, তবু ছেলেকে ঘিরে তার কি অন্ধ আসক্তি, ভবিষ্যতেব সুখ-স্বপ্ন রচনার কী মায়াময় আগ্রহ!

একেই কি বলে পুত্রস্নেহ? জানেনা নিবারণ!

অর্থে, সামর্থে ইদানীং পলাশ স্বনির্ভর, কোনো দিক দিয়েই সে বাপের তোয়াক্কা রাখেনা। কিন্তু কিছুদিন পূর্বেও বিলাস-ব্যাসনের জন্য ওকে নিয়মিত হাত-খরচ দিত নিবারণ। কিন্তু অবাধ্য সন্তানকে বশে আনার জন্য, তাকে শাসন করার জন্য, শেষ দিকে বন্ধ ক'রে দেয় হাত-খরচের টাকা। কিন্তু সস্নেহ প্রশ্রয়ে, ক্যাশবাক্সের চাবি অরক্ষিত রেখে উঠে যেত. পলাশ এসে ক্যাশ-বাক্সের টাকা সরিয়ে নিত, কর্মচারীদের ধমকাতো নিবারণ, কিন্তু কর্মচারীরা বৃদ্ধ পিতার সন্তানের প্রতি দুর্বলতার এই আড়ালটুকুকে মেনে নিত নিঃশব্দে, হাসিমুখে।

পলাশ যখন জন্মায়, নিবারণের সংসারের বৃত্তটি তখন দারিদ্র্যে ভরা, এই সমৃদ্ধি আর প্রাচুর্য তখন কল্পনাতীত। কিন্তু তখন থেকেই পলাশকে ঘিরে নিবারণের কত স্বপ্ন! বড় বাসনা ছিল, তার ছেলে লেখাপড়া শিখে বিদ্বান হবে, তার মত দোকানদার না হয়ে সমাজের একজন মাথা হবে। সাধ্যের অতিরিক্ত বিলাসিতা, আদরে প্রশ্রয়ে, বড় করতে চেয়েছে পলাশকে। কিন্তু কখন্ যে ছেলেটি তার বিপথগামী হয়ে গেল, জীবিকার সংগ্রামে অহর্নিশ ব্যস্ত নিবারণ তার হদিশ করতে পারেনি।

পলাশের দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে হু হু দীর্ঘশ্বাস! বড় বাসনা জাগে, হাত বাড়িয়ে পলাশকে একবার কোলে তুলে নিতে, দুর্মর স্মৃতির অনুপুঙ্খতায় অবিকল সেই শৈশবের মতো। গোলগাল, নাদুস-নুদুস শিশু পলাশকে কাঁধে চড়িয়ে ঘরে বাইরে, স্টেশনে বাজারে, কত জায়গায় চক্কর মেরে বেড়াত নিবারণ। সেই পলাশ কবে বড় হ'ল, হাঁটতে শিখল, স্কুলে গেল, তারপর ধীরে ধীরে, ক্রমশঃ, তার কাছ থেকে সরে গেল দূরে।

পলাশের শায়িত, স্পন্দনহীন দেহটাকে দেখতে দেখতে মনে হয়, পলাশ নয়, অন্য কেউ, অন্য কেউ বুঝি শুয়ে আছে তার পাশটিতে। তার পলাশ নিশ্চয়ই আছে অন্য কোথাও, আর কোনো খানে। দীর্ঘদিন তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা-সাক্ষাৎ নেই, কথাবার্তা বন্ধ, তবু তার পলাশ নিশ্চয়ই কোথাও বর্তমান রয়েছে সজীব, উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত।

সে কেন এভাবে মুখ থেঁতলে, রক্ত মেখে রাস্তায় অনাদৃত লুটিয়ে থাকবে ধুলো-ময়লায়?

নিবারণের ভাগ্নে এসে, ম্লানমুখ, মামার পাশে দাঁড়ায় — 'মামা, ওঠো, মোটর এসে গেছে, পলাশকে হাসপাতালে নিতে হবে।'

প্রতিবেশী ছেলে দু'টি যথার্থই করিৎকর্মা, তারা একটি মোটর সংগ্রহ ক'রে এনেছে।

স্থানীয় সরকারী স্বাস্থ্য-কেন্দ্রটিতে এই জটিল অবস্থায় যাওয়া নিতান্তই সময়ের অপচয়, কারণ পশ্চিম-বাংলার অধিকাংশ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ন্যায় এটিও চিকিৎসা-ব্যবস্থা, ওষুধপত্র এবং সরঞ্জামাদির সঙ্গে সম্পর্কহীন, ফলে কিঞ্চিৎ দূরবর্তী মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেল ওরা পলাশকে।

কিন্তু হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার রোগীর এমত জটিল অবস্থায় ভর্তি করতে সাহসী হলেন না, কারণ এখনই রোগীকে অক্সিজেন এবং রক্ত দেওয়া দরকার। মহকুমা হাসপাতাল হলেও এগুলির সংস্থান এখানে পর্যাপ্ত নয়। সুতরাং এখানকার কর্তব্যরত ডাক্তার সমস্ত জানিয়ে চিঠি লিখে দিলেন কলকাতার বড় হাসপাতালে, — অবিলম্বে রোগীকে ভর্তি করানো হোক।

কলকাতার উত্তর-প্রান্তের বড় সরকারী হাসপাতালটির জরুরি বিভাগে ভর্তি করানো গেল পলাশকে। অপারেশন, অক্সিজেন, রক্তদান — আনুষাঙ্গিক সমস্ত চিকিৎসার সুব্যবস্থা হ'ল।

সমস্ত দিন হাসপাতালে ওদের অবস্থান অব্যাহত রইল।

কিন্তু নিষ্ফল হ'ল সমস্ত প্রচেষ্টা। পরিপূর্ণ সংজ্ঞা কখনই ফেরেনি, সমস্ত-ক্ষণ গভীর আচ্ছন্নতা এবং ঘটনাকালের চব্বিশ ঘন্টার মাথায় পলাশের সংজ্ঞা বিলুপ্ত হল চিরতরে।

পোস্ট-মর্টেমের রিপোর্টে মস্তিষ্কে আঘাত-জনিত অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ এবং লাংসে প্রচণ্ড আঘাত মৃত্যু-সংঘটনের কারণ হিসেবে উল্লেখ থাকল। পতন - জনিত মস্তিষ্কে আঘাতের পূর্বেই যে লাংসে আঘাত-প্রাপ্তি ঘটেছে, রিপোর্টে উল্লেখ থাকল এটিও।

পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই হাসপাতাল থেকে বাড়ীতে আনীত হ'ল পলাশের প্রাণহীন দেহটা। সঙ্গত কারণেই নিবারণের গৃহে পরিজন এবং শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে ব্যাপ্ত হ'ল প্রবল শোকের ছায়া।

পলাশের মৃত্যুতে স্থানীয় অঞ্চলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল।

পলাশের ন্যায় একটি স্বাস্থ্যবান তরুণ, তা সে যতই অনাচারী কদাচারী হোক না কেন, তার এরূপ বীভৎস শোচনীয় অপমৃত্যুকে কেউ কেউ খুব দুঃখজনক ঘটনা বলে রায় দিল। আবার পলাশের সাম্প্রতিক অসামাজিক জীবন-যাত্রা, তার নানাবিধ কুক্রিয়া প্রভৃতির প্রেক্ষাপট বিবেচনা ক'রে, তার এরূপ পরিণতি যে স্বাভাবিক ও অনিবার্য, এরূপ অভিমতও প্রকাশ করল অনেকেই। পলাশের মৃত্যুর পিছনে যে বিস্তির অপহরণ, তাকে মসজিদ-বাড়ীর ছাদে বন্দী করে রাখা, সম্মিলিত বলাৎকার — এসব প্রসঙ্গও ব্যাপক প্রচারিত হ'ল, এবং এসব তথ্য পলাশের শোচনীয় অপমৃত্যুতে জন-সাধারণের দুঃখ-বোধের প্রতিক্রিয়াকে লঘু ক'রে দিল বহুলাংশে।

পরদিন থেকে শুরু হ'ল পুলিশী তৎপরতা, তদন্ত এবং জবানবন্দি নেবার কাজ।

উমাপতির বাড়ীতেও পুনরায় পুলিশের আগমন ঘটল এবং জবানবন্দি নেওয়া হ'ল বিস্তির। বিস্তির অপহরণ, মসজিদের ছাদে বন্দী ক'রে রাখা, সম্মিলিত বলাৎকার — এ সবই তথ্য হিসেবে

লিপিবদ্ধ করা হ'ল এবং বিন্তির উপর যারা বলাৎকার করেছে, তারা সংখ্যায় চার পাঁচজন, এসবও বিবৃত হ'ল। কিন্তু উক্ত চার বা পাঁচজনকে বিন্তি চিনতে পেরেছে কিনা, বা এদের শনাক্ত করতে পারবে কিনা, এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলতে সমর্থ হ'ল না বিন্তি। শরীরিক এবং মানসিক, উভয়তঃই সে অসুস্থ। তবে ঘটনার দিন মসজিদের ছাদ থেকে শঙ্করার ভয়ে অন্যেরা পলায়ন করে, অবশিষ্ট থাকে একজন, এবং তার সঙ্গে শঙ্করার মারামারি হয়, এবং যেকোনো ভাবেই হোক তার মৃত্যু ঘটেছে, এবং সেই ব্যক্তিটি হ'ল পলাশ, সুতরাং আসামীদের অন্যতম যে পলাশ, এ-বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতে পারেনা। কিন্তু অন্য কাউকেই বিন্তির পক্ষে চিহ্নিত-করণ সম্ভব হয়না। পলাশ জীবিত থাকলে বা সাময়িক সংজ্ঞা-ফেরা অবস্থায় কয়েকটা ঘন্টা বর্তমান থাকলে, হয়ত ওদের পরিচয় সংগ্রহের চেষ্টা করা যেত। কিন্তু পলাশের মৃত্যুতে সে সম্ভাবনা সমূহ বিলুপ্ত।

সুতরাং বিন্তিকে অপহরণ, অত্যাচার, — এ সবই ঘটনা হিসেবে প্রমাণিত হ'ল, কিন্তু কারা এই দুষ্কর্মের নায়ক, সেটা প্রমাণিত হ'ল না। অবশিষ্ট একমাত্র পলাশ, অবশ্যই সে অপরাধী, কিন্তু সে তো মৃত, যাবতীয় ধরা-ছোঁয়ার সীমানা সে অতিক্রান্ত।

নিবারণের গৃহে মধ্যাহ্নে সপার্ষদ আগমন ঘটল হীরুবাবুর। পলাশের মর্মান্তিক মৃতুতে যে তিনি যথার্থই শোকগ্রস্ত, এটা প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন।

পলাশের মৃত্যুতে যে হীরুবাবুর যথেষ্ট খেদের কারণ বর্তমান, এটা অযথার্থ নয়। অধুনা রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে গেলে পেশী-শক্তির অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। নিজস্ব পেশী-শক্তির কমতি থাকলেও ক্ষতি নেই, একটি জবরদস্ত বাহিনী পোষণ করাই প্রকৃত কাজের কাজ, যারা প্রয়োজনে প্রস্তুত থাকবে নেতার জন্য জান লড়িয়ে দিতে। অবশ্য নেতার পক্ষ থেকেও তাদের শ্রমদানকে নানাভাবে পুষিয়ে দিতে হবে এবং বিপদ-আপদে নিরাপত্তা এবং আশ্রয়-দানের পরিপাটি ব্যবস্থা করতে হবে।

পলাশ এবং তার কয়েকটি অনুচর ছিল হীরুবাবুর পেশী-বাহিনীর অন্যতম স্তম্ভ। সুতরাং পলাশের এভাবে একটি বিশ্রী কেলেঙ্কারিতে জড়িত হয়ে পড়া এবং শোচনীয় অপমৃত্যু যথেষ্ট অস্বস্তি ও খেদের কারণ ঘটাল হীরুবাবুর। এবং সমস্ত রাগটি গিয়ে অর্সালো শঙ্করার উপর।

আগে থেকেই শঙ্করার উপর তাঁর বিদ্বেষ ছিল যথেষ্ট, কিন্তু সেটি চরিতার্থ করার সুযোগ তিনি পাননি এতদিন। লতা নামক সেই চালের চোরা-চালানী মেয়েটার মৃত্যুর পর শঙ্করার সংগঠন-শক্তি, সাহসিকতা এবং নেতৃত্বদানের ক্ষমতা দেখে তাকে তাঁর পেশী-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন, এবং যথেষ্ট বড়ো মাপের নেতা হওয়া সত্ত্বেও অনেকখানি অবনত হয়েছিলেন শঙ্করার কাছে, তাকে বেশ খানিকটা তোষামোদ বা তোল্লাইও দিয়েছিলেন। কিন্তু সম্ভব হয়নি শঙ্করাকে বাগে আনা।

হীরুবাবু এড়িয়ে যেতে পারতেন ব্যাপারটাকে এবং অন্ন ছড়ালে কাক-পক্ষীর অভাব ঘটে না,— এ-জাতীয় প্রবাদ বচনটি স্মরণে রেখে হাত ধুয়ে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তাঁর কূট রাজনৈতিক বুদ্ধি ক্রিয়াশীল ছিল ভিন্ন চিন্তায়। শঙ্করা তাঁর স্বপক্ষে এসে তাঁর বল-বৃদ্ধি করল না বটে, কিন্তু কোনো কারণে শঙ্করা তাঁর বিপক্ষের কোনো দলে যোগ দিলে যে তাঁর শক্তিক্ষয়ের অবকাশ ঘটবে, এ-সম্পর্কে বিলক্ষণ অবহিত ছিলেন হীরুবাবু। সুতরাং কোনো ভাবে শঙ্করাকে নিষ্ক্রিয় ক'রে দেবার উপায় খুঁজছিলেন তিনি।

এখন অবশ্য সন্দেহজনক ব্যক্তিকে মিসা বা বিনা বিচারে কয়েদ ক'রে রাখার একটি মোক্ষম সরকারী ব্যবস্থা বলবৎ হয়েছে, এবং কায়দা-কৌশলে শঙ্করাকে সে প্যাঁচে আটকানো তাঁর পক্ষে দুরূহ নয়, কিন্তু তবু তিনি ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ-জাতীয় কাজ ক'রে তাঁর অকলঙ্ক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে চাননি কালিমালিপ্ত করতে।

পলাশের মৃত্যুকে কেন্দ্র ক'রে এবার একটি চমৎকার সুযোগ এল হীরুবাবুর সামনে। পলাশকে হারিয়ে অবশ্যই তিনি প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হলেন, কিন্তু এই সুযোগে শঙ্করাকে বসানোরও একটা পন্থা পেয়ে গেলেন তিনি।

সপার্ষদ হীরুবাবুর যখন আগমন ঘটল নিবারণের বাড়ীতে, তখন সমস্ত বাড়ীটিতে শোকের পরিবেশ। বরফ-বেষ্টিত শয্যায় পলাশের মৃতদেহ একটি কক্ষে সুরক্ষিত, আত্মীয়-স্বজন, বান্ধব অভ্যাগতের ভিড়। গৃহ-দেবতার কক্ষে পুত্রশোকে জীবন্মৃতের মতো ধর্ণা দিয়ে পড়ে আছে নিবারণ-গৃহিণী।

পাশের ঘরে ছোটো একটি খাটের উপর বজ্রাহতের মতো উপবিষ্ট নিবারণ। শুভানুধ্যায়ীদের আগমন ঘটছে মাঝে মাঝে, তারা প্রবোধ দিচ্ছে নিবারণকে। কিন্তু কোনো কথাই যেন কর্ণগোচর হচ্ছেনা নিবারণের।

দলবলসহ হীরুবাবু ঘরে প্রবেশ করতেই উটকো লোকজন আপসৃত হ'ল ঘর থেকে। একটি চেয়ার আনীত হ'ল তাঁর জন্য এবং তিনি বসলেন নিবারণের পার্শ্বে।

হীরুবাবু পেশায় দক্ষ আইনজীবী এবং সফল রাজনৈতিক নেতা। স্থান কাল অনুযায়ী উপযুক্ত সংলাপ এবং বাতাবরণ সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা অবিসম্বাদিত।

নিবারণের হাত দু'টি তিনি তুলে নিলেন নিজ করতলে। গম্ভীর, নম্র, বিষাদ-মণ্ডিত কণ্ঠস্বর— 'নিবারণবাবু, আপনাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার জানা নেই। ঈশ্বরের কাছে কামনা করি, তিনি আপনাকে শান্তি দিন।'

ক্ষণিক বিরতি।

এবার আয়েশ ক'রে চেয়ারে উপবেশন করলেন হীরুবাবু। স্থির প্রত্যয়ে ভাষণ দিলেন—

—'তবে একটা কথা আপনাকে বলে যাই নিবারণবাবু, এর বদলা আমরা নেবোই। আইনের প্যাঁচে না পারি, অন্যভাবে নেবো। পলাশ আমাদের বন্ধু, আমাদের সাথী। তার এ অপমৃত্যু আমরা সহ্য করব না। যার হাত দিয়ে এটা ঘটেছে, তাকে এর শাস্তি পেতেই হবে।'

ক্ষণিক বিরতির পর পুনরায়—

—'এটি সুস্পষ্ট খুন, এবং খুনটি করেছে শঙ্করা। শঙ্করাকে এর জবাবদিহি করতে হবে। লোকে নাকি বলছে, পলাশ নাকি উমাপতি মাস্টারের ঐ চালের চোরাকারবারি মেয়েটাকে নিয়ে ভাঙা মসজিদের ছাদে আটকে রেখেছিল, এবং অন্যায় কাজ করেছিল। ঠিকই, কিন্তু কাজটা তো পলাশ একা করেনি, দলে তো নাকি আরো কয়েকজন ছিল। কিন্তু শঙ্করা তো তাদের কাউকে ধরেনি, বা খুন করেনি। বেছে বেছে পলাশকেই মারল? পলাশ এবং পলাশের সঙ্গী ছেলেগুলো হয়ত অন্যায় করেছিল, পলাশ তো চলে গেল, এখন আমরা অন্য ছেলেগুলে কারা, তার খোঁজ নিচ্ছি, দোষী প্রামাণিত হ'লে আইনের বিচারে যা শাস্তি হয়, তা অবশ্যই ওদের পেতে হবে। কিন্তু শঙ্করা পলাশকে খুন করবে কেন? কোন্ অধিকারে? কাজটা সে করেছে উদ্দেশ্যমুলকভাবে। শঙ্করার হাতেও নাকি ছোরার কোপ লেগেছে। কিন্তু ওটা যে পলাশের কাজ, অন্য কারো নয়, এটা কে প্রমাণ করবে? তাছাড়া, খুনের দায় থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য নিজেই যে সে এ-কাজটি করেনি, তাই-বা কে বলবে? শঙ্করা প্রমাণ করতে চাইছে যে, আত্মরক্ষার জন্যই সে

পলাশকে খুন করেছে। আদালতে উঠলে ওর সব বুজরুকি ধরা পড়বে। খুনটা শঙ্করাই করেছে, এবং করেছে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায়। এর বদলা আমরা নেবোই।'

সুস্পষ্ট উচ্চারণে, অনুত্তেজিত নাটকীয় কণ্ঠস্বরে, শোকের পরিবেশ নষ্ট না ক'রে, কথাগুলি বলে গেলেন হীরুবাবু।

নিবাররণ যেমন ব'সে ছিল আত্মসমাহিত, বাক্যহীন, —তেমনই ব'সে রইল।

আরো কিছুক্ষণ অতিবাহিত ক'রে, সপার্ষদ বিদায় নিলেন হীরুবাবু।

কয়েকজন প্রতিবেশী এবং প্রতিবেশিনীর সনির্বন্ধ অনুরোধে সামান্য কিছু খাবার মুখে তুলল নিবারণ এবং এক অসীম শূন্যতার গুরুভার বুকে চাপিয়ে পূর্ববৎ নিস্পন্দ পড়ে রইল খাটের উপর।

অপবাহ্নে পলাশের মৃতদেহ বের করা হ'ল অন্তিমযাত্রার জন্য। দাহকার্য সম্পন্ন হবে কেওড়াতলার মহাশ্মশানে। মৃতদেহ বের করার সময় আর একবার সকরুণ শোকের পরিবেশ রচিত হ'ল। বুক-ভাঙা কান্না, আর্ত শোকোচ্ছ্বাসে ভারি হয়ে উঠল বাতাস।

মৃতদেহ বেরিয়ে যেতেই বাড়ীতে ভিড় কমে এলো ধীরে ধীরে, প্রত্যাবৃত্ত হল স্তব্ধতা এবং নির্জনতা।

শব-যাত্রার দৃশ্যটি নিবারণের চোখের সম্মুখেই সংঘটিত হ'ল, কিন্তু শোকের কোনো বাহ্য আবেগ তাকে স্পর্শ করল না, দৃশ্যটি দেখল এবং তারপর খাটের উপর শুয়ে বইল নিস্পন্দ।

তারপর ধীবে ধীরে দিবাবসান হ'ল, ঘনিয়ে এল শীতের ঘন-রাত্রি এবং কিছু বাদেই চারিদিক বিদ্যুৎহীন — লোডশেডিং। চতুর্দিক থমথমে, অন্ধকারে আবৃত পরিবেশ।

আলো কিম্বা অন্ধকার, কোনো কিছুতেই কিছু আসে যায় না নিবারণেব, ভাবলেশহীন, শুয়ে থাকল খাটটির উপর। কিছু বাদে, বুঝি কোনো পরিজন, একটি হ্যারিকেন এনে শিখাটিকে মৃদু ক'রে রেখে গেল ঘরের কোণে।

এই অন্তহীন শূন্যতায়, এই ভাসমান মানসিকতায়, একটুখানি তন্দ্রার আবেশ এসেছিল কখন যেন নিজেরই অজান্তে, এবং সেই তন্দ্রাচ্ছন্নতায় নিবারণ দেখল, একটি ছায়ামূর্তি যেন ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে আসছে তার দিকে, এবং ছায়ামূর্তিটি এসে সন্তর্পণে হাত বাখল তার পায়ের উপর।

হারিকেনের ক্ষীণ আলোয় বদ্ধ ঘরের স্বল্পালোকে রহস্যময় পরিবেশ।

তন্দ্রার ঘোরেই নিবারণ প্রশ্ন করে — 'কে?'

কোনো উত্তর নেই।

শোকাচ্ছন্নতাব মধ্যেও সচকিত হ'ল নিবারণ। তার পায়ের উপর একটি ভার অনুভব করে।

— 'কে, কে ওখানে?'

কণ্ঠ তার বাষ্পাকুল, নিবারণের পা দু'টি তেমনই জড়িয়ে ধ'রে রাখে ব্যগ্র ব্যাকুলতায়, সে বলে—

— 'আমি শঙ্করা দাসমশায়।'

শঙ্করা!! তার পুত্রহন্তা!!

শঙ্করার করতলের আবরণ থেকে গভীর বিতৃষ্ণায় পা দু'টি টেনে নেয় নিবারণ—

— 'তুই এখানে কেন শঙ্করা? আর কি চাস তুই?'

শঙ্করা আর যেন ধরে রাখতে পারেনা নিজেকে, অসম্বৃত আকুল কান্নায় বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে নিবারণের পদ-যুগল—

—‘ বিশ্বাস করেন দাসমশায়, আমি পলাশকে মারতে চাইনি, আমি পলাশকে মারতে চাইনি!’

দীর্ঘক্ষণ স্তব্ধতা।

অন্ধকারে ভাসে নিবারণের প্রশান্ত সমাহিত কণ্ঠস্বর—

— ‘ওঠ্, উঠে বোস্ শঙ্করা! তোর কোনো দোষ নেই। ও নিজের পাপেই মরেছে। আমি জানতাম, একদিন না একদিন ও এইভাবেই মরবে। তুই তো উপলক্ষ। ও যে পাপ করেছে, তাতে মরণ ছাড়া ওর গতি নেই। শুধু ভাবি, মৃত্যুতেও কি ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।’

সারাদিন-ব্যাপী নিবারণের যে চোখ দু’টি ছিল অশ্রুহীন, দহ্যমান, এবার সেখানে বর্ষার বারি ধারার মতো শুরু হ’ল অঝোর বর্ষণ, অশ্রুপাত।

যে অন্ধকার এবং বিষণ্ণতার মধ্যে শঙ্করা এসেছিল নিবারণের বাড়ী, ফিরে যাবার পথে সেই অন্ধকার এবং সেই বিষণ্ণতা যেন তাকে গ্রাস করল ততোধিক ঘনত্বে, গাঢ়তায়।

।। চব্বিশ ।।

ঘটনাটি সমগ্র অঞ্চলে ব্যাপক প্রচার লাভ করল, উত্তেজনা সঞ্চারিত করল জন-জীবনে, এবং নানাবিধ আলাপ-আলোচনা ও বাগ্-বিতণ্ডার পরিস্থিতি নির্মিত হ’ল স্বভাবতঃই।

সপ্তাহখানেক পূর্বে বিন্তির নিরুদ্দেশ ঘটে, কিন্তু নিরুদ্দেশের যথার্থ কারণটি আবিষ্কৃত না হওয়ায় ঘটনাটিকে কেন্দ্র ক’রে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনাই চলছিল মাত্র। কিন্তু পরপর দু’টি ঘটনা এবং দু’টি ঘটনাই পরস্পরের সঙ্গে অন্বিত, ত্রাস এবং উত্তেজনার সঞ্চার ঘটাল এতদঞ্চলের জন-মানসে। বিন্তির অপহরণ এবং তার বন্দীদশা থেকে শঙ্করা কর্তৃক তাকে মুক্ত করা, এবং বিন্তিকে মুক্ত করতে গিয়ে পলাশকে খুন করা, —এসব ঘটনায় জনজীবনে বিস্তর ডামাডোল তৈরী হ’ল।

বিন্তির নিরুদ্দেশের মূলে তাকে অপহরণ, বন্দী ক’রে রাখা, সম্মিলিত পাশবিক অত্যাচার — এবং এ ঘটনাগুলির যারা সংঘটক, তারা স্থানীয় অঞ্চলেরই বাসিন্দা, এসব বৃত্তান্ত ব্যাপক ভীতি ও অস্বস্তি ছড়াল মানুষের মনে। সব বাড়ীতেই কমবেশী যুবতী বধূ বা কন্যা আছে, এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে তাদের নিরাপত্তা কোথায়? জীবিকার প্রয়োজনে বিন্তির ন্যায় সব মেয়েকে হয়ত অহরহ ঘরের বার হতে হয় না, কিন্তু লোভীর হাত যদি একবার প্রসারিত হয়, তখন বিলুপ্ত হয়ে যায় ঘর বাইরের সীমারেখার ব্যবধান — এ সিদ্ধান্তটিতে ঐকমত্য স্থাপিত হ’ল সর্বত্র। ফলে অধিবাসীরা উদ্বেগ পোষণ করতে থাকেন বাড়ীর যুবতী রমণীদের সম্পর্কে এবং এসব মেয়েদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণে সতর্ক থাকতে ঘন ঘন আহূত হয় পারিবারিক বৈঠক।

পলাশের মতো সমাজবিরোধীর মৃত্যুতে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল, কিন্তু তার শাগরেদগুলো যে সবাই জীবিত এবং একটাও ধরা পড়েনি, এতে আতঙ্কিত থাকল সবাই। নতুন ক’রে এরা কোথায় কি ঘটাবে, সেটা অননুমেয়, ফলে উদ্বেগের কারণ। পলাশের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেও এই সমাজ-বিরোধীটির দাপটের আবসান ঘটায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অনেকে এবং ধন্যবাদ দিলো শঙ্করাকে। চাল-পার্টির শঙ্করা, সেও সমাজ-বিরোধী হিসেবেই বিদিত, এবং শঙ্করাকে যে সবাই পছন্দ করে, তাও নয়, তবু এক্ষেত্রে ধন্যবাদের পাত্র হ’ল শঙ্করা।

আবার, এটি নিছকই দুই সমাজবিরোধী দলের লড়াই, এবং একটি ঘটনাতেই এটা নিবৃত্ত হবে না, ভবিষ্যতে অধিকতর গুরুতর আকার ধারণ করবে, এ-জাতীয় মন্তব্যও করল অনেক স্থানীয় সদ্‌বংশীয় বুদ্ধিজীবী।

তবে, শঙ্করার যারা শুভানুধ্যায়ী, তারা অনুমান করতে পারল, শঙ্করার সম্মুখে নিশ্চিত একটি দুর্যোগ সমাসন্ন। পলাশ যত বড়ো দুষ্কর্মই করুক, সে বিষয়ী অর্থবান নিবারণ দাসের একমাত্র পুত্র, এবং তার মৃত্যুর কারণ ঘটিয়ে সহজে পরিত্রাণ পাবে না শঙ্করা। নিবারণ অবশ্যই এর প্রতিশোধ নেবে। প্রতিপত্তিশালী বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা হীরুবাবুর সঙ্গেও যে পলাশের যথেষ্ট সুসম্পর্ক ছিল, এটিও সুবিদিত, এবং হীরুবাবুও যে যথেষ্ট জোরালো ভূমিকা নেবেন এক্ষেত্রে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতে পারেনা।

তবু সব কিছু মিলিয়ে, উমাপতির বাড়ীতে একটি স্বস্তির হাওয়া। বিন্তি যে জীবন্ত ফিরে এসেছে, এবং শঙ্করারও কোনো বড়ো রকমের বিপদ ঘটেনি, এর থেকে বড়ো প্রত্যাশা আর কি থাকতে পারে?

অনুভা মালতী মানদা ছানুবালা রতন বরুণ এবং চাল-পার্টিতে যারা শঙ্করার একান্ত আপনজন, তারা কদিন নিয়মিত উমাপতির বাড়ীতে যাতায়াত করতে থাকে, খোঁজখবর নেয় বিন্তির।

বিন্তিকে উদ্ধারের রাত্রি থেকে শঙ্করা ওর মাকে নিয়ে এসেছে উমাপতির গৃহে। রান্নাবান্না, বিন্তির সেবা-যত্ন, উমাপতিকে শঙ্করাকে খাওয়ানো — সমস্ত দায়িত্ব সুবালা তুলে নিয়েছে নিজের উপর, এবং দু' হাতের নিয়ত পরিশ্রমে যেন সে আড়াল ক'রে রাখতে চায় এই বিহ্বল মানুষগুলোকে। বিশেষতঃ বিন্তিকে যেন সংগোপনে লুকিয়ে রাখতে চায় পক্ষিমাতার মতো তার পক্ষপুটে। নারীত্বের কত বড়ো গ্লানি যে বিন্তিকে ঘিরে, সে তো জানে সুবালা! মমতার এক স্থির কেন্দ্রে সে সমাসীন, লক্ষ রাখে নিবিড় সতর্কতায়, কেউ যেন এসব প্রসঙ্গ না তোলে বিন্তির কাছে। কোনো লজ্জা, কোনো গ্লানি যেন তাকে না পারে স্পর্শ করতে। অন্য কথায় , অন্য প্রাসঙ্গিকতায়, সংসারের ভিন্ন আর পাঁচ আলোচনায় যেন আবরণ নির্মাণ ক'রে দিতে চায় সুবালা বিন্তির সব কলঙ্ক আর অপমানের উপর।

দিনের পর দিন এই লাঞ্ছনা অত্যাচার অপমান, একদা নিরূপায় তাকেও সহ্য করতে হয়েছিল পশুদের হাতে। চোখের সামনে নিমেষে খুন হতে দেখেছিল স্বামীকে। সেই সব ঘটনা, নারকীয় পাশবিকতা, সহ্য করতে পারেনি তার স্নায়ু। পাগল হয়ে গিয়েছিল সুবালা। সুবালা পাগল হয়ে গিয়েছিল বলেই বোধহয় পেরেছিল সব বোধের ঊর্দ্ধে উঠতে। কিন্তু বিন্তি তো পাগল হয়নি, সুস্থ মাথায় পারবে কি সে সমস্ত ঘটনাকে মেনে নিতে সহজ স্বাভাবিকতায়!

উদাস বিষণ্ণ চোখে বিন্তি যখন তাকিয়ে থাকে আপন মনে, সেই শূন্য দৃষ্টিপাতে চকিতে কাঁপন জাগে সুবালার বুকের গভীরে, হতভাগী কোনো অঘটন ঘটিয়ে বসবে না তো?

দ্রুত ছুটে যায় ওর কাছে। হাতে হয়ত সদ্য তৈরী কোনো খাদ্য—

— 'এডা এট্টু খাইয়ে ন্যাও মা বিন্তি।'

মুখ ফিরিয়ে নেয় বিন্তি। সমস্ত অবয়বে, দৃষ্টিপাতে, চূড়ান্ত বিতৃষ্ণা।

সেই উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিকে স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনতে সুবালার ব্যাগ্র প্রয়াস

—'কি হলো, এডা খাইয়ে ন্যাও মা।'

বিন্তি ঘুরে বসে। খাবারটুকু খেয়ে নেয় নির্বিবাদে। ওর মাথায় সস্নেহ হাতের স্পর্শ রাখে সুবালা।

—'লক্ষ্মী মা আমার!'

বিন্তির চোখে অশ্রুধারা।

সে অশ্রুতে বুঝি স্বস্তি নামে সুবালার মনে। কাঁদুক, হতভাগী কাঁদুক, বুকের ভার যদি বুকের মধ্যেই জমিয়ে রাখে, সে যে বড় ভয়, কেঁদে কেঁদে, অশ্রুধারায়, ক্ষয় হয়ে যাক ওর বুকের যত ভার, যত গ্লানি।

ঘটনা-রাত্রির পরদিন সকালে আবার এসেছিলেন ডাক্তারবাবু, শঙ্করার হাতের ব্যাণ্ডেজ পরিবর্তন ক'রে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছেন। বিন্তির প্রথমিক দুর্বলতা এবং অসুস্থতার স্বল্প উপশম হওয়ায় আপাততঃ স্থগিত রেখেছেন হাসপাতালে যাওয়া। তবে পূর্ণ বিশ্রাম এবং উদ্বেগাদি পরিহারের ব্যাপারে কঠোর ভাবে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। শরীরে বলাধান এবং অন্যান্য উপসর্গাদি দূর করার জন্য ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন আনুষঙ্গিক ঔষধাদির।

নিত্যদিনের জীবন-সংগ্রাম অব্যাহত, চালের খেপ নিয়ে কলকাতায় যাওয়া, ওরই মধ্যে যে যার সময় বুঝে চালপার্টির ঘনিষ্ঠ জনেরা হাজির থাকে বিন্তিদের বাড়ীতে, হাসি-কলরোলের মধ্য দিয়ে যেন নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে চায় এবাড়ীর বিষাদ, দুর্ভাবনা, —যাবতীয় অমঙ্গলের কুটিল ছায়া। তাদের প্রাত্যহিক কঠিন কঠোর জীবন-সংগ্রাম, এবং যার কেন্দ্রমূলে অধিষ্ঠিত বিন্তি আর শঙ্করার নেতৃত্ব, বিপর্যয়ের চূড়ান্ত আঘাতে তা বিপর্যস্ত লণ্ডভণ্ড, ভবিষ্যতের নানাবিধ অনিশ্চিত আশঙ্কায় দোদুল্যমান। তবু সমস্ত বিপর্যয়ের মধ্যেও তাদের মধ্যে শঙ্করা আর বিন্তির শারীরিক উপস্থিতি উজ্জীবিত করে তাদের। নারীপুরুষ নির্বিশেষে শ্রমশীল, রুজি-রোজগারের ধান্দায় নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে নিয়ত সংগ্রামশীল মানুষগুলি পারস্পরিক ঐক্য ভালবাসা সহানুভূতির একটি নিষ্ঠ এবং মমতাশীল বৃত্তে সংবদ্ধ হয়।

শঙ্করার জখম হাত ক্ষোভের তাপ ছড়ায় রতনের চোখে

—'তুমি একা কেন গেলে শঙ্করাদা, আমাকে একবার খবর দিতে পারলে না? যদি তোমার কিছু হয়ে যেত? কি হ'ত বলো তো তাহলে?'

শঙ্করার ক্লিষ্ট মুখে মৃদু স্মিত হাসি।

রতনের চোখে বারুদ জ্বলে— 'একটা তো গেল, কিন্তু আর বদমায়েশগুলো সব পার পেয়ে গেল।'

উমাপতি গৃহকোণে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, একান্তে যেন সংগুপ্ত রাখতে চান নিজেকে। গভীব এক মর্মপীড়া তাকে বিদ্ধ করে নিয়ত।

শঙ্করা এবং সুবালা এখন এ বাড়ীতেই অধিষ্ঠিত। সুবালার অনাহুত উপস্থিতি, মায়ের মমতায় প্রাণ-ঢালা সেবা এবং এসব না ঘটলে যে বিন্তিকে বাঁচানো দুঃসাধ্য হ'ত, এটা বিলক্ষণ উপলব্ধি করেন উমাপতি। সুবালার শ্রমে, সেবা-যত্নে, উমাপতির গৃহটি, যা দীর্ঘদিন যাবৎ ছিল নিতান্ত ছন্নছাড়া, সেখানে স্বল্প সময়েই গৃহ-জীবনের একটি মেদুর স্বাদ সঞ্চারিত হয়েছে, এটাও অনুভব করেন উমাপতি। সুবালার কুশলী রান্নাবান্না, পরম যত্নে পরিবেশন, এগুলিতে আপ্লুত হন তিনি, এবং এসবের জন্য তাঁর দীর্ঘ গৃহ-সুখ-বঞ্চিত জীবনে যে একটি তৃষ্ণাও ছিল, এটাও তাঁর উপলব্ধিতে ধরা পড়ে। কিন্তু তবু এক মর্মপীড়া তাকে আহত করতে থাকে।

জাতি-ধর্মের ব্যাপারে কোনো প্রবল গোঁড়ামি তার নেই, কিন্তু দীর্ঘদিনের ব্রাহ্মণ্য-ধারণায় লালিত সংস্কারগুলোকে তিনি অতিক্রম করতে পারেন না। পরোপকারী, শ্রমশীলা এবং বর্তমানে তাঁর সংসারে অপরিহার্য, তবু সুবালা নাম্নী এই নিম্নবর্ণের রমণীটির হাতে তার পাচিত অন্নগ্রহণে

সঙ্কোচ হয়। দ্বিধায় আচ্ছন্ন হয় মন। মানুষ সবাই সমান, কিন্তু জাতি-ধর্মের বিভেদ না মানা, খাদ্যা-খাদ্যে সমীকরণ, নিম্নবর্ণের স্পৃষ্ট অন্নগ্রহণ, এসব যে অপরাধ, এবং সে অপরাধ যে স্বর্গত পূর্ব-পুরুষদের কাছে ক্ষমাযোগ্য বিবেচিত হবে না, এ চিন্তা তাঁকে পীড়া দেয়। অন্য সব সংস্কার অতিক্রম করতে পারলেও অন্নের সংস্কার অতিক্রম করা কঠিন।

জাতিধর্ম সব লুপ্ত হয়ে গেল, আর ঘোষাল-বংশের ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার, অহমিকা—সবকিছুতে চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটাল বিন্তির জীবনের চরম কলঙ্কজনক এই অধ্যায়। পিতা হয়ে তিনি কন্যার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হননি, কন্যার কুমারীত্ব, নারীত্বের নিরাপত্তার ব্যবস্থা-টুকুও করতে ব্যর্থ হলেন, এবং তাঁর কন্যাটির এই কলঙ্ক যে একান্তই দুরপনেয়, অনন্ত নরকেও এর প্রায়শ্চিত্ত হবে না, অকলঙ্ক বংশের স্বর্গবাসী পূর্বপুরুষরা যে কোনোদিনই উমাপতিকে ক্ষমা করবেন না, এ চিন্তা তাঁকে দুঃসহ মর্মপীড়ায় আচ্ছন্ন রাখে।

একান্ত বাস্তব সঙ্কটও কম তীব্র নয়। তাঁর এই কলঙ্কিতা মেয়েটির কি গতি করবেন তিনি? বিন্তির এই কলঙ্ক যে আবোপিত, এর জন্য যে সে নিজে দাযী নয, একথা এই সমাজ, এই সমাজের ধারকেরা বুঝবে না, আড়ালে আবডালে এটা তাদের হাসির খোরাক জোগাবে। কলঙ্কিতা মেয়েটিকে লোকলজ্জায় লুকিযে থাকতে হবে গৃহকোণে, বিবাহেব সম্ভাবনা সুদূর পরাহত, অপমানিত লাঞ্ছিত অসহনীয় এক জীবন। এসব চিন্তা অসহায়, বিব্রত, ন্যুব্জ মানুষটিকে আরো যেন বেহাল এবং বিপর্যস্ত ক'রে রাখে: মানুষের সান্নিধ্য থেকে তিনি সংগোপনে লুকিয়ে রাখতে চান নিজেকে, বৃদ্ধি পায় তাঁর জীবনের বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা।

দিনগুলি তাব নিজস্ব নিযমে অতিক্রান্ত হয় এবং এভাবেই গত হয দশটি দিন। উমাপতির গৃহে মায়ের হাতের রান্না খেয়েই শঙ্করা গিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকে নিজস্ব বাড়ীতে, ভাঙা ঘরটিতে। হাতের ক্ষত এখন অধিকাংশই নিরাময়, সাময়িক দুর্বলতার ভাবটিও অন্তরিত, কিন্তু ক্রমশঃ অসহ্য বোধ হচ্ছে এই কর্মহীন গৃহবন্দী জীবন।

অন্য দিকটিও চিন্তার বিষয়। রুজি-রোজগার-হীন অবস্থায় দীর্ঘদিন কাটলে আর্থিক সমস্যা দেখা দেবে। সঞ্চিত অর্থ কিছু হয়ত ছিল, কিন্তু বিন্তি এবং তার চিকিৎসা-জনিত মহার্ঘ ওযুধ-পত্রে সে অর্থ ব্যয়িত হয়েছে যথেষ্টই এবং বর্তমানে প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। এর উপর প্রতিদিন চার জন লোকের অন্নের ব্যবস্থাদি। সুতবাং অবিলম্বে আয়-পত্রের ব্যাপারে যে উদ্যোগী হওয়া একান্ত দরকার, এটাও সম্যক উপলব্ধি করে শঙ্করা।

রাত্রে এসে শঙ্করা খেতে বসলে সযত্নে ভাত বেড়ে দেয সুবালা। পবিবেশন করে পার্শ্বে উপবিষ্ট থেকে।

নতমুখে খেতে প্রশ্ন করে শঙ্করা—

— 'কি ভাবে চালাচ্ছো মা, আমার তো রোজগারপাতি বন্ধ।'

— 'সে তুই ভাবিস্‌নে বাবা, আমার হাতে আরো কয়ডা টাহা আছে। রতনরে দিয়ে কিছু বাজার করায়ে নিছিলাম। তাই দিয়ে চল্‌তিচে। তুই যদি পারিস্ তো কাল সহাল ব্যালায় বাজারে যাইয়ে কিছু চাল ডাল আর আনাজ-পাতি নিয়ে আসিস।'

—'আমিও ভাবছি কাল একবার বেরোবো মা। যা যা লাগে, তখন বলে দিও। আর ভাবছি, পরশু থেকে কাজে বের হবো। এভাবে কাজ-কর্ম বন্ধ ক'রে বসে থাকলে চলবে কি করে?'

এর উত্তরে সুবালাকে নির্বাক থাকতে হয়, কারণ যথাশীঘ্র আয়-পত্রের ব্যবস্থা না হলে যে হাঁড়ি অচল হবার সম্ভাবনা, সে তো নিশ্চিত, সুতরাং ছেলের শারীরিক সুস্থতা বা অসুস্থতাকে এখানে উপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, এটা নিশ্চিত বোঝে সুবালা। সুতরাং একটি উদগত দীর্ঘশ্বাসকে বুকের মধ্যে সংগুপ্ত রেখে পরিবেশনে মনোযোগী হয় সে।

প্রতিদিন রাত্রে আহারাদির পর এ-বাড়ী থেকে যাবার আগে শঙ্করা এসে নিঃশব্দে বসে বিন্তির শয্যাপার্শ্বে। বিন্তিও প্রার্থিত এ-সময়টুকুর জন্য প্রতীক্ষা ক'রে থাকে সাগ্রহ ব্যাকুলতায়।

শঙ্করা এসে তার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হলেই উজ্জ্বল আলোকিত হয়ে ওঠে তার নিষ্প্রভ ক্লান্ত চোখ দু'টি। দেহ তার এখনো অবসন্ন দুর্বল, ডাক্তারের নির্দেশে, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে শয্যাত্যাগ নিষিদ্ধ, ঘুমের ওষুধের ক্রিয়ায় দিন-রাত্রের দীর্ঘ সময়ই অতিবাহিত হয় নিদ্রাবেশে, তবু শঙ্করার উপস্থিতির এ-সময়টুকুর জন্য সে থাকে প্রতীক্ষিত, অবসাদ নিদ্রা দুর্বলতাকে দূরে সরিয়ে রাখে প্রাণপণে।

আজও যথারীতি শঙ্করা এসে উপবিষ্ট হয় বিন্তির শয্যাপার্শ্বে। হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় বিন্তির আয়ত চোখ দু'টির দৃষ্টি কোমলতায় গভীরতায় ন্যাস্ত হয় শঙ্করার মুখমণ্ডলে। সে দৃষ্টিতে কত না-বলা কথার আলোছায়ার হাজার অভিব্যক্তি।

বিন্তির শীর্ণ হাতখানি ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়ে আসে শয্যাপার্শ্বে, শঙ্করা বারেক দৃষ্টি সঞ্চালিত করে দরজার অভিমুখে, তারপর বিন্তির হাতখানা তুলে নেয় নিজ করতলে। নিঃশব্দে কয়েক মুহূর্ত হাতখানাকে জড়িয়ে রাখে নিজের মুষ্টিতে প্রগাঢ় মমতায়, তারপর সন্তর্পণে বিছানার উপর নামিয়ে রাখে হাতখানা।

আনন্দে বিষাদে বিন্তির চোখে চিক চিক করে দু' বিন্দু অশ্রু।

সকালের দিকে বেলা কিছু উর্ধ্বমুখী হতে কিছু টাকা এবং দু'টি থলি নিয়ে শঙ্করা স্টেশন-বাজারের অভিমুখে রওনা হয়।

কদিন গৃহবন্দী থেকে সুপরিচিত যাত্রাপথটিকে যেন নতুনতর মনে হয়, এবং অকস্মাৎ কোনো পথচারীর মুখোমুখি হ'লে, পথচারীটি একবার তার দিকে দৃষ্টিপাত মাত্রই দ্রুত পাশ কাটায়। শঙ্করা মনে মনে হাসে, এবং অনুমান করে, তার বেপরোয়া ভয়ঙ্কর চরিত্রের যে রূপচিত্রটি এতদঞ্চলে প্রচলিত ছিল, পলাশের মৃত্যুকে কেন্দ্র ক'রে সেখানে যুক্ত হয়েছে আর একটি সদ্য-আহৃত নতুন পালক। অতএব শান্তিপ্রিয় নাগরিকের পক্ষে তার সঙ্গ বা সান্নিধ্য নির্দ্বিধায় পরিত্যাজ্য।

বাজারে প্রবেশ করার পূর্বে অকস্মাৎ তার বাসনা হয়, স্টেশনের প্লাটফর্মের ও-দিকটা একবার ঘুরে আসার।

প্লাটফর্মে উঠে এ-পাশ ও-পাশ বিচরণ করে কিছুক্ষণ, প্লাটফর্ম অতিক্রম ক'রে রেললাইন ধ'রে উদ্দেশ্যহীন এগিয়ে যায় সামনে। অদূরেই খাল, এই খালটিই পার্শ্বস্থ অঞ্চলটিকে চক্রাকারে বেষ্টন ক'রে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে তাদের বাসস্থানের সন্নিহিত অঞ্চল দিয়ে। রেল লাইনের পার্শ্বে একটি ঝাঁকড়া পিটুলি গাছ, তার তলদেশটিতে বৃহদাকার প্রস্তর-খণ্ডের স্তূপ, ভাঙন থেকে খালপাড়কে সুরক্ষিত করার কাজে এগুলি ব্যবহৃত হবে। অপেক্ষাকৃত নির্জন পরিবেশ।

একটি প্রস্তর-খণ্ডের উপর গিয়ে উপবিষ্ট হয় শঙ্করা। নিঃশব্দে অতিবাহিত হয় সময়। খালের উপর ব্রিজ, ব্রিজের উপর লম্বমান রেললাইন, রেললাইনটি ক্রম-প্রসারিত হয়ে পৌঁছে গিয়েছে কলকাতায়। প্রতিদিন এই পথ যে তাকে কতবার অতিক্রম করতে হয়, ফিরে আসতে হয় কতবার।

রেললাইন ধরে ইতস্ততঃ লোকজনের যাতায়াত, নির্জন খালপাড়, রেললাইনের সুদূর-প্রসার ব্যাপ্তি, এবং শীতের সকালের ঝুপ্‌সি পিটুলি গাছের তলার এই শান্ত শীতল স্তব্ধতা, ধীরে ধীরে সম্মোহিত করতে থাকে শঙ্করাকে। বিগত দশ দিনের একান্ত বাস্তব ঘটনাগুলোকে স্বপ্নবৎ মনে হয়।

সেদিনের রাত্রির ঐ ঘটনাগুলো কি সত্যিই ঘটেছিল? আর ঐ ঘটনাগুলোর মূল কেন্দ্র কি সে-ই অবস্থিত ছিল?

চতুর্দিকে আজ প্রচারিত, শঙ্কবা খুনী, শঙ্কবা হত্যাকারী। তাব নামেব সঙ্গে খুনীর নাম আজ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তীব্র এক যন্ত্রণা শঙ্করার মস্তিষ্কেব কোষে কোষে আগুন ছড়ায়।

কালু গুণ্ডার দলে থাকতে অনেক সময় শঙ্করা সাধারণ মাবামারিতে অংশ নিয়েছে, নিতে বাধ্য হয়েছে। তালিমও নিয়েছে এ-সবের। নির্মমতা নিষ্ঠুবতার সঙ্গে সে অপরিচিত নয়, চোখের সামনে 'দু' চারটে খুনও সে হতে দেখেছে, কিন্তু তাব নিজেব হাতে কখনো খুনের দাগ স্পর্শ করেনি।

সেদিন সত্যি সত্যি কি ঘটেছিল ঘটনাটা?

স্মরণ করার চেষ্টা করে শঙ্করা, সে কি যথার্থই খুনী? সে কি সত্যিই খুন কবেছে পলাশকে? পলাশের জঘন্য অপরাধের শাস্তি সে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সে কি চেযেছিল পলাশকে খুন করতে?

না, সে তো পলাশকে মারতে চায়নি। পলাশই তো তাকে আগে আক্রমণ কবেছিল। ভাগ্য ছিল তার সহায়, নাহলে পলাশের নিক্ষিপ্ত ছোরা তো তার বুকেই বিদ্ধ হ'ত। সেক্ষেত্রে তারই মৃত্যু ছিল অবধারিত। পলাশকে খুন করার ইচ্ছে থাকলে, সে তো গুপ্তি ছুঁড়ে আগেই কাজটা সম্পন্ন করতে পারত। কিন্তু সে চেষ্টা সে করেনি। ফলে, তারই জীবন বিপন্ন হযেছিল প্রথমে।

পলাশের ছোবার আঘাত থেকে শরীর বাঁচাতে গিয়ে সে টাল সামলাতে পারেনি, ডান হাত জখম হয়েছিল ছোরার আঘাতে, পড়ে গিয়েছিল ছাদের উপর। তাকে টপকে পালাতে চেয়েছিল পলাশ। অগত্যা লাথি মেরে ফেলে দিয়ে হাতে-নাতে ধরতে চেযেছিল পলাশকে। কিন্তু তাকে লাথি মেবে ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে তাকে খুন কবার ইচ্ছে তো কখনও ছিলনা শঙ্করার।

যা ঘটেছে, সবই ভাগ্যের খেলা। কিন্তু তবু সে আজ খুনী, পলাশের হত্যাকারী হিসেবেই চিহ্নিত হ'ল! সে-ই যে পলাশের মৃত্যুর উপলক্ষ, সত্য হিসেবে একে তো অস্বীকার করাও যায় না।

কি যে সত্য, আর কি যে মিথ্যা, বুঝে উঠতে পারে না শঙ্করা, আর সেই সত্য-মিথ্যাব গোলক-ধাঁধায় ঘূর্ণী হাওয়া বয় তার মস্তিষ্কে।

আরো কিছুক্ষণ নিঃশব্দ যন্ত্রণায় অতিবাহিত হয় সময়, অতঃপর শঙ্করা ফিরে আসে প্লাটফর্মে, প্লাটফর্ম অতিক্রম করে, রেললাইন পার হয়ে বাজারে ঢোকার উপক্রম করে।

দেশে এখন জরুরি অবস্থা এবং নকশালদের ক্রিয়াকলাপ বন্ধের জন্য সার্বিক তৎপরতা, ফলে পুলিশের প্রতাপ বড়ই প্রবল। প্রায়শঃই জীপ হাকিয়ে তাদের আনাগোনা করতে দেখা যায় যত্রতত্র। ফলে, তার পাশ দিয়ে একটি পুলিশের জীপ যে সবেগে অতিক্রম ক'রে গেল এবং কিছুদূর অগ্রসর হয়েই যে জীপটি আবার পশ্চাদ্-মুখী হয়ে এদিকে প্রত্যাবৃত্ত হচ্ছে, এসব ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিলনা শঙ্করা। বাজারের প্রবেশপথে পা বাড়ায় অন্যমনস্ক।

অকস্মাৎ জীপটি সগর্জনে তার পাশে এসে ব্রেক কষে এবং উল্লম্ফনে নামে জনা পাঁচ ছয় বন্দুকধারী পুলিশ।

ওরা চতুর্দিক থেকে আচমকা ঘিরে ধরে শঙ্করাকে এবং একজন বলে —'তোর নাম শঙ্করা? তোর নামে ওয়ারেন্ট আছে, তোকে এ্যারেস্ট করা হ'ল। ভালই হ'ল, আমাদের আর তোর বাড়ী পর্যন্ত যেতে হ'লনা।'

একজন এসে তার হাতে হাতকড়া পরায়।

শঙ্করা বাধা দেয়না, এবং বাধা দিতে যাওয়াটা যে নিতান্তই অর্থহীন, বিশুদ্ধ বোকামি, এটা বোঝে শঙ্করা, কারণ এতগুলি সশস্ত্র পুলিশের হাত এড়ানো কোনো মতেই সম্ভবপর নয়। এক সময়ে না এক সময়ে খুনের কেসে তাকে যে গ্রেফতার হতে হবে এবং এটা যে একান্তই অবধারিত, এ বিষয়ে একরূপ নিশ্চিতই ছিল শঙ্করা। সুতরাং নির্বিরোধে শান্ত নিরাসক্তভাবে গ্রেফতার মেনে নিল।

বাজার এলাকায় শঙ্করা যথেষ্টই পরিচিত। বাজারের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী নিবারণ দাসের একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত হয়ে তার সেই নামটির পরিচিতি অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করেছে। সুতরাং স্বল্প সময়েই শঙ্করার গ্রেফতারের ঘটনা ব্যাপক প্রচার লাভ করল বাজার-অঞ্চলে এবং তা সম্প্রসারিত হতে থাকল এতদঞ্চলের বিশাল জনপদটিতে।

পলাশের মৃত্যুটি অপঘাতে সুতরাং শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী শ্রাদ্ধ-শান্তি সম্পন্ন করতে হয়েছে চারদিনের মাথায়। শোকের প্রবল অভিঘাত সামলে আবার দোকানে বসতে শুরু করেছে নিবারণ। শোক বিস্মরণের পক্ষে কাজের মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন রাখাই বোধহয় সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। নিবারণও দোকানের ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ-কর্মের ব্যস্ততায় নিজেকে নিমগ্ন ক'রে ভুলতে চেয়েছে একমাত্র তরুণ পুত্রকে হারানোর দুর্বিষহ শোক।

দোকানে খরিদ্দারদের ভিড়, বিক্রি-বাটার ধুম। দোকানের গদিতে নিবারণ সমাসীন।

পার্শ্ববর্তী দোকানের একটি ছেলে ছুটে আসে দ্রুত —

— 'ও দাসমশায়, শুনেছেন?'

চোখ দু'টি তুলে নিস্পৃহ তাকায় নিবারণ।

— 'শঙ্করাকে বাজারের মুখ থেকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশ।'

বিষম চমক খায় নিবারণ। তার সব নিস্পৃহতা দূরীভূত হয়ে উদ্বেগ ঘনায় কণ্ঠে— 'বলিস্ কিরে? কখন ধরল?'

— 'এই তো কিছু আগে। এখনো বোধহয় থানায় পৌঁছাতে পারেনি। ওকে ধরতে নাকি পুলিশ ওর বাড়ীতেই যাচ্ছিল। বাজারের মুখে ওকে পেয়েই খপ্ ক'রে ধরেছে। শঙ্করার হাতে বাজারের ব্যাগ ছিল, বোধহয় বাজার করতে এসেছিল।'

স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে নিবারণ।

ছেলেটি বক্ বক্ ক'রে চলে— 'এইবার ব্যাটা বুঝাব কত ধানে কত চাল। আমাদের পলাশকে তো ও-ই খুন করেছে। ফাঁসির দড়ি যদি না-ও পরতে হয়, চোদ্দ বছর জেলের ঘানি ওকে টানতেই হবে।'

শঙ্করার গ্রেফ্তারের সংবাদটি মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে গেল সর্বত্র, আপ ডাউনের চাল-ওয়ালাদের মধ্যেও ব্যাপ্ত হ'ল সংবাদটি।

স্থগিত হয়ে গেল ওদের চাল-চালানোর প্রাত্যহিক কর্মাদি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সবাই সমবেত হ'তে লাগল স্টেশনের ময়দানটিতে। ক্রমশঃ সংখ্যাবৃদ্ধিতে ওদের সমাবেশটি বেশ বৃহদাকার ধারণ করল।

অতঃপর শূন্য বস্তাগুলোকে মাথার উপর আন্দোলিত করতে করতে শ্রেণীবদ্ধ মিছিলের আকারে ওরা ছুটে চলল থানার অভিমুখে, মুখে মুখে রচিত হ'ল শ্লোগান

— 'আমাদের সাথী শঙ্করার—মুক্তি চাই, মুক্তি চাই।' —'আমাদের সংগ্রাম — চলছে চলবে।' — ইত্যাদি।

রাস্তার দু'পার্শ্বস্থ দোকানপাটের লোকজন, পথচারী জনতা, কৌতূহলী চোখে প্রত্যক্ষ করতে থাকল এই অপরূপ মিছিলটিকে। উচ্চারিত হ'তে থাকল নানারূপ সরস টীকা-টিপ্পনীও।

থানার সামনে গিয়ে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে ওরা অধিকতর উচ্চগ্রামে তুলল শ্লোগানের আওয়াজ।

থানার অফিসার-ইন-চার্জ প্রবীণ এবং বিচক্ষণ। তিনি বুঝলেন, এই ক্ষ্যাপাটে উত্তেজিত জনতার আবেগ অকৃত্রিম, কিন্তু তাৎক্ষণিক এবং সাময়িক। অনর্থক ঝুট-ঝামেলায় যাবার প্রয়োজন নেই, কিছু কৌশল প্রয়োগ ক'রেই শান্তিপূর্ণভাবে এটিকে নিরস্ত করা যাবে।

দু'পার্শ্বে দু'জন বন্দুকধারী কনস্টেবল নিয়ে ওদের পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন —'কি চাও তোমরা? এটা থানা। এখানে গোলমাল করছো কেন?'

ওবা শ্লোগানে শ্লোগানে তার প্রত্যুত্তর দিল— 'আমাদের সাথী শঙ্করাব — মুক্তি চাই, মুক্তি চাই।'

বিচক্ষণ দারোগাসাহেব দক্ষ অভিনেতার মতো হেসে বললেন —

— 'আরে, মুক্তি তো দিতেই হবে। কিন্তু বুঝতেই তো পারছ, মুক্তি তো আমি দিতে পারিনা। জজসাহেব বিচার করবেন, তিনি যদি মনে করেন, তোমাদের সাথী নির্দোষ , নিশ্চয়ই তাকে ছেড়ে দেবেন। এ নিয়ে তোমরা এত চ্যাঁচামেচি করছ কেন? যাও— যাও — বাড়ী যাও সব। শুধু শুধু ঝামেলা পাকিও না।'

দারোগা সাহেবের ইঙ্গিতে কনস্টেবল দু'জন তাক করাব ভঙ্গীতে উদ্যত কবে বন্দুক দু'টি, প্রয়োজনে বন্দুক দু'টি যে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে, এ ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ওদের দলটি ছিল নিতান্তই অসংগঠিত, হুজুগের মাথায় ওরা দলবদ্ধভাবে থানা পর্যন্ত এসেছে, কিন্তু প্রতিপক্ষের কৌশলী আচরণের জবাবে কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণের যোগ্যতা বা নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা ওদের মধ্যে কারোরই ছিলনা। বিশেষতঃ, এ স্থানটি হ'ল থানা এবং সাধারণ মানুষের মনে থানা সম্পর্কে একটি বিভীষিকা-মিশ্রিত অনুভূতি আছে, সেই স্থান-মাহাত্ম্যটি ওদেরও উত্তেজিত মানসিকতায় অচিরেই শীতলতা সঞ্চার করল। ফলে একে একে স্থান-ত্যাগ করল সবাই, গুটি গুটি পায়ে ফিরে এল স্টেশনে এবং লিপ্ত হ'ল নিজেদের দৈনন্দিন কর্ম-ক্রিয়ায়।

জন-জীবনে ব্যাপক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা-সৃষ্টি এবং খুনের দায়ে অভিযুক্ত হ'ল শঙ্করা, বিচারাধীন বন্দী হিসেবে তাকে চালান দেওয়া হ'ল জেল-হাজতে।

জীবিকার সংগ্রামে, প্রাণ-ধারণের নিরন্তর প্রয়াসের ক্ষেত্রে, শঙ্করা বিন্তির মতো হতভাগাদের কখনো মারে লোভী মানুষ, কখনো মারে পুলিশ। তাদের পায়ের নিচে মাটি নেই, পার্শ্বে প্রভাবশালী স্বজন নেই, তারা চিহ্নিত হয় সমাজবিরোধী নামে।

এই অনাত্মীয় বিভূঁই, এই উচ্ছিন্ন পরবাসে, কে তাদের বাঁচাবে!

।। পাঁচিশ ।।

চাল-ভর্তি বস্তা নিয়ে কলকাতার গাড়ী ধরার প্রস্তুতি নিচ্ছিল রতন।

বাজারে জনে জনে তখন সংবাদটি রাষ্ট্র এবং ব্যাপ্ত, শঙ্করার গ্রেফ্‌তারের খবরটি কানে এলো রতনেরও। চালের বস্তা দোকানে ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাস ছুটল বিন্তিদের বাড়ী।

সুবালার হাতে চা মুড়ি খেয়ে উমাপতি তখন নিজস্ব বিছানাটিতে উপবিষ্ট, বিন্তি সুবালার তত্বাবধানে প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করছে। বাজারের থলি নিয়ে প্রত্যূষে বেরিয়ে গেছে শঙ্করা, চাল ডাল তরকারি ইত্যাদি কিনে আনবে এবং শঙ্করা ফিরে এলে সুবালা রান্না চাপাবে। আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করছে সুবালা।

অকস্মাৎ, ঘোর-লাগা এক দানোর মতো, আদ্যন্ত ধাবমান, ঘরের কোণে আছড়ে পড়ল রতন —'ও মাসি, শুনেছো?'

দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সুবালা — 'কি হইছে বাবা রতন, অমন করে হাঁফাচ্ছো ক্যানো? কি হইছে?'

— 'শঙ্করাদারে পুলিশে ধ'রে নিয়ে গেছে মাসি।'

রতনের উত্তর শোনার জন্য ঘরের মধ্যে উৎকর্ণ অপেক্ষা করছিল উমাপতি, বিন্তি।

রতনের উক্তি তীক্ষ্মমুখ শরের মতো নিমেষে বিদ্ধ করল তিনজনকেই।

সুবালার হাতে ছিল একটি মাটির পাত্র। শিথিল হাত থেকে স্খলিত হয়ে যায় পাত্রটি, বিচূর্ণ হয়ে যায় মাটিতে প'ড়ে।

স্থিরবদ্ধ অনড় এক মূর্তির মতো খুঁটিব গায়ে ঠেসান দিয়ে বসে রইলেন উমাপতি।

রান্নাঘরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল বিন্তি, টাল খেয়ে মাথাটা ঘুরে যায়, খুঁটিটা জড়িয়ে ধ'রে পতন রোধ করে, এবং টলতে টলতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে বিছানায়। দাঁতে দাঁত চেপে দমন করতে চায় উদ্যত শোকাবেগ।

— 'আমি আর দেরি করব না মাসি, দেখি সবাইরে নিয়ে থানায় যেতে পারি কিনা। বড়বাবুরে বলব সবাই,— শঙ্করাদার কোনো দোষ নেই।'

রতন বেরিয়ে যায় ঝটিতি।

কিছুক্ষণ স্থির অনড় দঁড়িয়ে থাকে সুবালা। মস্তিষ্কের কোষে কোষে সহস্র ঝিঁঝিঁ পোকার সেই ঝঙ্কৃত রণন। তার চেতনায় যেন সঞ্চারিত হতে চাইছে এক সমাকুল অসংবরণ।

সেই কোন্ বাল্যকালে তার কোল শূন্য ক'রে হারিয়ে গিয়েছিল শঙ্করা। কোনোদিন কি ভেবেছিল, আবার সে ফিরে পাবে শঙ্করাকে? কিন্তু তবু তো পেয়েছিল। ভাগ্যচক্রের অমল প্রসন্নতা ফিরিয়ে দিয়েছিল তার শঙ্করাকে।

কিন্তু বিধিলিপির সেই স্বেচ্ছাচারী খেলার এই কি অন্তিম পরিণাম? আবার কি হারিয়ে যাবে তার শঙ্করা?

জীবনের অতিক্রান্ত দিনগুলো বড় ছলনাময়, এই দুঃখের মুহূর্তে দ্রুত উদ্ভাসে সুবালার চেতনাকে তারা ছুঁয়ে যায়।

পূব-বাংলার নিতান্ত গণ্ডগ্রামের এক চাষী বাড়ীর মেয়ে ছিল সে। দারিদ্র্য সে সংসারের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু সেই হা-অন্ন দারিদ্র্যের মধ্যেও ছিল মা-বাবার স্নেহ, প্রাণঢালা মমতায় মাখামাখি স্নেহনীড়। গ্রামে কলেরা লাগল মড়কের আকারে। প্রথমে মা, তারপর সাতদিনের মাথায় বিদায়

নিল বাবা। পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় এক শিশু-কন্যা। সেই নিরালম্ব নিরাশ্রয় শূন্যতার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল দূর সম্পর্কের এক মামা মামী। তারাও দীন দরিদ্র চাষী-বাসী মানুষ। কিন্তু সেই হতভাগিনী শিশু কন্যাটিকে পিতৃমাতৃস্নেহে তারাই লালন করেছিল। উপযুক্ত কালে তারা পাত্রস্থও করেছিল মেয়েটিকে। দবিদ্র সাদামাটা এক চাষী ছেলে, কিন্তু সুবালার জন্য ছিল তার হৃদয়-ভরা অফুরান ভালবাসা। দেশ ভাগের হিড়িকে গ্রামবাসীদের সঙ্গে সুবালা এবং ওর স্বামীও অনিশ্চয়ে পাড়ি দিয়েছিল এ-বঙ্গে। আজকের শঙ্করা তখন ওর মাতৃ-গর্ভে। সুবালা আর ওর স্বামী ধরা পড়ল সীমান্তে একদল মনুষ্যদেহ-ধারী জন্তুর হাতে। তরুণ স্বামী সহ্য করতে পারেনি স্ত্রীর ইজ্জতের অপমান, ফলে স্ত্রীর সামনেই তার ছিন্নশির ভূমিতে লোটায়, আর তারপর সেই নিদারুণ দিনগুলো। তার অন্তঃসত্ত্বা দেহটিকে ঘিরে দিনের পর দিন কামার্ত পশুগুলোর বিকৃত কামাচার।

ভাবতে অবাক লাগে সুবালার, এর পরেও সে জীবিত ছিল, এবং এখনো জীবিত রয়েছে।

ীমান্ত-স্টেশনের প্লাটফর্মে একদা শঙ্করা এসেছিল তার কোলে, এবং সেই শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে অতীতকে, যা এখন নিতান্ত এক দুঃস্বপ্ন, ভুলতে চেয়েছিল সে। সেই শঙ্করাও একদিন হারিয়ে গেল, তারপর আবার সেই তমসা, চেতনা কখনো সজীব, কখনো ছিন্নসূত্র, কিন্তু ভাগ্য তাকে স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় আবার ফিরিয়ে দিয়েছিল তার ছেলে শঙ্করাকে। ভেবেছিল, বুঝি তার দুঃখরাত্রির অবসান ঘটল, কিন্তু তার নিয়তি তাকে ঘিবে আবার এ কোন্ কুটিল পরিহাসের হাসি হাসল।

নিজেকে দৃঢ়, সংবৃত করার চেষ্টা করে সুবালা। দুর্ভাগ্যের হাতে সহ্য করেছে অনেক পীড়ন, উচ্ছিন্ন হয়েছে বারবার, কিন্তু আর সে দুর্ভাগ্যকে ডবাবে না। প্রতিকূলতা যদি আসে, পিছপা হবে না সংগ্রামে। পরাজয় যদি হয় অবধারিত, হাব মানবে, কিন্তু লড়াই ক'বে।

নিবক্ষর স্বল্পবুদ্ধি সুবালাও তার নারী-বুদ্ধিতে নিশ্চিত বোঝে, দু'টি পরিবারই এখন বেহাল, ভাঙনের মুখে। বিপর্যয় থেকে বাঁচাতে গেলে হাল ধরতে হবে তাকেই, কিন্তু সেই সর্বংসহা সহনশীলতায় স্থিত থেকে কতদিন সে পাববে এই আদ্যন্ত প্রতিকূলতায় টিঁকে থাকতে?

বার্তাটি ডাক্তারবাবুর চেম্বারেও পৌঁছায়। সমাগত রোগীদেব দেখাশোনা সাঙ্গ ক'রে দ্বিপ্রহরে ঘরে ফেরার মুখে তার দ্বিচক্রযানটি চালিয়ে হাজির হন উমাপতির বাড়ীতে। এগিয়ে এসে ডাক্তারকে নিঃশব্দ অভ্যর্থনা জানান উমাপতি, বারান্দায় পাতা বেঞ্চটাব উপব বসেন দু'জনে।

সুবালার আর্ত কণ্ঠ—'আমার শঙ্করারে পুলিশে ধবে নিয়ে গেছে ডাক্তারবাবু।'

ডাক্তারবাবুও বিমর্ষ—'শুনেছি আমি খবরটা।'

উমাপতির দীর্ঘশ্বাস — 'আর কত দুঃখ আমাদের পেতে হবে ডাক্তারবাবু?'

— 'মন শক্ত করেন মাস্টার মশাই। দুঃখ-কষ্টের নিয়মই বোধহয এই। এরা কখনও একা আসে না, আসার সময় সাঙ্গোপাঙ্গদের জুটিয়ে আনে। এখন আমাদেব চেষ্টা করতে হবে, শঙ্কবাকে যাতে জামিনে বের ক'রে আনা যায।'

উমাপতির কণ্ঠে হতাশ বিষণ্ণতা — 'কি দিয়ে যে কি হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারছিনা ডাক্তারবাবু। এ-রকম তো হবার কথা ছিল না। দিন দিন সমাজের এ-কোন্ রূপ দেখছি! মান-সম্মান থাকবে না বলে দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলাম, কিন্তু এখানেই বা কোন্ সম্মানটা বাঁচল! স্বাধীনতা, দেশ ভাগ, দেশত্যাগ — সবই তো হ'ল, কিন্তু দারিদ্র্য, মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা, এসব ঘুচল কই? সবই তো রয়ে গেল ডাক্তারবাবু!'

উমাপতির কথায় ডাক্তারের মনেও উত্তাপ, কণ্ঠে আসে আবেগের স্পর্শ

— 'উপরে উপরে কাজ ক'রে কিছু হয়না মাস্টার মশায়। সমাজের মূল কাঠামো বদলানো দরকার। রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম— কোনো কিছুই বদলাবে না— যদি মানুষের মনের ধর্ম না বদলায়। মানুষ দিন দিন বেসিক্যালি বড় অসৎ হয়ে যাচ্ছে। মানুষকে ব্যক্তি হিসেবে আগে সৎ হতে হবে, শুদ্ধ হতে হবে, নাহলে বাইরে থেকে চাপানো নিয়ম-কানুন, শৃঙ্খলা— কোনো কিছু দিয়েই কিছু হবে না।'

অকস্মাৎ গেট পেরিয়ে একটি ভ্যান-রিক্সা এসে ঢোকে বাড়ীর অভ্যন্তরে। ভ্যানটিতে পৃথুল আকারের একটি চালের বস্তা, একটি তেলের টিন, কয়েকটা বড় বড় ঠোঙার প্যাকেট এবং কিছু মরসুমী তরিতরকারি।

ভ্যান-চালক ছেলেটি ভ্যান থেকে নেমে এগিয়ে আসে, এবং উমাপতিদের নিকটবর্তী হয়ে বলে — 'জিনিসগুলো নামায়ে রাখেন।'

উমাপতি বলেন

— 'কাদের জিনিস এ-সব? আমরা তো দোকানে কিছু পাঠানোর অর্ডার দেইনি।'

ভ্যানওয়ালা বিষয়টা পরিষ্কার করতে উদ্যোগী হয়—

— 'এগুলো দাসমশায় পাঠায়ে দেছেন।'

বিস্মিত উমাপতি — 'কে দাসমশায়?'

ভ্যানওয়ালা বলে

—'বাজারের দোকানদার নিবারণ দাসমশায়। দাশমশায় এগুলো পাঠায়ে দেছেন তার দিদিরে দেবার জন্য। ওনার দিদি কে আছেন এখানে?'

ডাক্তার বাবু এবং উমাপতি ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারেন না, পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করেন, এবং রহস্যটা কোথায় আবিষ্কার করার জন্য প্রয়াসী হ'ন।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সুবালা, সব কথা তার কর্ণগোচর হয়।

দাসমশায় মানুষটাকে চিনতে পারে সুবালা।

যে দিনটিতে নিবারণ দাস, তথা শঙ্করার 'দাসমশায়', তাকে দেখতে এসেছিল ওদের বাড়ীতে, সে দিনকার চিত্রটি মনে ভাসে সুবালার। বড় দোকান থেকে প্রণামীর নাম ক'রে নিয়ে এসেছিল দামী জামাকাপড়, মুখে ছিল ঠাকুর-দেবতাব মতো বাক্য-কথা, 'দিদি' 'দিদি'— বলে কি প্রাণ-ঢালা ডাক, ভালবাসা আর মায়া-মমতায় ভরা মানুষটা!

বিষয়টা স্পষ্ট হয় সুবালার কাছে।

শঙ্করা বাজারের থলি নিয়ে বাজার করতে গিয়েছিল, পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, বাজার করতে পারেনি, — কোনোভাবে এসব বৃত্তান্ত জানতে পেরেছে নিবারণ, অতএব পাঠিয়ে দিয়েছে চাল ডাল আনাজপাতি।

দু' চোখে জল আসে সুবালার।

পলাশ বুঝি এরই ছেলে, যাকে খুন করার অপরাধে পুলিশ ধ'রে নিয়ে গেছে তার শঙ্করাকে!

কোন্ পাপে যে এমনটা হ'ল!

অনর্থক বিলম্বে ভ্যানওয়ালা অসহিষ্ণু—

—'কই, দাসমশায়ের দিদিরে ডাকেন, জিনিসগুলো নামায়ে দিয়ে যাই, আমি আর কতক্ষণ দাঁড়ায়ে থাকব?'

উঠানে নেমে আসে সুবালা —

—'দ্যাও বাবা, জিনিসগুলো আমার হাতে দ্যাও। আমিই তোমাদেব দাসমশাযের দিদি হই।'

পরম মমতাভরে জিনিসগুলো ঘরে এনে তোলে সুবালা।

ভারী চালের বস্তাটা মাথায় করে এনে ঘবের মধ্যে তুলে দিয়ে যায় ভ্যানওয়ালা ছেলেটি।

উমাপতি এবং ডাক্তারবাবু আবিষ্ট বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দেখে যান ঘটনাটি।

অশান্তি, সন্ত্রাসসৃষ্টি এবং খুনের অভিযোগে শঙ্করাকে গ্রেফতার ক'রে প্রথমে রাখা হ'ল স্থানীয় থানায় এবং অবিলম্বে তাকে চালান করা হ'ল দমদম সেন্ট্রাল জেলে। হাজতে।

উনিশ শ' তিয়াত্তর চুয়াত্তর সালের সময়-কালে এ-কাহিনী যখন সংঘটিত হচ্ছে, ভারতীয় বিচার-ব্যবস্থার ক্ষেত্রটি তখন নানা-ভাবেই উত্তাল এবং চিহ্নিত। দেশের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ এবং চালু হয়েছে জরুরি অবস্থা। ১৯৫১ সালে হিংসাত্মক কার্যকলাপ বিবোধী আইন — প্রিভেন্‌সন্ অব ভায়োলেন্স এ্যাক্ট — প্রযুক্ত হয় এবং তাতেও পরিস্থিতি আয়ত্তে না আসায় প্রযুক্ত হয় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংরক্ষণ বিধি — মেইন্‌টেন্যান্স অব ইন্‌টারন্যাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট — 'মিসা' নামেই যা সমধিক খ্যাতিমান। ১৯৫৮ সালে এই আইনটি বাতিল হয় কিন্তু তার পূর্বেকার এই সময়টুকুতে প্রাযোগিক কলাকৌশলে আইন দু'টি সবিশেষ মহিমা অর্জন করে।

এই আইন দু'টির দ্বাবা যদি কোনো ভাবতীয নাগবিককে গ্রেফতার কবা হ'ত, তাহলে সরকার ধৃত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য জেলবন্দী ক'রে রাখত পাবত যতদিন খুশি। সরকারী কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিদেবকে তোষণনীতিতে বিশ্বাসী নন, বা কথায কথায় সবকারের পশ্চাতে হুড়ো লাগানোর চেষ্টা কবেন যে সব বেযাড়া সাংবাদিক বা তঁ্যাদড় শিক্ষক অধ্যাপক, বা ভিন্ন কোনো গোত্রের বুদ্ধিজীবী, তাদেরকে শাযেস্তা করতে খুবই লাগ্‌সই হ'ল আইন দু'টি। মিসা প্রয়োগে তাদের ঝটিতি জেলে আটক করা হ'ল এবং মুক্তিব ব্যাপাবটা স্থগিত রইল অনির্দিষ্ট কালের জন্য। বুদ্ধিজীবী মহলে সর্বদাই প্রবাহিত হতে থাকল একটি শীতল উদ্বেগ,— কে কখন 'মিসা'র শিকার হ'ন। 'সমাজবিরোধী' নামে যাবা চিহ্নিত, কর্তাব্যক্তিদের সুনজরে না থাকলে, গ্রেফতার হতে হ'ল তাদেরকেও।

এতে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কতখানি সুরক্ষিত হ'ল, সেটা বিচাব-সাপেক্ষ, কিন্তু সন্ত্রাস-বন্ধের নামে সন্ত্রাস-সৃষ্টিতে যে বিধি দুটি অতুলনীয় ভূমিকা নিল এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সাতের দশককে মুক্তির দশক হিসেবে চিহ্নিত ক'রে যে সব তরুণ-তরুণী বা বয়স্ক যুবকজন উন্মত্তপ্রায় হয়েছিল, তাদের অনেককেই চোরাগোপ্তা গায়েব ক'রে দেওযা হ'ল, বাকিরা আচমকা ধরা প'ড়ে জেলের অন্ধকারে পচতে থাকে 'মিসার' গ্যাঁড়াকলে।

শঙ্করার কেসটিতে হীরুবাবু সবিশেষ আগ্রহী। তিনি ধুরন্ধর ব্যবহারজীবী এবং সাম্প্রতিক রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী, অতএব তিনি সক্রিয় হ'লে সহজেই শঙ্করাকে 'মিসা'য় গ্রেফতার করিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আবদ্ধ ক'রে রাখতে পারতেন জেল-হাজতে। কিন্তু সে পদ্ধতি গ্রহণ না ক'রে তিনি প্রচলিত সাধারণ আইনেই গ্রেফতার করালেন শঙ্করাকে।

খুনের কেস প্রমাণ করা গেলে শঙ্করাকে যে চূড়ান্ত শাস্তি দেওয়া যাবে, অনির্দিষ্ট কালের জন্য জেলে আটক করে রাখার চেয়ে যে সেটি অধিকতর ফলপ্রদ হবে, সেটা তিনি অনুমান করলেন। তিনি রাজনীতি-করা শীতল মস্তিষ্কের আইনজ্ঞ মানুষ, ধীরে ধীরে তিনি শঙ্করাকে জড়াতে চাইলেন আইনের প্যাঁচে, কারণ শঙ্করার উপর তার গভীর ক্রোধটি সক্রিয় ছিল সর্বদাই ।

শঙ্করাকে তিনি তাঁর এ্যাক্‌শান্ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নিজে উপযাচক হয়ে, কিছুটা মাথা নিচু ক'রেই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁর মতো ক্ষমতাবান প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির পক্ষে এটি অপ্রত্যাশিত, তবু নানাদিক চিন্তা করেই কাজটি করেছিলেন তিনি। কিন্তু শঙ্করা যেভাবে তাচ্ছিল্য সহকারে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাঁকে, সেটা তাঁর পক্ষে অতীব অমর্যাদাকর, এবং সে অপমানটা ভুলতে পারেন নি তিনি।

তার সঙ্গে যুক্ত হ'ল পলাশের এই ব্যাপারটি। পলাশ তাঁর রাজনীতিতে আশ্রিত এবং সক্রিয় কর্মী, এতদঞ্চলে এটি সুবিদিত, সেই পলাশকে শঙ্করা জড়াল নারীঘটিত কেলেঙ্কারীতে, এতে হীরুবাবুরই প্রেস্টিজ ঢিলে হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত পলাশ খুন হ'ল এবং এ খুনের পিছনেও শঙ্করার ছায়া। সুতরাং শঙ্করার উপর একটা চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেওয়া ছাড়া, সম্মান-রক্ষার বিকল্প কোনো পথ নেই হীরুবাবুর।

হীরুবাবুর যোগসাজশে পুলিশ শঙ্করার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী সন্ত্রাসসৃষ্টি, শান্তিভঙ্গ এবং খুনের অভিযোগ আনল এবং কেসটি যাতে দ্রুত ফয়সালা করা যায়, সে বিষয়ে মনোযোগী হলেন হীরুবাবু। আদালতেও তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি এবং যাবতীয় শক্তির সদ্ব্যবহারে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করলেন না তিনি। তবে আদালতে কেসটি পরিচালনার দায়িত্ব সরাসরি নিজে নিলেন না, কিছুটা প্রচ্ছন্ন থেকে এ-কাজের দায়িত্ব দিলেন তাঁর এক সুযোগ্য সহকারীকে।

ধনবল কিম্বা জনবল, কোনো ক্ষেত্রেই বলীয়ান নয় শঙ্করা। ডাক্তারবাবু যথাসাধ্য তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পরিচিত একজন তরুণ এ্যাড্‌ভোকেট, ইতি-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করে সহানুভূতিশীল হলেন শঙ্করার প্রতি, নাম-মাত্র পারিশ্রমিকে দায়িত্ব নিলেন কেসটি পরিচালনার। রতন এবং বরুণ চালপার্টির লোকদের কাছ থেকেও কিছু চাঁদা তোলে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করে সবাই।

শঙ্করার জামিনের জন্য চেষ্টা করা হ'ল, কিন্তু হীরুবাবুদের বিরোধীতায়, যথাযথ তদন্তের স্বার্থের অজুহাতে, জামিন না-মঞ্জুর করলেন বিচারক।

সাধারণ মামলায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নব্বই দিনের মধ্যে চার্জশীট দিতে হয়। এবং চৌদ্দ দিন অন্তর আসামীকে আদালতে হাজির করানো বাধ্যতামূলক।

দ্রুত তৎপরতায় মাসখানেকের মধ্যেই শঙ্করার বিরুদ্ধে খুন এবং অন্যান্য মারাত্মক অভিযোগাদিব ভিত্তিতে কেস তৈরী হ'ল। একদা কালুগুণ্ডার সহচর, কুখ্যাত সমাজবিরোধী এবং অধুনা চালের চোরাচালানদার শঙ্করার বিরুদ্ধে জোরালো খুনের কেস সাজাতে বিশেষ বেগ পাবার কথা নয়।

কেসের দিনগুলোতে ডাক্তারবাবু নিয়মিত আদালতে উপস্থিত থেকে কেসের গতি-প্রকৃতি লক্ষ রাখতে লাগলেন, উকিলকে তথ্যাদি সরবরাহ এবং অর্থ-ব্যয়ও করতে লাগলেন সাধ্যানুযায়ী।

হীরুবাবুর তৎপরতায়, সচরাচর যা দুর্লভ, বেশ ঘন ঘন কেসের দিন পড়তে লাগল এবং হীরুবাবুর দক্ষ পরিচালনায় শঙ্করাই যে খুনী, এটা ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল আদালতে। পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টটিও বিশেষ প্রমাণ হিসেবে গণ্য হ'ল। মসজিদের ছাদ থেকে পতনের ফলে পলাশের মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু এ-সত্যটি আপাতদৃষ্ট, ছাদ থেকে পতনের আগেই যে পলাশের লাংসে প্রচণ্ড আঘাত করা হয়েছে এবং সেটিই যে তার মৃত্যুর কারণ, এবং সে আঘাতটি করেছে অতি অবশ্যই শঙ্করা, এ সত্যও উদ্‌ঘাটিত হ'ল। পলাশের বুকে নির্মমভাবে আঘাত করার পর শঙ্করাই যে পলাশকে ধাক্কা মেরে মসজিদের ছাদ থেকে ফেলে দিয়েছে, উকিলের জেরায় জেরায় তা প্রমাণিত হতে লাগল।

কেসের ধারাবাহিকতায় একদিন সাক্ষ্য দিতে ডাকা হ'ল নিবারণকে। পুত্রের হত্যাকারীর বিরুদ্ধে জোরালো সব যুক্তি-জাল সহযোগে দীর্ঘক্ষণ ধ'রে বিচক্ষণ উকিলবাবু তালিম দিলেন তাকে।

শঙ্করার পক্ষের তরুণ উকিলবাবু নিবারণকে পর্যুদস্ত করার জন্য জেরা শুরু করলেন। কিন্তু নিবারণ কোনো জবাব দিলনা উকিলের জেরার। তার সর্বাঙ্গে ঘামের ধারা, দৃষ্টি আচ্ছন্ন ঝাপসা, কাঠগড়ার রেলিং আঁকড়ে ধ'রে রুদ্ধ-কণ্ঠে সে শুধু উচ্চারণ করতে পারল — 'ধর্মাবতার।'

শোকগ্রস্ত পিতার এই বিষাদ-মূর্তি অভিভূত করল উপস্থিত সকলকে।

মাননীয় বিচারক কিছু লিখছিলেন, নিবাবণের সম্বোধনে তাঁর লেখা বন্ধ হল, পূর্ণ মনোযোগে তিনি তাকালেন নিবারণের দিকে।

আদালত-কক্ষ স্তব্ধ, 'সূচ-পতনের শব্দও শোনা যায়' — এরকম পরিস্থিতিতেই সম্ভবত এ-জাতীয় উপমা ব্যবহার করা যায়।

বিহ্বলতা কাটিয়ে, কিঞ্চিৎ আত্ম-সংবরণ ক'রে, নিবারণ পুনরায় বলতে শুরু করে

— 'ধর্মাবতার! পলাশ 'আমার একমাত্র ছেলে। সেই ছেলে আমার চলে গেল। আমার দুঃখের সীমা নেই। কিন্তু আমার ছেলেও পাপী, পাপ করেছে সে, একটি নিরপরাধ মেয়ের জীবনে কলঙ্ক দিয়েছে। তার দণ্ড সে ঈশ্বরের কাছেই পেয়েছে। শঙ্করা ঐ নিরপরাধ মেয়েটিকে বাঁচাতে গিয়েছিল। শঙ্করাকে কঠিন দণ্ড দিয়ে তার সৎকাজকে ছোট করবেন না হুজুর!'

কাঠগড়ায় মূর্ছিত হয়ে পড়ে নিবারণ।

জজসাহেব মনোযোগে নিবারণের কথা শোনেন এবং কিছু নোট করেন কাগজে।

সাক্ষীর তালিকায় বিত্তির নামও যুক্ত ছিল। কিন্তু সে অসুস্থ, আদালতে সাক্ষ্যদানে অসমর্থ, ডাক্তাবী সার্টিফিকেট জমা দিয়ে তার উপস্থিতি স্থগিত রাখা হ'ল।

মাস তিনেক বাদে ডাক্তারকে তলব করা হ'ল সাক্ষ্যদানের জন্য।

আইনের জটিল ভাষায় ঝানু উকিল ডাক্তারকে ছিন্নভিন্ন করতে চাইলেন প্রশ্নের পর প্রশ্ন নিক্ষেপ ক'রে, কিন্তু ডাক্তার তাঁর বক্তব্যে চিকিৎসা-শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি নিরীহ মেয়ের উপর দিনের পর দিন সম্মিলিত কামার্ত আক্রমণের বীভৎস চিত্র স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন, এবং শঙ্করাকে আপাতদৃষ্টিতে খুনের সঙ্গে জড়িত মনে হলেও, সে যে খুনী নয়, আত্মরক্ষার জন্যই আক্রমণ করতে বাধ্য হয়েছিল, সে কথা জোরালো কণ্ঠে উপস্থাপিত করলেন। পলাশ যে মদ্যপানে বেসামাল ছিল, এবং সেই-ই প্রথম শঙ্করাকে ছোরার আঘাত করে এবং টাল সামলাতে না পেরে ছাদ থেকে গড়িয়ে পড়ে নিচে, তথ্য-প্রমাণ-যোগে এসব কথা ব্যক্ত করলেন। খুন এখানে মোটিভ নয়, সমস্ত ঘটনার পিছনে একটিই উদ্দেশ্য ছিল শঙ্করার, তা হ'ল একটি নিরীহ মেয়েকে রক্ষা করা — উকিলের প্রচণ্ড জেরার মুখেও তা সোচ্চারে ঘোষণা করলেন ডাক্তার।

উমাপতির সংসারে এখন তিনটি প্রাণী, উমাপতি সুবালা এবং বিত্তি। উমাপতি তার নির্জন একাকীত্বে অধিকতর অন্তর্মুখ, বিত্তি নিজেকে ক্রমশঃ গুটিয়ে নিতে থাকে গৃহকোণে — শয্যার সঙ্কীর্ণতায়, হা-হুতাশে বক্ষ বিদীর্ণ হয় সুবালার, আর তারই মধ্যে সাংসারিক কর্ম-প্রবাহটিকে সচল রাখতে সুবালাকে নিয়ত পরিশ্রমী এবং সতর্ক থাকতে হয়। বিষাদ, নিরানন্দ এবং হতাশার এক অভিশপ্ত বলয় যেন বাড়ীটিকে ঘিরে।

নিবারণের কাছ থেকে সেই ভ্যান-চালক ছেলেটির ইতিমধ্যে আগমন ঘটল আরো একদিন,

সঙ্গে পূর্ববৎ সেই একটি ভারী চালের বস্তা, তেল নুন ডাল আনাজপাতি ইত্যাদি। অপরের অন্নগ্রহণ গ্লানিজনক; কিন্তু সেই গ্লানিকে নিঃশব্দে নিরুপায়ে মেনে নিতে হল উমাপতিকে।

ডাক্তারবাবু যেন অধিকতর জেদি এবং এক-বগ্‌গা হয়ে উঠছেন, মামলার দিন পড়লে নিজস্ব কাজকর্ম উপেক্ষা ক'রে স্নানাহার ফেলে হাজির থাকেন আদালতে।

উমাপতি ক্রমশঃই নির্বিকার, নিরাসক্ত। কিন্তু তবু কখনো অনুযোগ তাঁর কণ্ঠে—

—'কেন এভাবে কষ্ট করছেন, সময় নষ্ট করছেন, পয়সা ওড়াচ্ছেন ডাক্তার বাবু —!'

উদার হাসির প্রসন্নতা ডাক্তারের কণ্ঠে

— 'ওসব নিয়ে ভাববেন না মাস্টারমশায়! আমার ছেলেমেয়ে নেই, কিছু টাকাপয়সা এই হতভাগা ছেলেমেয়ে দু'টোর জন্য যদি ব্যয় হয়, আমার বিশেষ কিছু লোকসান হবে না।'

আরো কয়েক দিন বাদে, বিষম চিন্তায় ভারাক্রান্ত সুবালা, রতনকে দিয়ে খবর পাঠায় ডাক্তারবাবুকে।

তিনমাস অতিক্রান্ত, বিন্তির শরীরে মাসান্তের নারী-ধর্মের ক্রিয়াটি বন্ধ।

ডিস্‌পেন্‌সারি সেরে রাত্রির দিকে এলেন ডাক্তারবাবু, সুবালাকে জিজ্ঞাস করলেন

—'কি ব্যাপার, খবর দিয়েছো কেন?'

কিভাবে বলবে কথাটা ডাক্তারবাবুকে, সঙ্কোচ লজ্জা দ্বিধায় কণ্ঠরোধ হয়ে আসে সুবালার। কিন্তু সমস্যাটি যে প্রকট, এবং পরিত্রাণের জন্য ডাক্তারবাবুই যে একমাত্র ভরসা, এ-বোধ নিঃসঙ্কোচ হতে বাধ্য করে তাকে

—'ডাক্তারবাবু, আমি কেমন যেন ভালো বুঝতিছি না, বিন্তির শরীলডায় যেন অন্যরকম কিছু ঠেক্‌তিছে। আপনি যদি দেখতেন একবার।'

সুবালার উক্তির তাৎপর্য অনুমান করেন ডাক্তার। এক সপ্তাহ ধরে জন্তুগুলো ছিন্নভিন্ন করেছে বিন্তিকে। অঘটন কিছু ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়।

শয্যা-কোণে বিন্তি নিস্পন্দ শায়িতা, সস্নেহে ওকে ডাকেন ডাক্তার

— 'এদিকে একবার ফেরো তো মা বিন্তি।'

বিন্তি পার্শ্ব-পরিবর্তন করে।

নাড়ির গতি, চোখের কোলের রক্ত-সঞ্চারণ ইত্যাদি কিছু মামুলী পরীক্ষা করেন ডাক্তার। বিন্তির সর্বাঙ্গীণ লক্ষণাদি তাঁর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে সন্দেহের বীজ ছড়ায়।

বেরিয়ে আসেন ডাক্তার। মুখ গম্ভীর, চিন্তাব ছাপ ললাটে। সুবালা উদ্বিগ্ন

—'কি বোঝ্‌লেন ডাক্তারবাবু?'

— 'এত কম মাসে ঠিক বোঝা মুশকিল। তবে আমারও খুব ভাল মনে হচ্ছেনা।'

ভয়ার্ত সুবালা—

—'আপনি এট্টা কিছু ব্যবস্থা করেন ডাক্তারবাবু। যেমন ক'রে পারেন, ওবে মুক্ত করেন। এ কি সব্বোনাশ হলো!'

কেমন যেন এক ধন্দ-লাগা মানুষের মতো অসহায় বসে রইলেন ডাক্তার। মানুষের রোগে পীড়ায়, জন্ম মৃত্যুতে সর্বক্ষণ অক্লান্ত এক যোদ্ধা, —কিন্তু এখন হতাশ, হতবল, যেন নতজানু।

ধীরে ধীরে বললেন —'দ্যাখো শঙ্করার মা, আমি ডাক্তার, মানুষের প্রাণ বাঁচানো আমার কাজ, প্রাণ মারা নয়। একাজ আমাকে করতে ব'লো না, এ কাজ আমি পারব না।'

নতমুখে সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে, অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন ডাক্তার।

।। ছাব্বিশ ।।

— 'ও দিদি — ভালো? — ও মাসি — ভালো? —

মুখে মুখে চকিত উচ্চারণ। কানে কানে, যেন হাওয়ায় ভর ক'রে, সে উচ্চারণ বিস্তৃতি পায়। গাদাগাদি। ঠাসাঠাসি। তবু সেই বদ্ধ ঠাস-বুনোটের রশি আল্‌গা ক'রে, এ-জানালার সন্ধানী ফোকর গলিয়ে, ও দরজার আড়ালটুকু সম্বল ক'রে, চকিত উচ্চারণ যেন এক আর্ত জিজ্ঞাসায় রণিত হয়—

— 'ও দিদি — ভালো? — ও মাসি — ভালো?'

সেই রণন ফিরতি দলের কাছ থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেবে —

— 'ভালো, ভালো —।'

ওদের যাত্রা-পথের আসা-যাওয়ায়, আপ ডাউনের এই সতর্ক-বার্তা বিনিময়ের 'ভালো'ত্বটুকু কিন্তু আনন্দময় হয় না। — 'ভালো — ভালো —' উচ্চারণ করতে গিয়েই যেন টান পড়ে কণ্ঠ-নলিতে, 'ভালো'ত্বটুকু নিরঙ্কুশ হয়না ব্যাপ্ত অর্থে। অবিবত এক চিন্তা ছোবল মারে বুকের গহীনে।

শঙ্করা গ্রেফতার হবার পর প্রায় আট মাস অতিক্রান্ত, জেল-হাজতে বন্দী রয়েছে শঙ্করা, আদালতে চলছে আইনের কূট-কচালি, বিচার-ব্যবস্থার দড়ি-টানাটানি। উকিলের জেরা, সাক্ষীদের তথ্যপ্রমাণ, —কখনো ঝুঁকছে শঙ্করার দিকে, কখনো প্রতিকূলতার ফাঁস তৈরি হচ্ছে তাকে বেষ্টন ক'বে।

অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে মামলা এগিয়েছে, এবার বিচারকের রায়-দানেব সময় আসন্ন। কি হবে সেই বায়? শঙ্করাব ফাঁসি? শঙ্করার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড? অথবা অন্য কিছু? কিম্বা মুক্তি?

চালপার্টির লোকেদের প্রতিদিনের জীবন-সংগ্রামের শ্রম, ক্লান্তি, সুখ-দুঃখ, স্বস্তি-দুর্ভাবনার টানাপোড়েন, আর তারই মধ্যে নিত্য-সহচর ঐ ভাবনা — 'শঙ্করা ফিরে আসবে তো?'

তাদের রুজি-রোজগারের এই পথটুকু সর্বক্ষণই বিপদ-সঙ্কুল, নিত্য সেখানে হরেক রকম উৎপাতের শঙ্কা, তারই মধ্যে শঙ্কবার উপস্থিতি ছিল তাদের নিশ্চিন্ত নির্ভরতা। চালের দোকানদারদের সঙ্গে লেন-দেনের ব্যবসায়িকতা, পুলিশ-'এস্‌পেশালে'র ঝক্কি সামলানো, গুণ্ডা রাহাজানদের বিরুদ্ধতায় এককাট্টা নেতৃত্ব — সর্বক্ষেত্রেই শঙ্করা ছিল ওদের একান্ত আশ্রয়, নির্ভয় ভরসা। তাই সব কাজের দায়ভারে, কিম্বা অবসরে, ঐ এক চিন্তা ঘুরে ফিরে কড়া নাড়ে মনের দরজায়—

— 'শঙ্করা ফিরে আসবে তো?'

শীতের এক সকালে গ্রেফ্‌তার হয়েছিল শঙ্করা, শীত ঋতুর অবসানে, প্রাকৃতিক নিয়মে, গ্রীষ্মের দাবদাহ পরিবেশ আবহাওয়া তপ্ত ক'রে দিয়ে গেল দু'টি মাস, অতঃপর আগুন-ঝরা আকাশে সঞ্চারিত বর্ষার শান্তি। দৈনদিন কর্ম-জীবনের প্রাত্যহিকতায়, ঋতু-বদলের অমোঘ পালায়, কখনো বা বৈচিত্র্য, কখনো নিরন্তর একঘেয়েমি, কিন্তু ঐ একটি প্রশ্ন যেন বিস্মরণ হয়না কিছুতেই—

—'শঙ্করা ফিরবে তো? কবে ফিরবে শঙ্করা?'

উমাপতি বিন্তি সুবালার সাংসারিক বৃত্তটি এই আট মাসে আরো নড়বড়ে, অসংবদ্ধ। তিলমাত্র আর যেন চলার ক্ষমতাহীন, কিন্তু সময়, সে তো অবিরত বহমান, তাই ওরাও বুঝি এগিয়ে যায় দিনের সঙ্গে। থামার উপায় নেই, তাই বুঝি থামে না।

উমাপতির ভাবনা-ক্লিষ্ট, রোগজীর্ণ শরীরে বার্ধক্য নেমেছে অবাধ বিস্তারে, জড়পিণ্ডের সমতুল শয্যাশ্রয়ী থাকেন সর্বক্ষণ।

বিন্তির শরীর এখন বহুলাংশে সুস্থ, অভিশপ্ত সেই সাতটি রাত্রির কলঙ্কের ক্লেদ থেকে তার শরীর এখন বাহ্যত মুক্ত। কিন্তু অভিশপ্ত ঐ রাত্রিগুলোর কোনো ক্ষণ-মুহূর্ত তার গর্ভকোষে সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছে যে প্রাণ-বিন্দুটিকে, এই আটমাসে তার উপস্থিতি সে ঘোষণা করেছে বিন্তির শরীরে সাড়ম্বরে।

বিন্তি যে অন্তঃসত্ত্বা, এটা এখন আর কোনো পরীক্ষা-প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা, দৃষ্টি-মাত্রেই প্রতীত হয়।

একটি প্রাণ, তা সে যত কলঙ্কিত ক্লিন্ন পথেই আসুক, তাকে বিনষ্ট করার দায়িত্ব কে নেবে? বিশেষতঃ, বিন্তি-শঙ্করার প্রসঙ্গটি এখন আদালতে বিচারাধীন, সুতরাং বিন্তিকে ভারমুক্ত করতে যাওয়া আইনের দিক থেকেও দণ্ডনীয়, শাস্তিযোগ্য। অতএব বিন্তির গর্ভকোষের প্রাণ-কণিকাটুকু জীব-ধর্মের স্বাভাবিকতায় প্রায় পূর্ণাঙ্গ আকৃতি গ্রহণ করেছে এই আটমাসে। অবৈধ সন্তান-সম্ভবা বিন্তিকে এই কলঙ্কিত দায়ভাগ বহন করতে হয় বাধ্যতামূলক, এবং জীবনকে তার মনে হয় অর্থশূন্য, ক্ষমাহীন এক গুরুভার।

আটমাস পেরিয়ে, শ্রাবণের এক মধ্যাহ্নে শঙ্করার বিচারের রায় ঘোষিত হয়।

রায়দানের দিনটি পূর্বেই ঘোষিত, সুতরাং নির্দিষ্ট দিনটিতে ব্যাপক জন-সমাবেশ ঘটল আদালত-প্রাঙ্গণে।

আদালতে প্রতিদিনই বিভিন্ন এজলাসে কত ধরনের বিচার-কার্য পরিচালিত হচ্ছে, পক্ষে বিপক্ষে আসামী ফরিয়াদী নানাবিধ লোকজনের নিয়ত যাতায়াত।

কিন্তু শঙ্করার মামলার রায়দানের দিনটি নানা কারণেই চিহ্নিত এবং বহুল প্রচারিত হ'ল। সাধারণতঃ, ঠগ-জুয়াচুরি আর কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির মামলারই তো আধিক্য আদালতে। সেক্ষেত্রে শঙ্করার মামলাটি ভিন্ন গুরুত্বের দাবিদার।

চালের চোরাচালানদারদের নেতা এক সমাজবিরোধীর বিচার, চালপার্টির একটি মেয়েকে রক্ষা করতে গিয়ে সে খুন করেছে আর এক সমাজবিরোধীকে, সে আবার এক রাজনৈতিক নেতার সহচর — এসব প্রসঙ্গ জন-মানসে বিশেষ কৌতূহলের সঞ্চার ঘটিয়েছে বিগত ক'মাসে। স্বভাবতঃই, বিচারের রায় জানার জন্য আদালত প্রাঙ্গণে কৌতূহলীদের ভিড়। কিন্তু সমস্ত ভিড়কে ছাপিয়ে, সেই কৌতূলহী জরদ্গব সমাবেশটিকে ভিন্ন মাত্রা দিল ওদের আগমন।

সমস্ত চালপাটির লোকজন সেদিন পালন করল হরতাল, কর্মহীনতা। যুগপৎ ওদের অস্ত্র এবং পতাকা — এক একটি শূন্য চালের বস্তা — আন্দোলিত হতে থাকে মাথার উপরে এবং ওরা এসে সদলে সমবেত হতে থাকে আদালত-প্রাঙ্গণে। বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, বালক-কিশোর — নির্বিশেষে। কাতারে কাতারে ওদের আগমনে সেই জনতা পরিণত হয় একটি বৃহৎ জনসমষ্টিতে, এবং সেই সমাবেশটিতে পূর্ণ হয়ে যায় কাছারি প্রাঙ্গণের নাতিবৃহৎ ময়দানটি।

শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় বন্দুকধারী পুলিশ মোতায়েন থাকে অদূরে।

কিন্তু ওরা শান্তিভঙ্গের কোনো কারণ ঘটায় না, মূক বেদনায় পরস্পরের গা লেপ্‌টে, ঠায় দাঁড়িয়ে, অথবা উপবিষ্ট, অপেক্ষা করে বিচারের রায়ের। মাঝে মাঝে ফিস্‌ফাস্ কথা, অস্পষ্ট গুঞ্জন।

আদালত ভবনের সুবৃহৎ কম্পাউণ্ডের আশেপাশে সতেজ বৃক্ষরাজি, শ্যামল সজীব, বর্ষার বারিধারায় স্নাত প্রাণবন্ত। ওদের পিছনেই একটি দৃষ্টিনন্দন পুষ্পিত কদম্ব গাছ, অজস্র ফুলের সমারোহ, সবুজাভ পাতার আড়ালে বৃত্তাকার হলুদ গুটির গায়ে রোমাঞ্চিত শুভ্রকেশরের সুডৌল সঞ্চার — সমগ্র পরিবেশটিতে একটি মায়া-ঘন প্রাকৃতিক সুষমার বিস্তার ঘটায়। আদালত কক্ষের অভ্যন্তরে নৈমিত্তিক কার্যকলাপ, সত্যমিথ্যার নানাবিধ চাপান-উতোর, এবং বহিরঙ্গ পরিবেশে এই স্নিগ্ধ প্রাকৃতিকতায় নির্মিত হয়েছে চমৎকার একটি বৈপরীত্য।

মানদা, ছানুবালা রতন বরুণ অনুভা মালতী এবং আরো কয়েকজনের একটি উপদল, চালপার্টির লোকদের বৃহত্তর সমাবেশটি থেকে স্বল্প ব্যবধানে, এককোণে বসে থাকে ম্রিয়মান, অবনত মুখ। সকলেই যেন নির্বাক, ভাষাহীন, কেউ কারো দিকে যেন মুখ তুলে তাকাতে সাহস পায়না, অবরুদ্ধ শঙ্কা আর দুর্ভাবনা তাদের কুরে কুরে খায়— কখন রায় বের হবে, কি রায় বের হবে!

অবশেষে বিচারের রায় বের হ'ল।

হীরুবাবুর পরিচালনায় এবং তার সহকারীর সুদক্ষ সওয়াল-জবাবে, পলাশ যে খুন হয়েছে, এবং শঙ্করাই সে খুনের জন্য দায়ী, এটা প্রমাণিত হ'ল। কিন্তু খুনের মোটিভ যে কোনো স্বার্থ-প্রণোদিত নয়, বরং সৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, এবং আত্মরক্ষার ব্যাপারটাও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত, প্রমাণিত হ'ল সেটিও। বিশেষতঃ, নিহত পলাশচন্দ্র দাসের পিতা নিবারণচন্দ্র দাসের সাক্ষ্য অনেকখানি লঘু ক'রে দিলো শঙ্করার অপরাধ।

সুতরাং, চরম দণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পরিবর্তে, আইনের সব দিক খতিয়ে বিবেচনা ক'রে, মাননীয় বিচারক দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান দিলেন অপরাধী শঙ্করাকে। শঙ্করার প্রতি তিনি মানবিক দিক দিয়ে সহানুভূতিশীল, কিন্তু আইনের বিধান তিনি অতিক্রম করতে অক্ষম, একথাও ঘোষণা করলেন।

নিমেষে বিচারকের সেই রায় রাষ্ট্র হয়ে যায় আদালত-প্রাঙ্গণের জনতার মধ্যে। সাধারণ দর্শকদের সংবাদটি শ্রবণেই কৌতূহল নিবৃত্ত হয়। একজন সমাজবিরোধী, যে শান্তিভঙ্গ এবং খুনের অপরাধে ধৃত, সে জেলে যায়, তাতে সাধারণ মানুষ বা বৃহৎ বিশ্ব, প্রকৃতি-জগৎ, —কারোরই কিছু আসে যায় না। আদালতের পারিপার্শ্বিক শ্যামলতা সবুজতা, পুষ্পিত কদম্বগাছ, মধুবাতা ঋতায়তের রোমাঞ্চ শিহরণ — সবই অক্ষুণ্ন থাকে।

কিন্তু চালপার্টির মানুষগুলো কেমন যেন বোবা হয়ে যায়। শঙ্করার চরম দণ্ড হয়নি, দশ বছর বাদে মুক্তি সে পাবে, এটা গভীর স্বস্তি, কিন্তু তবু তাকে দশটি বছর তো চলে যেতে হবে কারান্তরালে, এবং তাদের দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামের সার্বিক অসহায়তায় শঙ্করার বলিষ্ঠ উপস্থিতি, সান্নিধ্য, আর তাদের সাহস জোগাবে না।

কিন্তু আইনের এই বিধানের বিরুদ্ধে তাদের করণীয়ই বা কি? এই দিশেহারা অসহায়তায় কে তাদের পথের নির্দেশ দেবে?

কেউ চোখের জল মোছে, কেউ বসে থাকে নির্বাক বেদনায়। তারপর একে একে সবাই উঠে যায়, শূন্য বস্তাটি, যা কখনো ওদের পতাকা, কখনো জীবন-সংগ্রামের প্রতীক, ভাঁজ ক'রে গুটিয়ে বগলদাবা ক'রে, নিঃশব্দে চলে যায় যে যার মতো।

আজ আর ওরা কাজে যাবেনা, কিন্তু আগামী কালই চালের বস্তা ঘাড়ে, মাথায়, কাঁকালে বিন্যস্ত ক'রে আবার ওরা বের হবে, বের হতে বাধ্য হবে জীবিকার তাগিদে। সুযোগ থাকলে

কেউ বা চলে যাবে ভদ্র নিরাপদ বৈধ কোনো জীবিকায়, জীবিকার ক্ষেত্রে লেন থেকে বাইলেন, বাইলেন থেকে লেন, এসব অদল-বদল তো থাকবেই।

আর এই চাল-চালানের অবৈধ কারবারে যারা জড়িত থাকবে বাধ্যতামূলক, বিপদে আপদে তারা কখনো হবে বেহাল, কখনো রুখে দাঁড়াবে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে।

জীবন জীবিকার তাড়নায় আবার হয়ত সৃষ্টি হবে নতুন কোনো শঙ্করা, কারণ মানুষের ক্ষুধা তো অপ্রতিরোধ্য, এবং সেই জীবিকার সংগ্রামে কোনো না কোনো শঙ্করার নেতৃত্ব তো অপরিহার্য। শঙ্করারা মরে না, আটকাতে পারে না কোনো জেল, শরীর বন্দী করে, কিন্তু আবদ্ধ করতে পারেনা তাদের কর্মধারাকে, প্রেরণা-সৃষ্টির উৎসকে। জীবিকার জটিলতায় এক শঙ্করা বিগত হয়, আগমন ঘটে অন্য শঙ্করার। কারণ জীবিকার সংগ্রাম বড়ই কঠিন, এবং সে সংগ্রামের অন্য নাম নিহিতার্থে শঙ্করা।

অনুভা মালতী পরস্পরকে জড়িয়ে ধ'রে শব্দহীন হাহাকারে ভাঙে, মানদা ছানুবালা ভাবলেশহীন বিহ্বল অবসন্ন।

চোখে আগুন জ্বলে রতনের । বরুণ তার কাঁধে হাত রাখে, কঠিন এক প্রতিজ্ঞা যেন চিন্তায়

— 'ভেঙে পড়লে তো চলবে না রতন। আর, দশ বছব বাদে শঙ্করাদা তো ফিরেই আসবে আমাদের মধ্যে। এর মধ্যে একটা কাজ আমাদের করতে হবে। বিন্তিদিকে আর শঙ্করাদার মা'কে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আর, পলাশের সঙ্গী কটাকে যেমন ক'রে পারি, ধরতে হবে। শঙ্করাদা জেলে যবে, আর ওরা বাইরে ঘুরবে, সেটা হবে না।'

একটা নির্দিষ্ট কর্মধারা যেন কিছু সুস্থিত করে রতনকে

— 'ঠিক বলেছ বরুণ, এ দু'টো কাজ যদি আমরা করতে পারি, জেলের মধ্যে তাহলে শান্তিতে থাকবে শঙ্করাদা।'

দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড নিয়ে শঙ্করা চলে গেল কারান্তরালে।

পরদিন জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে, ভারাক্রান্ত হৃদয়, অপরাধবোধে ক্লিষ্ট, একাকী দেখা করতে এল নিবারণ।

জেল-জীবনের পরিবেশে এখনো অনভ্যস্ত, কয়েদীর পোশাক পরিহিত শঙ্করা ধীর পায়ে এসে দাঁড়ায় বদ্ধ গেটের ও-পাশে। সন্নিকটেই সান্ত্রীদের প্রহরা।

শঙ্করাকে দেখে এগিয়ে আসে নিবারণ, জেলগেটের এপাশে দাঁড়িয়ে বিহ্বল মমতায় দৃষ্টিপাত করে কয়েকবার, তারপর লৌহগরাদের ব্যবধানে সন্নিকৃষ্ট হয় শঙ্করার।

শঙ্করা নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে ভাবলেশহীন।

গরাদের ফাঁক দিয়ে নিবারণ হাত প্রসারিত করে ভিতরে, স্পর্শ করে শঙ্করাকে এবং এক সীমাহীন ব্যাকুলতায় দীর্ণ হয় তার কণ্ঠ—

—'তুই নিশ্চিন্তে যা শঙ্করা, দশটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ওদের জন্য ভাবিস্‌নে, আমি যদি একমুঠো খাই, ওরাও খাবে।'

পরিবেশের এই বিষন্ন ভার, বিমূঢ় বিপন্নতা যেন দীর্ঘক্ষণ সহ্য করতে পারেনা নিবারণ। ক'টি কথা উচ্চারণ ক'রেই স্থানত্যাগ করে দ্রুত।

আরো কয়েকদিন বাদে, কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে, রতনকে সঙ্গে নিয়ে জেলগেটে আসে সুবালা ও বিন্তি।

সেই নির্দিষ্ট জেলের পোশাক, চিহ্নিত কয়েদী-মূর্তি, জেল গেটে এসে দাঁড়ায় শঙ্করা। আজও যথারীতি অদূরে সশস্ত্র সান্ত্রীর প্রহরা।

রতন দূরে অপেক্ষমান। গেটের এক প্রান্তে, অবনতমুখী, একান্তে দাঁড়িয়ে তাকে বিন্তি।

আতুর তৃষ্ণায় সুবালা এসে দাঁড়ায় বন্ধ গেটের এপাশে। এবং ওপাশে শঙ্করা। মধ্যস্থলে লৌহগরাদের দুর্ভেদ্যতা। দীর্ঘ আট মাসের ব্যবধানে, এই বিরুদ্ধে পরিবেশে, মা ও ছেলের কষ্টার্জিত সীমিত সময়ের সাক্ষাৎকার।

শঙ্করার শীর্ণ চেহারা, কয়েদীর পোশাক, বিষণ্ণ উপস্থিতি — বুকের মধ্যে ঝড় তোলে সুবালার। বন্ধ গেটের ওপাশে থেকে অবনত হয় শঙ্করা, প্রণাম করে মাকে।

সুবালা স্বভাবতঃ রোদনপ্রবণ, এ দৃশ্য তাকে অশ্রুমুখী করাই স্বাভাবিক। কিন্তু কিছুদিন থেকেই বাস্তবের এক একটি নির্মম অভিঘাতে তার অন্তরে সঞ্চিত হচ্ছে নির্মোহ কাঠিন্য, আজও তার অশ্রুহীন, সর্বংসহা এক প্রস্তরীভূত মাতৃ-মূর্তিতে যেন তার অধিষ্ঠান।

—'কেমন আছো মা?' — ধীর অকম্পিত কণ্ঠ শঙ্করার।

— 'আমরা ভালই আছি, তুই-ও ভালো থাহিস্ বাবা! আমাগের জন্যি ভাবিস্না। তুই ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি মরবো না!'

সময় স্বল্প।

সুবালা তাকায় অদূরবর্তী প্রাচীরের গাত্রলগ্ন বিন্তির দিকে।

এগিয়ে যায় সুবালা। বিন্তিকে বলে —

— 'যা মা, দেরি করিস্নে। এট্টু কথা বলে আয় শঙ্করার সাথে।'

ধীরে, অবনতমুখে শঙ্করার দিকে এগিয়ে যায় বিন্তি।

অপলক দৃষ্টিপাতে বিন্তির দিকে তাকায় শঙ্করা এবং আকস্মিক এক চমক যেন তাকে শিকড়ে মূলে উৎপাটিত ক'রে দিতে চায়, তাকে গ্রাস করে সীমাহীন এক বিপন্নতাবোধ। মাতৃত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ বিন্তির সর্বাঙ্গে।

দুর্ভাগ্যের কোন্ তাড়নায় এতবড়ো দুর্ঘটনা ঘটল, তল পায়না শঙ্করা!

সমাজের কোন্ পরগাছা ঐ অনাগত শিশুর জন্মদাতা কে জানে, পাঁচটি জানোয়ারই তো রাতের পর রাত নিরন্তর ছিঁড়ে খেয়েছে বিন্তিকে!

অকস্মাৎ তার মনে হয়, তার মা, এই বিন্তি, এরা যেন ছিন্ন দলিতা ধর্ষিতা তার এই জন্ম-মাটিরই ভিন্ন এক রূপ। তার মা, বিন্তি, তার দেশ, সমভূমিতে লগ্ন হয়ে যেন একীভূত হয়ে যায়।

মানুষের লিপ্সা দুষ্কৃতি আর স্বার্থবুদ্ধি একদা ছিন্ন বিভক্ত করেছে এই দেশকে। মানুষের পাপ আর কলুষে একদা ধর্ষিতা হয়েছে তার মা, আর আজ ধর্ষিতা হলো বিন্তি। যুগে যুগে লোভ আর পাপের কাছে অক্ষম মানুষের নিঃসহায় আত্ম-সমর্পণ। পলাশ ও তার দলবল, এবং হীরুবাবুর মতো মানুষ, —এরা চিরকাল মনুষ্যত্বের অপমান করবে। কিন্তু এরাই তো সব নয়। এর পাশেই তো রয়েছে নিবারণ, কালুগুণ্ডা, ডাক্তারবাবু, তার চাল-পার্টির সঙ্গীরা।

শঙ্করা অক্ষর-পরিচয়হীন, বিদ্যা তার বুদ্ধিকে মার্জিত করেনি, কিন্তু সাধারণ বাস্তব বুদ্ধিতেই সে চিনতে শিখেছে এই পৃথিবীকে। পৃথিবীতে মানুষের একাংশের উন্নত চেতনা গড়ে তুলছে সুস্থ

সমাজ, সভ্যতা সংস্কৃতির শুদ্ধতম পাদপীঠ, আবার ভিন্ন আর এক অংশের লোভ, রিরংসা
হীনবুদ্ধি নরক নামক কল্প-লোককে বাস্তবায়িত করে তুলছে। মানুষী রূপের কতো যে ভিন্ন প্র

জীবনের এই দ্বৈত রূপের বিষম প্রতিভাস যেন আচ্ছন্ন, উদ্‌ভ্রান্ত করে শঙ্করার চেতন
জেলের এই বদ্ধ নিগড়, পার্শ্বস্থ বন্দুকধারী সান্ত্রী, অদূরে প্রতীক্ষমাণা তার মা, সামনের
লজ্জাভারে নতমুখী বিন্তি — শঙ্করাকে প্রতিষ্ঠিত করে এক মহৎ সত্যের মুখোমুখি।

ধীরে ধীরে বিদূরিত হয় তার সব বিহ্বলতা, এবং এক নতুন উপলব্ধি যেন সঞ্চারিত হয়
সত্তায়। অকম্পিত কণ্ঠে বলে বিন্তিকে—

— 'ভয় পেয়োনা বিন্তি। জীবনে আমি আমার বাপকে দেখেনি। মার গর্ভে থাকতেই
হারিয়েছি। বাপ কাকে বলে জানিনি। তোমার সন্তানও জানবে না। জানিনা, কে ওর
তবে যে আসছে, তাকে আসতে দাও বিন্তি। তোমাব বক্ত-মাংসে সে বড়ো হয়ে উঠুক।
মা, এটুকুই তার পরিচয় হোক। মানুষ নামেই সে বড়ো হয়ে উঠুক।'

ক্ষণকাল থামে শঙ্করা।

তারপর প্রগাঢ় কণ্ঠে, যেন এক পবিত্র মন্ত্রপাঠ, সে উচ্চাবণ কবে—

— 'বাপ না থাকার দুঃখ আমি বুঝি বিন্তি। তোমার যদি আপত্তি না থাকে, যে আস
বাপের পরিচয় আমার নামেই দিও।'

সাক্ষাতের সময় অতিক্রান্ত।

প্রহরীরা শঙ্করাকে সরিযে নিয়ে যায় জেলেব অভ্যন্তবে।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—